ইতিহাসের রূপায়ণ

তুলসীচরণ ঘোষাল,
এম. এ., বি. টি., এম. এ. (এড্),
অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,
শিক্ষক-শিক্ষণ-বিভাগ,
কল্যাণী, নদীয়া।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪/৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রন—আষাঢ়, ১৩৬৯।

প্রকাশিকা
শ্রীমতী অণিমা ঘোষাল
পি ১৪।১৯৪, কল্যাণী (নদীয়া)

মুদ্রাকর
শ্রীরামগোপাল বসাক
নিউ বসাক প্রেস,
১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মূল্য—সাত টাকা

উৎসর্গ—

স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর চরণে

ইতিহাসের রূপায়ণ।

"শ্লাঘ্যঃ সএবগুণবান রাগদ্বেষ বহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী।" (রাজতরঙ্গিনী-১।৭)

[That noble minded (poet) is alone worthy of praise whose word, of a judge, keeps free from love or hatred in relating the facts of the past"]

—Kalhana's Raj-Tarangini.

—Translated by M. A. Stein

নিবেদন

আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব শুধু সাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় শিক্ষকতা যাঁদের পেশা এবং শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা সরাসরি যুক্ত আছেন অধিকাংশ স্থলে তাঁদের মধ্যেও এটি পরিব্যাপ্ত। শিক্ষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও শিক্ষা বিজ্ঞানের আজ যে বিস্ময়কর অগ্রগতি তার সঙ্গেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের অনেকেরই রয়েছে অপরিচিতি। যে সব কারণে আমাদের এই অবস্থা সেগুলির মধ্যে মাতৃভাষায় এসম্বন্ধে ভাল পুস্তকের অভাব অন্যতম। তাই এবিষয়ে সাধারণ লোকের কাছে গ্রাহ্য হবে এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন এরকম পুস্তক রচিত হবার প্রয়োজন আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যথেষ্ট আছে।

শিক্ষা বিজ্ঞানের নানা দিক। পঠন-পাঠন-পদ্ধতি (Methodology) তাদের মধ্যে একটি। যদিও বাঁধাধরা সীমানা নির্দ্দেশ করে শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলি ভাগ করার অসুবিধে আছে তবুও মোটামুটি বিশ্লেষণ করে পঠন-পাঠনের পদ্ধতিকে এর একটি দিক বলতে পারা যায়। শিক্ষা বিজ্ঞানের অন্যান্য দিগ্‌নির্ণয় করবার প্রচেষ্টায় বাংলাভাষায় অল্পবিস্তর কিছু কিছু পুস্তক রচিত হয়েছে,....হচ্ছে; কিন্তু "পদ্ধতি" সম্বন্ধে সে ধরনের পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এর মধ্যে ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোনো পুস্তক আছে বলে আমার মনে হয়না। তাই এক্ষেত্রে অভাব সমধিক।

কয়েক বছর শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের সাথে যুক্ত থেকে এ অভাবের গভীরতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছি। আমাদের স্কুলের ইতিহাস পাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনে নতুন সমস্যা ও নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, ইতিহাস পাঠ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি আমূল পরিবর্ত্তন সংসাধিত করেছে। শ্রেণীকক্ষে নানা সমস্যার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আমরা তো এখন অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি,—পাঠ্যক্রমান্তর্ভুক্ত ইতিহাসের রূপায়ণ শ্রেণীকক্ষে কি করে সম্ভব হবে!

ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে বাংলাভাষায় একখানি পুস্তকের অভাবের কথা শুনেছি বহুবার, বহুভাবে; শুনেছি শিক্ষকমশায়দের কাছথেকে, শিক্ষা সম্বন্ধে

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক

বর্ত্তমান অতীত।

"বর্ত্তমান অতীত" কথাটি প্রথম শ্রবণে খুব খাপছাড়া মনে হবে। অতীত আবার বর্ত্তমানের মধ্যে সম্ভব কি করে! অনেকে এর সম্ভাব্যতার কথা বিচার করবার প্রয়াস পাবেন এই ভাবে যে বর্ত্তমান যদি অতীতের পরিণতি হয় তাহলে বর্ত্তমানের মধ্যে অতীত আছে; তবে নতুন আকারে। কিন্তু এখানে সে আলোচনা ঠিক এরকম তত্ত্বগত না হয়ে মোড় একটু ঘুরবে।

মানুষ তার চার পাশে চোখ মেলে যা দেখে তার প্রত্যেকটির মাঝে রয়েছে অতীত। মানুষ যুগের পর যুগ ধরে তাদের দেখছে নতুন চোখে, নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে। আকাশের ঐ চাঁদ আর তারা, সূর্য্য আর গ্রহ উপগ্রহ, কোটি কোটি বছর ধরে ওখানে আছে।....অনাদি কালে পৃথিবীর বুকে জেগেছিল জীবনের স্পন্দন। জীবনের গতিচ্ছন্দে সৃষ্টি হয়েছিল তৃণ লতার, গুল্ম বৃক্ষের, সরিসৃপের পশুপাখীর, মানুষের। তার সাক্ষ্য বহন করে আজকে আমাদের চারপাশের মানুষ, পশুপাখী, সরিসৃপ, বৃক্ষগুল্ম, তৃণলতা। উদ্দাম তরঙ্গ ভঙ্গ নিয়ে সমুদ্রের ঐ যে বিশাল বিস্তার, ঐ যে ছোটো বড়ো পাহাড়-পর্ব্বত আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, নদী ছুটে চলেছে সমুদ্রের পানে,—এদের প্রত্যেকটিরই মধ্যে এমন একটি নিরবচ্ছিন্নতা, এমন একটি ধারাবাহিকতা, এমন একটি পরিবর্ত্তনহীন-অস্তিত্ব মূর্ত্ত হয়ে আছে যে সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত কালের শত ভাঙাগড়ার মধ্যেও তাদের মৌলিক আকৃতির কোন ভিন্ন রূপায়ণ হয় নি। তাদের পরিচিতি তাই জীবন্ত অতীতের নিশ্চিত স্বীকৃতি।

এমনকি পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণার মধ্যে রয়েছে মূর্ত্তিমান অতীত। নদীর বেলাভূমে আর সমুদ্র সৈকতে যে বালুকণার আস্তরণ, সেথায় নানা আকারের যে উপল খণ্ডগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তারাও তো মূর্ত্তিমান অতীত। মহাকালের অনন্ত যাত্রার অম্লান স্বাক্ষরে তারা ভাস্বর। পৃথিবীর ভূত্বকের গঠন প্রক্রিয়ার মাঝে, তার প্রতিটি আস্তরণের ভাঁজে ভাঁজে যে অতীত রয়েছে প্রোজ্জ্বল হয়ে তাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। ভূতত্ত্ববিদের অভিজ্ঞ ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি তার কার্য্যকারণ সম্পর্কের নিগূঢ় রহস্যভেদ অতি সহজেই করে থাকে। সেই দিক থেকে বিচার করে দেখলে ভূতত্ত্ব ইতিহাস পাঠের অত্যন্ত আবশ্যকীয়

সহায়ক। ভূতত্ত্বের বেলায় যেমন ভূতত্ত্ববিদ, ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত মানুষের কাহিনীর বেলায় তেমনি ঐতিহাসিক। তার অভিজ্ঞ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিসম্পাতে অতীত বর্ত্তমানে মূর্ত্ত হয়ে উঠে, অতীতের সাথে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় বর্ত্তমানের, আর অতীতের নিভৃত গোপন ভাণ্ডারে যে অজানার ও রহস্যের অবগুণ্ঠন জড়ানো থাকে তার উন্মোচনে অতীত প্রকৃত এবং জীবন্ত হয়ে চোখে ধরা দেয়। অতীত তখন আর অতীত থাকে না। ইতিহাস তখন আর কল্পনা-রঙীন গল্প থাকে না। বাস্তবের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে সে হয়ে উঠে প্রাণচঞ্চল মানুষের কথা।

ভূত্বকের গঠন প্রক্রিয়ার সাথে আবার মানুষের সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তন-ধারাকে তুলনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতার অবদান যেন কালের বিবর্ত্তনের সাথে ভূত্বকের ক্রমনির্মীয়মান আস্তরণ। এ নির্মিতির পটভূমিকা যেমন বিস্তৃতিতে ব্যাপক, এর সম্যক পরিচিতি ও তেমনি বিস্মৃতিতে দুরধিগম্য। নানা কার্য্যকারণে, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, সমাজের ব্যাপ্তির বিবিধ প্রয়োজনে ঘটেছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন; পরিবর্ত্তন হয়েছে সামাজিক পরিবেশের, রীতিনীতির, আইন-কানুনের, সভ্যতা কৃষ্টির,—আর তাদেরি ধারক এবং বাহক যারা, সেই ভাবধারার, চিন্তার, দৃষ্টিভঙ্গির। বহুপরিবর্ত্তনের টানাপোড়েনে মহাকালের নিত্যপরিক্রমার সাক্ষ্য বহন করে তারা আমাদের চারপাশে বিরাজমান।

কোথাও কোথাও অতীতের মৌলিক আকৃতি এত অবিকল, তার পরিবর্ত্তন এত নগণ্য, কালের ভাঙাগড়ার স্থূল অবলেপনকে উপেক্ষা করে বর্ত্তমানের পাশে সে এমনিভাবে স্থান করে নিয়েছে,—এত সহজ সাধারণ তার অবস্থিতি, সে যে অবিকল অতীত সে কথাটাই ভুলে যাই। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে, ব্যাপ্তির অসাধারণতায়, নমনীয়তার অভিনবত্বে বহু প্রাচীন হয়েও সে তাই নবীন, অভিনব, অনন্য। মানুষের জীবন নাট্যের যে মূল নট, মানব ইতিহাসের যে প্রধান নায়ক সেই মানুষের দিকে তাকালেই তো সে কথার প্রমাণ মিলে। কিন্তু শুধু মানুষই একমাত্র সাক্ষ্য নয়। মানুষের কাজের সংখ্যাতীত নিদর্শন আছে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে; তারা হাজারো সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করবে এ উক্তির স্বপক্ষে।

ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষের যে নাম, কিংবা যে সভ্যতা আসমুদ্র হিমাচল সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তার নামেরও যেমন অতীত আছে তেমনি তার বিস্তৃতির, সংস্কৃতির এবং স্বীকৃতিরও ইতিহাস

আছে। এই সবগুলিকে নিয়েই সে বর্ত্তমানে প্রোজ্জ্বল। ভারতবর্ষের অধুনা প্রচলিত ভারতীয় ভাষা ও লিপিগুলির যে ক্রমিক বিবর্ত্তন ও বর্ত্তমান রূপায়ণ তার মধ্যেও নিহিত আছে বহু জাতি, বহু সভ্যতার মিলনের গোপন কথা, আর অনন্তকালের পরিক্রমার নিদর্শন। আবার বর্ত্তমান ভারতের কাশী, গয়া, দিল্লী, আগ্রা, কোলকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই পুণা, পুরী ভুবনেশ্বর প্রভৃতি,—এরা প্রাচীন কালের বহু স্মৃতি ধারণ করে আজও রয়েছে অথচ শত পরিবর্ত্তনের তরঙ্গভঙ্গ বহে গেছে তাদের উপর দিয়ে। তাছাড়া ভারতবর্ষময় এমন অনেক স্থানের নাম আছে যেগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় ভারত ইতিহাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিদেশীদের ভারত অধিকারের কথা। বড়ো বড়ো শহরের কোনো কোনো সড়ক বা উদ্যানের নাম বা তাদের প্রান্তে বা মধ্যে স্থাপিত মর্ম্মর মূর্ত্তি, কিংবা কোনো স্মৃতিসৌধ, তাদের স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, স্বাক্ষর বহন করে আমাদের অতীত ইতিহাসের। এরা তো অতীত অথচ বর্ত্তমানে চাক্ষুস।

ভারতবর্ষের অধুনা প্রচলিত যানবাহন গুলি। গরুর গাড়ী থেকে শুরু করে ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাম মোটর, নৌকা, জাহাজ আর মাটির বুকের উপর পাতা রেলগাড়ীর লাইন, উড়োজাহাজ,—বর্ত্তমানে যানবাহন গুলির এই নব রূপায়ণের প্রচেষ্টা—এগুলিতো সেই সুদূর অতীত থেকে ধাপে ধাপে বর্ত্তমানে নিয়ে আসবে আমাদের। আমাদের পিতৃপিতামহের কাছ থেকে সময়ের যে একটি অখণ্ড, নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বহে এসেছে আমাদের এই বর্ত্তমানে, তার সংশয়হীন ধারা-বাহিকতার প্রমাণ স্বরূপ সুদূর ও অদূর অতীত ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়ের ক্রমিক প্রগতির ঘোষণা মিলে তাদের পাশাপাশি অবস্থানে আর দর্শনে।

ভারতের নৃতাত্ত্বিক মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে একনজরেই ভারতবর্ষের বহুজাতির সংমিশ্রণের কথা অতি সহজেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। পঞ্চনদের তীরে যারা বাস করে তাদের থেকে শুরু করে সাগরসমীপবর্ত্তীনী গঙ্গার তীরে যাদের বাস, কিংবা তুষারমৌলী হিমালয়ের পাদদেশে যারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করেছে সেই গুর্খাও পাহাড়ীরা, আর কন্যাকুমারিকার অঞ্চলপ্রান্তে যাদের আবাস, কি ছোটনাগপুরের পর্ব্বতসঙ্কুল স্থানে পর্ণকুটীরে যে কোল, ভীল সাঁওতাল মুণ্ডাদের বাস,—এই রকম বিভিন্ন ধরণের, বিভিন্ন গঠনের, বিভিন্ন আচার আচরণের, বিভিন্ন বেশভূষার, যে সব মানুষের নিত্যসংস্পর্শে আমরা আসি, তাদের মুখাবয়ব, শরীরের গঠন ও বর্ণ, দৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপিত করে বর্ণসংকরতার, —আমাদের দেশের অতীত অধ্যায়গুলির ক্রমিক ও অতিস্বাভাবিক পরিণতির।

আমাদের আহার্য্য, পানীয়, বিবিধ বিলাস-সামগ্রী যা আমরা নিত্যনিয়ত গ্রহন করি, ব্যবহার করি, তার মধ্যেও আমাদের অতীতের কথা সুস্পষ্ট। আমাদের দেশে গোলআলুর, তামাকের, চা-এর এবং এরই মত আরো কতো জিনিসের প্রচলন কিভাবে হয়েছে, এসবের মধ্যে তো আমাদের অতীতের কথা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অথচ এগুলি বর্ত্তমানে মূর্ত্তিমান। সাহেবী পোষাকে ভারতবাসী—আর তারই পাশে ভারতীয় পোষাকে ভারতবাসী আমাদের অতীত ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের কথা নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দেবে।

কোলকাতার রাজভবন, দিল্লীর লালকেল্লা কিংবা বর্ত্তমানে আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা প্রদেশপালের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অতীত ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় আমাদের স্মৃতিপটে ফুটে উঠবে। আমাদের দেশের উৎসবের দিনগুলি, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পর্ব্বদিনগুলি, শহীদদিবস, স্বাধীনতাদিবস—এরা প্রত্যেকেই আমাদের সুদূর অথবা অদূর অতীত ইতিহাসের সাথে একান্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। এদের পালন উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে আমরা অতীতকে উপলব্ধি করি।

সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত অতীতের স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্য সামগ্রীগুলি জীবন্ত অতীতের মূর্ত্ত প্রতীক। সংগ্রহশালার পরিবেশে মন এক নিমিষে উধাও হয়ে যায় সে-ই সুদূর অতীতে—যে যুগে শিল্পীরা সুনিপুণ তুলিকায় অজন্তার গুহাচিত্র আঁকতো; ভারুতে ভাস্করেরা অনুপম ভাস্কর্য্যে বুদ্ধের জীবনআলেখ্য পাষাণের বুকে খোদাই করতো; রাজসন্ন্যাসী ধর্ম্মের অনুশাসন পাহাড়ের গায়ে কিম্বা স্তম্ভে খোদাই করিয়ে প্রজাবর্গের অবগতির জন্যে প্রচার করতো; রাজারাজড়ারা কি ধনীগৃহস্থ তামার পাতে লিখতো দলিল দানপত্র। সংগ্রহশালার এই পরিবেশে মনে হয় আমি যেন হাজির হয়েছি ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিস্মৃত যুগে—তাদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। এখানের সংগৃহীত নক্সা, আসবাবপত্র, স্থাপত্যভাস্কর্য্য ও কারুকার্য্যের নিদর্শন নিচয়, অনুপম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত, সুঠাম গঠনে লীলায়িত দেবদেবীর নানা ভঙ্গিমার মূর্ত্তি, পোড়ামাটির পুতুল, তৈজসপত্র, নানা অলঙ্কার আভরণ, অতীতের রাজাদের মুদ্রা,—এরা তো সবই জীবন্ত অতীত। তাদের উপর দিয়ে শতশতাব্দীর কালপ্রবাহ বহে গিয়েছে। এই মাত্র।

সারা পৃথিবীটাই তো অতীতের সংগ্রহশালা। আমাদের চারপাশের বিষয়গুলি সেই সংগ্রহশালার দ্রব্যসম্ভার। সৃষ্টির আদি উৎসমুখ হ'তে সময়ের স্রোত আর ঘটনার ঢেউ মানুষের চিন্তার ও কর্ম্মের যে ধারাবাহিক ও

ক্রমিক আস্তরণ ফেলেছে বর্ত্তমানের মানব সমাজে, সেইগুলিই তো ভাঁজে ভাঁজে জমে উঠে সৃষ্টি করেছে বর্ত্তমানের মানবসভ্যতা। একযুগ নিয়ে এসেছে বিশিষ্ট এক চিন্তা, অনন্য এক কর্ম্মপ্রবাহ। তাতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক সভ্যতা। পরের যুগ এনেছে আরো নতুন চিন্তা আরো কিছু কর্ম্মপ্রবাহ। আগের যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হয়েছে নতুন অভিজ্ঞতা। পুরাণো আর নতুনের সংমিশ্রনে সৃষ্টি হয়েছে অভিনব আর এক সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি, যার মধ্যে অতীতও আছে বর্ত্তমানও আছে। শ্যামায়মান অতীত নতুনতর চিন্তা ও কর্ম্মপ্রবাহে বাহিত অভিজ্ঞতার আস্তরণে পেয়েছে হরিৎ শ্যামলিমা, অধিকতর সমৃদ্ধি। এমনি করেই চলেছে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। এই প্রক্রিয়ার অভিনবত্ব উপলব্ধি করতে হলে স্বীকার করে নিতে হবে অন্তহীন, বিরামবিহীন কালপ্রবাহকে। এই গতি প্রবাহের অভিনব ছন্দেই নতুন সৃষ্টির মূর্ছনা, এই অভিনবত্বেই মানবসভ্যতার বৈচিত্র্য রচনা। এ সৃষ্টি চিরন্তনী, তাই প্রাণচঞ্চলা। আর এ প্রভাবও নিত্য তাই অতীত হলেও বর্ত্তমানে মূর্ত্ত।

ইতিহাসের রূপাঙ্কন।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইতিহাসের অনুশীলন আরম্ভ হয়েছে উনবিংশ শতকের প্রথমপাদ থেকে। জার্ম্মানীই এই সমীক্ষার পথিকৃৎ। ইতিহাসের গবেষণায় বৈজ্ঞানিক নীতির অনুগামী যাঁরা তাঁরা উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ শুরু করলেন জার্ম্মানীতে, তার পরে নিজেদের আদর্শ ছড়িয়ে দিলেন দেশে দেশে। ইংলণ্ডে কাজ শুরু হ'ল। ফ্রান্সেও অনুরূপ পদ্ধতিতে কাজ শুরু হয়ে গেল। তথ্যের উপর নির্ভর করে, বুদ্ধি বিবেচনা আর যুক্তির নিক্তিতে বিচার করে প্রকৃত ইতিহাস রচনার কাজ, —অবাস্তবতার দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে, যেখানে নানা ধরণের সত্য-মিথ্যার উর্ণনাভ জালে বন্দী করে রাখা হয়েছিল ইতিহাসকে, সেখান থেকে তাকে মুক্ত করা এই প্রয়াসের অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য।

এই প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং ইতিহাসের বিজ্ঞান সম্মত অনুশীলনে প্রকৃত ইতিহাসের উপর আলোক সম্পাত করা সম্ভব হয়েছে। তার আগে ইতিহাস বলতে তো গল্পগাথার সমষ্টিকেই বুঝাতো। আর সে সমস্ত গল্পগাথা কখনো মানুষের চিত্তবিনোদন কার্য্যে, কখনো মানুষকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করতে, কখনো বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করতে, বিশেষ বিশেষ স্থানে বা কালে পাত্রানুযায়ী বর্ণিত হোতো। এই বর্ণণার মধ্যে দিয়ে বর্ণনাকারীর মনের যা রং তা দিয়েও সাবেক গল্পগাথাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাঙানো হোতো। এমনি ভাবেই তাদের বিকৃতি ঘটতো। তাই এই পটভূমিকায় ইতিহাস সম্বন্ধে নানা ধরণের উক্তি শুনলে বিস্মিত হবার বিশেষ কিছু নেই। যাঁরা ইতিহাসকে "মিথ্যে-গল্পের সমষ্টি," বা "উদ্দেশ্যমূলক আবিষ্কৃত গল্পরাজি" বলে থাকেন তাঁরা যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত ইতিহাসের পূর্ব্বাবস্থার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে থাকেন সেকথা বলা বাহুল্য।

ইতিহাসের প্রকৃত রূপ নির্ণয়ে নানা মত এবং পরস্পর বিপরীত উক্তি প্রচলিত আছে। একদিকে যেমন ইতিহাসকে মিথ্যেগল্পের সমষ্টি বলা হয়েছে অন্যদিকে আবার কেউ কেউ পৃথিবীর জাতিগুলির জীবনী আখ্যাও ইতিহাসকে দিয়েছেন। কেউবা বলেছেন ইতিহাস মানুষের অগ্রগমনের সুবিন্যস্ত ধারা।

মহাকালের চরণচিহ্ন-আঁকা মানবসভ্যতার বিজয়রথের নেমিক্ষিন্ন পথের বাঁকে বাঁকে শতঘটনার সংঘাত ইতিহাসের বুকে। চলমান কাল নিরবধি। অনাদি কালের ক্রোড় হ'তে আজ পর্য্যন্ত মানব সভ্যতার যে অভিনব পরিণতি তারই তথ্য ইতিহাসের পাতায়। তাই ইতিহাস মানুষের কথা; মানুষের সুখ দুঃখের কথা,—মানব সভ্যতার ক্রমপরিণতির কথা। ইতিহাস গতকালের কথা। ইতিহাস আজকের কথা—ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। সত্যের অনুশীলনে তথ্যবহুল, ঐকান্তিক অনুসন্ধিৎসায় প্রোজ্জ্বল, ইতিহাস সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাস তাই সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্।

কিন্তু এ তো ইতিহাস সম্বন্ধে ভাবোচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাসে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়! তাই ইতিহাসের রূপাঙ্কন তাতে সম্ভব হয় না। যুক্তির বাস্তবতা দিয়ে বিশ্লেষণ করে ঠিক করে নিতে হবে ইতিহাসের আসল রূপটি। ইতিহাসের রূপ নির্ণয়ে একাধিক মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে। বিভিন্ন মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। এই সব যুক্তিতর্কের আড়ম্বরের আতিশয্যে, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারের আগ্রহে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে অনেক সময় ইতিহাসের রূপনির্ণয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়।

ইতিহাসের সঠিক রূপ নির্ণয় করতে গেলে ইতিহাসের রূপ নির্ণয়ে যে সব মতামত ব্যক্ত হয়েছে সেগুলির সংক্ষেপ—পর্য্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে। এই পর্য্যালোচনার মাধ্যমেই ইতিহাসের রূপাঙ্কন সম্ভব হবে। ইতিহাসের স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে অনাদিকালের শুরু হতে মানুষের সভ্যতার যে ক্রমিক পরিণতি ঘটছে, ঘটেছে,—ইতিহাস লিপিবদ্ধ করছে তারই কথা। মানুষের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত ও আবৃত মানবসভ্যতার অপূর্ব্ব সুন্দর বিবর্ত্তনের কথাই ইতিহাস। ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণা কিন্তু ইতিহাসের যথার্থ রূপাঙ্কনে বিশেষ সাহায্য করে না। এ ধারণায় ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস আছে, বিশ্লেষণের দৃষ্টি নেই। নেই কোনো যুক্তির বিন্যাস। তাই এখানে ইতিহাসের রূপরেখা অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট।

ভাববাদীরা ইতিহাসকে দেখেছেন তাঁদের জীবন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে। ভাববাদীদের যা জীবন দর্শন তাতে প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের দেহছাড়া দেহাতীত মনের প্রাধান্য। মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে ঘিরে বিরাজমান মানুষের চিরন্তন চৈতন্য। নরদেহ জড়। জড়ের উপর চৈতন্যের প্রাধান্য নিত্য। চিদ্‌ঘন চিন্তার অধিকারী মানুষ। তার এই চেতনাজাত মননে প্রতিভাত হয়েছে এক অনিন্দ্যসুন্দর তুরীয় অবস্থা। সেই তার আদর্শ, লক্ষ্য। বর্ত্তমান

সেখানে অসম্পূর্ণ; তাই পরিত্যজ্য। ভূমার অধিকারী মানুষ। সে বর্ত্তমান বাস্তব পরিস্থিতির অসম্পূর্ণতায় এসে পড়েছে পরিপূর্ণ আনন্দের অলকা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে। এই অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে সেই আনন্দের সুখ-স্বর্গে সে যাবার প্রয়াসী। তাই যুগের পর যুগ ধরে তার চার পাশের অসম্পূর্ণ বর্তমানে পরিবর্ত্তন আনবার চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু প্রতিকূল বাস্তব পরিবেশে প্রতি পদে পদে বাধা। বাস্তব ও আদর্শের এই সংঘাত নিত্য। এই সংঘাতের মধ্যে দিয়েই ধারাবাহিক ভাবে মানুষ তার আদর্শ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই সংঘাতের মধ্যে দিয়েই হয়েছে তার বিবর্ত্তন। মানুষের সেই ধারাবাহিক এবং সামগ্রিক বিবর্ত্তনের কথাই ইতিহাসের পাতায়।

বস্তুবাদী যাঁরা তাঁরা আদর্শবাদীদের ইতিহাসের এই রূপাঙ্কন মেনে নিতে চান না। মানুষের চেতনা জগৎ ছাড়া মানুষের চারদিকে ঘিরে যে বস্তুজগৎ আছে তার দিকেই তাঁরা বেশী করে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। বস্তুবাদীরা নিছক বাস্তবতার সুদৃঢ় মঞ্চে দাঁড়িয়ে বস্তুর প্রাধান্যের কথাই সব শক্তি নিয়োগ করে ঘোষণা করে থাকেন। তাঁদের মতে মানুষের চেতনার বা মননের উপর তার বাস্তব পরিস্থিতির প্রাধান্য। বস্তু আগে মন পরে। ইতিহাসের কার্য্য-কারণ সম্পর্কে ভাববাদীদের বিশ্লেষণে যে সংঘাত ও গতির কথা বলা হয়েছে, বস্তুবাদীরা তা স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের কাছে ঐ সংঘাতের রূপ ও কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বস্তু উৎপাদনের উৎস। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের এই উৎসকে একদল মুষ্টিমেয় লোক নিজ অধিকারে এনেছে। মুষ্টিমেয় এই একদল লোক ছাড়া মানুষের সমাজে রয়ে গেছে এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠের দল। সংখ্যালঘিষ্ঠেরা সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্রমে নিজেদের কায়েমী স্বার্থের ইমারত খাড়া রাখবার চেষ্টা করে এসেছে বরাবর। আর তাদের এই প্রচেষ্টাই ইতিহাসের গতিকে করেছে পরিচালিত। উৎপাদনের উৎসকে করায়ত্ত করে তারা উৎপাদনকে করেছে নিয়ন্ত্রিত। উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করে তারাই রূপদান করেছে বর্ত্তমানকে, নির্দ্ধারণ করেছে ভবিষ্যৎকে। আর এমনি ভাবেই রচনা করেছে ইতিহাসকে। আবার উৎপাদনের উৎসকে নিয়ন্ত্রিত করে তারা কায়েমী স্বার্থের ইমারতকে বজায় রাখতে এবং প্রসারিত করতে চেয়েছে। তার ফলে হয়েছে সমাজের ভারসাম্যের বিচ্যুতি। কায়েমী স্বার্থ পুঁজিপতিদের শোষণ চলে এসেছে অবিরাম। এই শোষণের মধ্যে দিয়ে তারাই সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করেছে তাদের কায়েমী স্বার্থের বিরোধী নিপীড়িত, বঞ্চিত শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের। এই পুঁজিপতিদের সাথে

সর্ব্বহারা শোষিতের দ্বন্দ্ব নিত্য এবং তা আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে। চিরন্তন এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতেই আবর্তিত হয়েছে চলমান কালের চক্র বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ ইতিহাসের রচনা করে।

ইতিহাসের রূপ-নির্ণয়ে বস্তুবাদীদের এ সিদ্ধান্তকেও বহু চিন্তাশীল মানুষ মেনে নেন নি। তাঁদের মতে ভাববাদীদের এবং বস্তুবাদীদের ইতিহাসের রূপ নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত যুক্তিশুদ্ধ এবং প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা উচিৎ হবে না। তাঁরা বলে থাকেন ভাববাদীদের মত যেমন ত্রুটিপূর্ণ বস্তুবাদীদের সিদ্ধান্তও তেমনি একদেশদর্শী। এঁরা বলতে চান মানুষের "চেতনা" ও "বাস্তব পরিস্থিতি" হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিসত্তার দুটি দিক মাত্র। এরা উভয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত এবং একে অন্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। পরস্পর সহানুভূতিশীল নৈকট্যে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। পরস্পরের বিচ্ছেদে এদের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এদের পৃথক অস্তিত্বে ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনার সঙ্কেত পাওয়া যায় না। তাই মানুষের "চেতনা ও বাস্তব পরিস্থিতির" একান্ত সহযোগিতায় যে প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত, কর্ম্মপ্রেরণার যে প্রাণচঞ্চল স্বাক্ষর আর কর্ম্মপ্রবাহের যে প্রাণবন্যা তাইতো স্নেহনিবিড় দাক্ষিণ্যে রচনা করে বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ ইতিহাসের। আবার মানুষের ব্যক্তিসত্তা শুধুমাত্র বাস্তব পরিস্থিতির ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তব পরিস্থিতির বাইরে, পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে বহু উর্দ্ধে আছে মানুষের সনাতন চেতনার শাশ্বত আহ্বান। এই চেতনার আহ্বানেই মানুষের মননশীলতা। এই মননশীলতাই অসুন্দর থেকে সুন্দরে, অশিব থেকে শিবে যাবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। মানুষ চেষ্টা করেছে, করছে অসুন্দর থেকে সুন্দরে যাবার। মানুষের এই চেষ্টাই তার বর্ত্তমানকে এবং ভবিষ্যৎকে অনবদ্য বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছে; তার ইতিহাসকে করেছে মহিমা মণ্ডিত। চেতনাঘন মানবসত্তার মননশীলতা শুধুমাত্র বস্তুজাত উৎপাদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অর্থনীতির মধ্যে সীমিত নয়। বস্তুজগতের স্থূলতা এবং সঙ্কীর্ণ পরিসর ছাড়িয়ে চেতনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগৎ পর্য্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত। বাস্তব পরিবেশের বস্তুজগতের অর্থনীতি তাই মানুষের অভিপ্রায়ের সব স্থান অধিকার করে নেই। অর্থনীতি এবং বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য তাই মানুষের বহু অভিপ্রায়ের মধ্যে একটিমাত্র; তাও মুখ্য নয়, গৌণ। মানব প্রকৃতিকে অর্থ-নীতির স্থূল অবলেপনে অবলুপ্ত করে দিতে এঁরা রাজী নন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইতিহাসকে শুধু অতীতের অবদান কিংবা অতীতের "সুবিন্যস্ত অনুবৃত্তি" বলে ধরে নেওয়াটার মধ্যে শুধুই ভাবোচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত

হয়, এখানে রূপ বিশ্লেষণের কোনো প্রয়াস নেই। ভাববাদী ও বস্তুবাদীরা নিজ নিজ জীবন দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করেছেন সেগুলিও একদেশদর্শী। ইতিহাসকে সাধারণতঃ মানুষের ব্যক্তিসত্তার সাথে প্রতিকূল পরিবেশের অবিরাম দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে গতি হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। সে গতির বাঁকে বাঁকে রয়েছে হাজারো সংঘাত। সে সংঘাতের প্রতি স্তরে ছড়িয়ে আছে মানব সত্তার "চেতনার" এবং "বস্তুর" অঙ্গাঙ্গি সংযুক্ত অনবদ্য অবদান। মানুষের চেতনা এবং বস্তু বা বাস্তব পরিস্থিতি সেখানে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় অবিভাজ্য। ইতিহাসের রূপাঙ্কনে এই ধারণাটিকেই অধিকাংশ লোক যুক্তিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করে থাকেন।

স্কুলে ইতিহাস পড়াই কেন?

স্কুলে ইতিহাস পড়ানো হবে কেন? এ প্রশ্ন সাধারণের কাছে একটু অসাধারণ মনে হলেও শিক্ষকতা যাঁদের পেশা তাঁদের কাছে এটি একেবারে অস্বাভাবিক এবং অপ্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। একটু চিন্তা করলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়াও দুষ্কর নয়। মানুষের সমাজে মানুষের যুগযুগান্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতা-গুলি পুরুষপরম্পরায় সঞ্চারিত করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে; মানুষের কৃষ্টির, সংস্কৃতির অবলুপ্তি যেন না আসে। সমাজ ব্যবস্থায় বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠা শিক্ষার ধারক ও বাহক বলে পরিগণিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে স্কুল একটি অনুরূপ অন্যতম প্রতিষ্ঠান। প্রসঙ্গতঃ এখানে একথাও উল্লেখ-যোগ্য যে এই প্রতিষ্ঠানটি পুরুষপরম্পরায় আগত মানব সংস্কৃতির ধারকই শুধু নয়, বাহকও বটে। নতুনের সাথে পুরাতনের সুষ্ঠু সমন্বয়ে নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার ভারও এর উপর ন্যস্ত। বিচিত্র ও সমৃদ্ধ মানব সংস্কৃতির তাই এটি ধারক ও বাহক। 'ইতিহাস কি', এ ধারণা স্বচ্ছ থাকলে স্কুলে ইতিহাস পড়ানোর যৌক্তিকতা, বা স্কুলের পাঠ্যসূচীতে ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠা উচিত নয়। আর সেই জন্যেই অনেক বিজ্ঞ, বহুদর্শী শিক্ষক মনে করেন যে আজ আর স্কুলের পাঠ্যসূচীতে ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা বা সার্থকতা নিয়ে বিশেষ কোনো প্রশ্ন করার নেই; বরঞ্চ সমালোচনা করার কিছু আছে অন্য দিক থেকে। অনেক স্থলে সমালোচনা করা হয়েও থাকে যে উদ্দেশ্যে ইতিহাস স্কুল 'ক্যারিকুলামে' স্থান পেয়েছে, বাস্তবে তার সার্থক রূপায়ণ নিয়ে।

স্কুল 'ক্যারিকুলামে' ইতিহাসের অতি আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করে নিয়েও ইতিহাস পঠনপাঠনের বিরুদ্ধ-যুক্তির কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা আছে এই জন্যে যে তাতে ইতিহাস পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা আরও স্বচ্ছতর হয়ে উঠবে।

স্কুলে ইতিহাস পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্যর সাথে অতি নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযুক্ত। শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য আবার মানুষের জীবনদর্শনের সাথে ওতঃপ্রোত ভাবে গ্রথিত। মানুষের জীবনদর্শন

গড়ে উঠে অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসার পটভূমিকায়, আর তা মূর্ত্ত হয়ে উঠে বিশিষ্ট চিন্তায়, বিশিষ্ট সৃষ্টিতে, এষনায়। শিক্ষায় হয় তার প্রতিফলন। শিক্ষাই তো একদিক থেকে জীবনদর্শনের রূপছবি। আজ বিংশ শতকের শেষার্দ্ধে, মানুষের জীবনের গতি যেখানে দুর্ব্বার, নানা আবিষ্কারে আর বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে তার বহুমুখী অভিজ্ঞতার জ্ঞানভাণ্ডার যখন ক্রমবর্ধমান,—তখন পুরাণো অভিজ্ঞতা, পুরাণো মূল্যবোধ, পুরাণো চিন্তা, পুরাণো ভাব, পাল্টাচ্ছে। আর তা এত দ্রুত যে তাতে স্থির জীবনাদর্শকে জিইয়ে রাখা শক্ত। মহাকালের অনন্ত যাত্রা। তার বিজয়রথের নেমিক্ষিন্ন পথে নানা ভাঙাগড়ার প্রতিঘাতে মানুষের জীবনে গতির নানা ছন্দ জাগে, আর তাতে সৃষ্টি হয় ভিন্নতর, বিচিত্রতর সামাজিক পরিবেশ, মূল্যায়নের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, পৃথক জীবনাদর্শ। অতি দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল এই জীবনাদর্শের সাথে তাল রেখে শিক্ষাদর্শকে পরিবর্ত্তিত করা দুষ্কর। চেষ্টা চলছে। তার ফল শিক্ষাদর্শের ঘনঘন পরিবর্ত্তন, আর অনিশ্চয়তা। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে মূল শিক্ষার উদ্দেশ্যেরই যেখানে অনিশ্চয়তা সেখানে ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা দুরূহ।

ইতিহাস পঠনপাঠনে থাকে কিছু বিমূর্ত্ত চিন্তা। বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থীরা পাঠ নেয় তাদের পক্ষে এই বিমূর্ত্ত চিন্তা যেমন দুষ্কর ইতিহাসের শিক্ষকের পক্ষেও অপরিণত ঐ শিক্ষার্থীর মনে এই বিমূর্ত্ত চিন্তার উদ্বোধন করাও সহজ-সাধ্য নয়।

ইতিহাস পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য ঠিক করে তার বাস্তবে রূপায়নের জন্যে একটি যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা অবশ্য গবেষণা, চিন্তা, পরীক্ষানিরীক্ষা করে নেওয়া যায়; কিন্তু সে পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করা খুবই কঠিন। পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ এবং ইতিহাস পড়ানোর সাফল্য বা সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার, তার মনের পরিণতি-অপরিণতির উপর। সে দিক থেকে স্কুলে ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে বেশ খানিকটা বাধা এবং জটিলতা আছে।

ইতিহাস মানুষের কথা। ইতিহাসের উপাদান মানুষের জীবন। বিচিত্র পরিবেশে, বিচিত্রতর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে, কার্য্য-কারণ সম্পর্কের নিগূঢ় রহস্যে, মানবমনের এবং মানবজীবনের অভিব্যক্তি। এই উপাদানের স্বরূপ যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা বিদ্যালয়ের অপরিণত মন বিদ্যার্থীর পক্ষে অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক। আমরা ইতিহাসের শিক্ষকেরা যে ইতিহাস পড়ি বা জানি সে ইতিহাস সেই ভঙ্গিতে কখনও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর পাঠ্য ইতিহাস হতে পারে না।

ইতিহাস পড়ানোর যা চরম ও পরম লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার যে পদ্ধতি আমরা শ্রেণী কক্ষে অবলম্বন করি এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান এত দুস্তর এবং সম্পর্ক এত বিচ্ছিন্ন যে চরম লক্ষ্যে উপনীত হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগে। বস্তুতঃ ইতিহাস এই বিষয়টির সাথে বাস্তবের সংযোগ এত অল্প যে স্কুলে এ বিষয়টির পঠন-পাঠনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন বাস্তবজীবন বহু দূরে। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের চলায় বলায়, বাস্তব অভিজ্ঞতায়, কাজেকর্ম্মে, জীবনের যে নিরন্তর প্রবাহ, তার সাথে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে অধীত বা অধীতব্য বিষয়বস্তু একেবারে সম্পর্কহীন। বৈষয়িক লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখলে ইতিহাস পাঠ নিরর্থক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক ইতিহাসের 'কচকচি' বহুসময় শিক্ষার্থীদের নিরানন্দময়, একঘেয়ে, নীরস ঠেকে, তাই শিক্ষার্থীর কাছে সেগুলি স্বাদহীন মুখস্থ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। তাছাড়া যে শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি কিছু প্রখর তাকে ইতিহাস পড়ানো এবং তাতে উৎসাহ সঞ্চার করা কিছু অসুবিধাকর।

ইতিহাস পাঠে ফললাভ সময় সাপেক্ষ। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে থাকাকালীন সে ফললাভ হয় না। বাস্তবিক, অতীতের পটভূমিকায় বর্ত্তমানকে দেখা, মানবসভ্যতার এবং মানবসমাজের নানা ভাঙাগড়ার কার্য্য-কারণের সম্পর্ক বিশ্লেষণে, নানা যুক্তির অবতারণায় নিরপেক্ষ বিচার, সিদ্ধান্ত, সেতো অনেক দূরের এবং অনেক পরের কথা।

তাই বিদ্যালয়ে ইতিহাস পঠন-পাঠনে লাভ কি ?

এই বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি খণ্ডন করা নিয়ে মাথা ঘামানোর বিশেষ আবশ্যক আছে বলে মনে হয় না। আদর্শের সাথে বাস্তবের ব্যবধান চিরকাল থেকেছে এবং থাকবেও। ইতিহাস পড়ানোর আদর্শকে বাস্তবে ঠিক ঠিক রূপায়িত করা দুষ্কর বলে ইতিহাস স্কুল "ক্যারিকুলামে" অন্তর্ভুক্ত হবেনা,—এটা খুব একটা যুক্তি সাপেক্ষ কথা নয়। তবে একথা ঠিক যে এই সব বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি মনে রাখলে ইতিহাস পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা বিপথগামী হবেনা। তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে ও পাঠ্যসূচী নির্দ্ধারণে, এবং পাঠদানের পদ্ধতির উপর, বিদ্যার্থীর সামনে পাঠ্যবস্তুর সুষ্ঠু উপস্থাপনে ইতিহাস শিক্ষকের যোগ্যতার উপর, বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি নিরসনের অনেকখানি নির্ভর করে।

নানা বিরুদ্ধ যুক্তি থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের স্কুল 'ক্যারিকুলামে' অন্তর্ভুক্তির এমন কতকগুলি কারণ আছে যেগুলি একান্তভাবে স্বীকার্য্য।

মানুষের চেতন অবচেতন মনে থাকে কৌতুহল, তার অতীত সম্বন্ধে, অন্য মানুষের সম্বন্ধে, অন্য দেশের সম্বন্ধে। মানুষের বর্ত্তমান সভ্যতার যে সৌধ গড়ে উঠেছে তার মূলে অনেকখানি রয়েছে মানুষের কৌতুহল, আর তাকে চরিতার্থ করবার দুর্ব্বার চেষ্টা। দুজ্ঞেয়কে জানবার বিরামহীন অনুসন্ধিৎসায় ক্রমবর্ধমান মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার। এই কৌতুহল জাগিয়ে তুলতে যেমন ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি তা চরিতার্থ করতেও ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা আছে।

শিশু ও কিশোর মন বয়োবৃদ্ধির তারতম্য অনুসারে কমবেশী কল্পনাশ্রয়ী ও কৌতুহলী। নানাদেশের নানা কালের মানুষের সম্বন্ধে, মানুষ-জীবন ও মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের বিচিত্র-অদ্ভুত কাহিনী সম্বন্ধে কল্পনামধুর বিস্ময় এবং প্রাসঙ্গিক কৌতুহল জাগিয়ে তুলে তার নিরসনে ইতিহাস পাঠের যে ভূমিকা আছে তার মধ্যে মনোবিজ্ঞানের ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু গল্প ভালবাসে। শিশুর কৌতুহল প্রবৃত্তি ও কল্পনাকে 'অবদমনের' (repression) জগদ্দল পাথর চাপিয়ে পিষে মারবার চেষ্টা না করে তা মানুষের অতীতের সভ্যতার দিকে, অন্য দেশের মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি, জীবন-যাত্রা প্রণালী প্রভৃতি জানবার দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিলে যেমন 'উদ্গতিতে' (sublimation) শিশুর মন সতেজ হয় তেমনি গল্পের মাধ্যমে ইতিহাসের কাহিনী বর্ণনায় তার গল্প শোনার আকাঙ্খা মেটে আর মনও হয় সুস্থ, সবল।

শৈশবে ও কৈশোরে মনে নানা কথার, নানা চিন্তার ভিড়; অসংলগ্ন, পরস্পর সম্পর্কশূণ্য। সেইগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করতে না পারলে, সেগুলি হয়ে যায় আগড়ুম বাগড়ুম। মানুষের মনে যে হাজারো চিন্তার ভিড়, তাকে গুছিয়ে, অর্থযুক্ত ভাবে প্রকাশের পথ মেলে ইতিহাস পাঠের মধ্যে। মানব সভ্যতার বিচিত্র সমৃদ্ধ, অগাধ জ্ঞানের তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় নানা জিজ্ঞাসায়। নানা তথ্য সংকলিত হয় গ্রন্থ অধ্যয়নে, শ্রবণে, মননে, অপরের সাথে আলাপে, আলোচনায়। অত্যাবশ্যকীয় তথ্যরাজির সংকলন, আহরণ, গ্রহণ, নির্ভর করে মনের এমন একটি নৈর্ব্যক্তিক কাঠামোর উপর যেটির অভাবে বিদ্যা আহরণ হয় এলোমেলো আর ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে অগোছালো। ইতিহাস পাঠে মনের সেই কাঠামোটি তৈরী হয়; মনের ভাব প্রকাশ হয় সুসংবদ্ধ, পরস্পর সংযুক্ত, যুক্তিশুদ্ধ ও বিচারসম্পৃক্ত।

মনের এই কাঠামোটি আমাদের জীবনে নানাভাবে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। টুকরো টুকরো ঐতিহাসিক তথ্য বা ঘটনা হয়তো মুছে যাবে মন থেকে, কিন্তু ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মনের যে "attitude" টি তৈরী হয়ে যায় তা ঠিক থাকবে জীবন ভোর; এবং মনের এই "attitude" এ আসবে বিচার, যুক্তি, সহানুভূতি,—আসবে নিরপেক্ষতা। ইতিহাস পাঠের চূড়ান্ত লক্ষ্য তো সত্যানুসন্ধান। নানা তথ্যের বিশ্লেষণে, নানা বিরুদ্ধ যুক্তির পর্য্যবেক্ষনে ও তাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করার জন্যে বিচার বুদ্ধির নিক্তিতে ওজন করবার যে প্রক্রিয়া আছে তাতে সত্যানুসন্ধিৎসু, এবং critical করে তোলে মানুষের মনকে। আমরা বাসকরি Propaganda এবং advertisement-এর যুগে। এযুগে অল্প সত্যের সাথে বহু মিথ্যা এমনি ভাবে মিশিয়ে থাকে যে বহু মিথ্যা কবলিত সত্যকে বেছে বের করতে হলে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মন, বিশ্লেষণী বুদ্ধি, নিরপেক্ষ বিচার-শক্তি, নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব, সহনশীল ও সমবেদনশীল মন একান্ত ভাবে প্রয়োজন। এগুলি আসে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে। অবশ্য এটিও স্বীকার করতে হবে যে এগুলির পূর্ণাঙ্গরূপ আসে অনেক পরে। বিদ্যার্থীর বিদ্যালয়ের জীবনে তা হয়না, কিন্তু শুরু হয় সেথা। এসবের বীজ বপন করা যেতে পারে বিদ্যালয়ের পরিবেশে।

আমরা বাস করি গণতন্ত্রের যুগে, গণতান্ত্রিক সমাজে। গণতান্ত্রিক-নাগরিকতা বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে আমাদের আগামীকালের নাগরিকদের মধ্যে। গণতান্ত্রিক নাগরিকের দায়িত্ব বহু। আমাদের সমাজের ভাবীকালের নাগরিককে সুষ্ঠুভাবে সেই দায়িত্ব পালনে সম্যক সক্ষম করে তুলতে হলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় কার্য্যের প্রণালী ও তার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে— সে যাতে করে জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এসবের জন্যে জানতে হবে গণতন্ত্রের নানা বিবর্ত্তন-সম্ভূত তার বর্ত্তমান রূপের নির্মিতি ও ক্রম-পরিণতি, নিজের দেশের এবং তার সাথে অন্য দেশের। এই পটভূমিকা এবং বিবর্ত্তনের ধারা জানতে পারা যায় ইতিহাস পাঠে।

মানুষের কৃষ্টির একটি সামগ্রিক উত্তরাধিকার আছে। সে উত্তরাধিকার আধৃত রয়েছে মানুষের সামাজিক পরিবেশে, রাষ্ট্রের গঠনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে,—যুগ যুগ সঞ্চিত যে মানুষের বহুমুখী অভিজ্ঞতা তার অবলুপ্তি রোধে। সে উত্তরাধিকার অখণ্ড ও স্বতস্ফূর্ত্ত, এবং মানুষের সমাজের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাই মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক উত্তরাধিকার না জানলে, না জানাতে পারলে তো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের গতি যাবে

থেমে। এই উত্তরাধিকারের সূত্র মিলবে ইতিহাসের ভাণ্ডারে। তাই ইতিহাস স্কুল "ক্যারিকুলামে" অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকার রাখে।

কোনো কোনো মহলে এরূপ মনোভাব পোষণ করা হয়ে থাকে যে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে জাতীয়তা বোধ (nationalism) শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে তোলা যেতে পারে। এটা অবশ্য খুব ভাল কথা এবং বাস্তব কথা। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা, যারা রচনা করবে আমাদের দেশের আগামী কালের ভাগ্য তারা শিশুবয়ই দেশকে ভালবাসতে শিখবে, শ্রদ্ধা করতে শিখবে তার অতীতকে, তার সভ্যতা সংস্কৃতিকে, কৃষ্টিচর্য্যাকে। নিজের দেশের বীরত্ব-গাথায় সে অনুপ্রাণিত হবে, নিজের দেশের গৌরবে সে গৌরবান্বিত হবে। কিন্তু তাই বলে সে অন্ধ ভক্ত হবে না। জাতীয়তা বোধ জাগাতে গিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করা চলবে না। ইতিহাস হচ্ছে সত্য,—যা ঠিক তাই। সত্যের এতটুকু বিচ্যুতি ঘটলে তা হবে ইতিহাসের বিকৃতি। জাতীয়তা বোধ জাগিয়ে তুলতে গিয়ে ইতিহাসের বিকৃতি যেন না ঘটে সে জন্যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ এ প্রচেষ্টার মধ্যে ইতিহাস বিকৃতির সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।

আজকাল আন্তর্জাতিকতার যুগ। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব অগ্রগতিতে যাতায়াতের ব্যবস্থা কল্পনাতীতভাবে উন্নত হয়েছে আর তারই ফলে আমাদের এই গ্রহের পরিসর যেন আমাদের কাছে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জগৎ-জোড়া প্রসারে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির ক্রমবর্ধমান সমস্যাসঙ্কুল জটিলতার দ্রুত ব্যাপ্তিতে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন আজ আমরা হয়েছি তাতে আগামী দিনের নাগরিকদের শেখাতে হবে সহাবস্থান। শুধু জাতীয় মনোভাব নয়, আন্তর্জাতিক মনোভাব। জাতীয় বোধ অন্ধ না হলেই তা আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিপন্থী হবে না, বরঞ্চ সহায়ক হবে।

কেউ কেউ ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে নীতিশিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থার কথা ভাবেন। ইতিহাসের যে যে চরিত্রগুলি নৈতিক বলে বলীয়ান তাদের চরিত্র ও কার্য্যাবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সেগুলিকে বিদ্যার্থীর নৈতিক শিক্ষা দেবার উপকরণ হিসেবে তাঁরা কাজে লাগাতে চান। নীতিশিক্ষা ইতিহাস পাঠে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে হয় না এমন নয়। কিন্তু নীতিশিক্ষার লোভে ইতিহাসের বিকৃতি, সত্যের অপলাপ, যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে একটু বেশী আগ্রহশীল

শিক্ষকের হাতে ইতিহাস অনেক সময়ে বিকৃত হয়ে থাকে। সত্যের অনুসন্ধান, যা সত্য তাকে মেনে নেওয়ার শিক্ষা তো সবচেয়ে বড়ো নীতিশিক্ষা, সেটা ইতিহাস পাঠে হয়। নীতিশিক্ষা দেবার অযথা লোভে, ঐতিহাসিক চরিত্র-গুলির উপর কম বা বেশী গুরুত্ব আরোপ অনেক সময় উদ্দেশ্যমূলক হয়ে পড়ে; তাতে আসে একদেশদর্শিতা, পক্ষপাতিত্ব। ইতিহাস পাঠে সেটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। এ ব্যাপারে ইতিহাস শিক্ষকের যোগ্যতা, ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার ভঙ্গি এবং তার নৈর্ব্যক্তিক উপসংহার অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

মহাকালের স্রোত স্থাণু নয়, নিত্য-গতিশীল। তাই তার মধ্যে আছে নানা পরিবর্ত্তন, নানা ভাঙাগড়া। চলমান কালস্রোতকে বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ করছি আমরা। বর্তমানকে জানতে হলে অতীতের পরিপ্রেক্ষি দরকার। বর্তমান তো অতীতের ফল, পরিণতি। তাই ইতিহাস পড়বো অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে জানবার জন্যে। আবার ভবিষ্যৎ তো বর্তমানের সম্ভাবনা। তাই ইতিহাস পড়বো ভবিষ্যৎকে রচনা করবার জন্যে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে আর বিকশিত মণীষায় মানুষ রচনা করতে পারে মহত্তর, সুন্দরতর পৃথিবী। মানুষ নিস্প্রাণ পুতুল নয়। জীবনরসে সে ভরপুর আর অনন্ত সম্ভাবনাময় তার মনীষা।

স্কুলে ইতিহাস পড়াই কেন এই প্রসঙ্গে এমেরিকায় "কলেজ এণ্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড" নিযুক্ত ইতিহাস কমিশন ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১৯৩৬ সালে যা বলেছিলেন তার মোটামুটি একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়ে এ আলোচনার শেষ করবো।

(১) সামাজিক ক্রমবিবর্ত্তনে যে মূল সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছে মানুষ সেগুলির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেওয়া।

(২) বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে সেই সমস্যাগুলির সমাধান কেমন করে হয়েছে তা জানা।

(৩) প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যে স্থান ও কালের ভিন্নতায় মানুষের সামাজিক পরিবেশ ভিন্ন। ভিন্ন এই সামাজিক পরিবেশে গড়ে-উঠা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিয়ম কানুন, আচার অনুষ্ঠান, ও প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে একটি নৈর্ব্যক্তিক ধারণা গঠন করা। এই প্রসঙ্গে সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে এই ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক নিয়ম কানুন, আচার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির ধারণাই শেষ কথা নয়। আসল জ্ঞাতব্য

হচ্ছে মানুষের সংস্কৃতির ক্রমপরিণতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনাদি ও অনন্ত কালের পরিক্রমায় এই আনুষঙ্গিক উপায়গুলি মানুষের আসল উদ্দেশ্য সাধনে কতটুকু সহায় হয়েছে তার সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা লাভ করা।

(৪) মানুষের সমাজে মানবিক ব্যাপারে যে কোন ধরণের আলোড়ন আন্দোলন মানুষের মনের আবেগ প্রক্ষোভ ছাড়া যে সঙ্ঘটিত হতে পারে না সেই সহজ সত্যটি সম্যক উপলব্ধি করা।

(৫) মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে নিত্য-গতিশীল। তারা স্থাণু নয়। বহু রকমের ভাঙাগড়া উঠানামার মধ্যে দিয়ে সে গতি অবিরাম ও অবিচ্ছেদ্য। জৈবিক দেহ বিবর্ত্তনে ক্রমবিবর্ত্তন যেমন একান্তভাবে অপরিহার্য্য ও স্বীকার্য্য, সমাজ শরীরেও অনুরূপ ক্রমপরিবর্ত্তন ও অপরিহার্য্য। এটি স্বাভাবিক। এই সহজ সত্যটি জেনে নেওয়া।

(৬) পরিবর্ত্তন আছে বলেই সমাজ আছে। পরিবর্ত্তনই সমাজের প্রাণ-প্রেরণা। আর সেই জন্যেই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক চাহিদা মিটিয়ে সমাজ যন্ত্রটিকে পরিবর্ত্তনের নাগরদোলায় দোল খেতে হয় নিত্য নিয়ত। সেটি মনে রাখা।

(৭) নিত্য কালের গতিপথে মানুষের সমাজে যেসব চিন্তা, ভাব, এসেছে মানুষের সমাজকে সুন্দরতর, উন্নততর করবার জন্যে, সেগুলির প্রতি মনঃসংযোগ যেমন করতে হবে, তেমনি যে সব চিন্তা বা ভাবধারা সমাজে এসে নানা অনর্থ ও সমাজ-পীড়া ঘটিয়েছে,—মানুষের শরীরে হাতুড়ে ডাক্তারের ভুল ঔষধের মত,—সেগুলির প্রতিও যথাযথ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৮) একথা জানতে হবে যে মানুষের সমাজে আছে জীবন ধারণের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ। আর তার জন্যই সমাজের মূল সমস্যাগুলির সমাধান প্রয়াস যেমন ভিন্ন, তার ভঙ্গিও তেমনি ভিন্নতর। মানুষের সংস্কৃতির বহু বৈচিত্র্যও তাই অনস্বীকার্য্য, অবাঞ্ছিত নয়। এই বহু-বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ মানব সংস্কৃতি সম্বন্ধে কেবলমাত্র একটা নৈর্ব্যক্তিক ধারণা পোষণ করে ক্ষান্ত হলে চলবে না; আমাদের সংস্কৃতি থেকে যেসব সমাজের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পৃথক সেগুলি সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল মন নিয়ে সেগুলির ভিন্নতার কারণগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

(৯) ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এমন একটি সামাজিক দায়িত্ব-বোধ গড়ে তুলতে হবে যেটি কেবলমাত্র সমাজযন্ত্রটিকে চালু রাখার জন্যেই প্রয়োজন হবে না; সেই দায়িত্ব বোধের অনুপ্রেরণায় সহ-যোগিতার রাখিবন্ধনে সবার সাথে হাত মিলিয়ে সমাজ যন্ত্রটি যুগের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হতেও সাহায্য করবে।

(১০) কমিশন মনে করেন যে ইতিহাস যথাযথ ভাবে পড়ালে শিক্ষার্থীর মনের এমন একটি কাঠামো তৈরী হয়ে যায় যা দিয়ে সব রকমের সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যায়। যথাযথ ইতিহাস পাঠ তাই শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে সাহায্য করে ইতিহাস সম্বন্ধে—

(ক) কোথা এবং কিরূপে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(খ) নিক্তির ওজনে সাক্ষ্যপ্রমাণ চাপিয়ে কেমন করে কুসংস্কারকে বাদ দিতে হয়।

(গ) কেমন করে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা যায়।

(ঘ) বর্ত্তমান কি অতীতের সামাজিক গঠন সম্বন্ধে মতামত স্থির করার জন্যে তথ্যগুলি কিভাবে নির্ব্বাচন করতে হবে, সাজাতে হবে, কিংবা উপস্থাপিত করতে হবে।

ইতিহাস পড়ানো ও আন্তর্জাতিক মনোভাব।

স্কুলে ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।' বিদ্যার্থীর বাল্যে ইতিহাস তার গল্প শোনার আশা এবং নেশা মেটাবে। বিদ্যার্থীর মনে কৌতুহল সৃষ্টি করবে তার অতীত সম্বন্ধে, মানুষের সম্বন্ধে, মানুষের বিচিত্র সভ্যতার সম্বন্ধে। আবার ইতিহাস পাঠের মাধ্যমেই আসবে তার কৌতুহলের নিবৃত্তি। স্কুলে ইতিহাস বিদ্যার্থীর মনীষার বিকাশে সাহায্য করবে,—এমনিতরো অনেকানেক উদ্দেশ্য আছে স্কুলে ইতিহাস পড়ানোর। আবার, সুষ্ঠু সুসংবদ্ধ চিন্তা, বহুমিথ্যার ভেজাল থেকে সত্যকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা, "প্রোপাগেণ্ডা" ও সত্যের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা, অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের মানব সভ্যতার মান নির্ণয় করা, আজকের দুনিয়ার সমস্যাগুলির সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা, সত্যানুসন্ধান করবার এষণা জাগিয়ে তোলা, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা দিয়ে বিরুদ্ধ মতগুলিকে বিচার করতে শেখা প্রভৃতিও ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া বিদ্যার্থীর মনে আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তুলতে স্কুলে ইতিহাসের ভূমিকা থাকবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আজকে বিংশ শতকের শেষার্দ্ধে সহাবস্থানের শুভ মনোভাবের সাথে সাথে বিদ্যার্থীর মনে আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তোলা স্কুলে ইতিহাস পড়ানোর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তোলার সম্বন্ধে আজ আর কোন চিন্তাশীল মানুষই লঘুভাবে দেখেন না এবং এর সম্বন্ধে দ্বিমতও পোষণ করেন না। এর অবশ্য কারণ আছে। এ ধরনের চিন্তাধারার ও ইতিহাস আছে। চলতি শতকের প্রথমার্দ্ধে বিশ্বব্যাপী দুটী প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের তাণ্ডবে মানুষের শুভবুদ্ধি হয়েছে বিধ্বস্ত, সৌভ্রাত্র হয়েছে বিপর্য্যস্ত। মানবপ্রীতির অনির্ব্বাণ দীপশিখা গিয়েছে বার বার নিভে। মানুষের অন্তরে পশুর প্রাধান্যে দানবীয় ধ্বংস নেমে এসেছে মানুষের এই পৃথিবীতে। যুদ্ধ যারা লড়েছে,—যারা জিতেছে বা হেরেছে, তাদের মধ্যেই এই নারকীয় ধ্বংস সীমিত থাকেনি। এই যুদ্ধ হাহাকার এনেছে শত শত নিরপরাধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও। যারা যুদ্ধের সাথে কোনোদিনই নিজেদের জড়ায়নি, বরঞ্চ ঘৃণা করেছে তাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে।

তাদেরও জীবনে যুদ্ধ হেনেছে দারুণ অভিশাপ। কিন্তু হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর আকাশে বাতাসে মিশিয়ে আছে মানুষের মনুষ্যত্ব। মানুষে মানুষে সম্পর্ক বিষিয়ে গেলেও সব মানুষের সাথে সব মানুষের সম্পর্ক কোনো দিনই বিষিয়ে যায়নি। তাইপ্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে হয়েছে "লীগ অফ্ নেশনস্"; দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে হয়েছে "য়ুনো"। মানুষের শুভবুদ্ধির নিদর্শন স্বরূপ এরা। মানুষের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলকে এড়িয়ে চলে, যুদ্ধকে সকল প্রকারে পরিহার করে চলবার একান্ত ইচ্ছায় এদের সৃষ্টি। "লীগ অফ্ নেশনস্" টেকেনি। "য়ুনো" টিকে আছে। এই বিশ্বজোড়া দুই যুদ্ধের ফলে মানুষ দেখেছে মানুষে মানুষে যদি সহাবস্থানের মনোভাব না জেগে থাকে তাহলে আসবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মানুষের নিশ্চিত অবলুপ্তি। নির্ম্মম হলেও একথা সত্যি। শিক্ষার্থীর মনে শুভ সহাবস্থানের সাথে আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তোলবার যে পরিকল্পনা এই হোলো তারই গোড়ার কথা।

স্কুলে ইতিহাস পড়ানো বিদ্যার্থীর মনে আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তুলবে বলে যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে অবহেলা করবে এমন ধারণা করার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয়না। জাতীয়তা বোধ বিদ্যার্থীর মনে নিশ্চয়ই জাগিয়ে তোলা হবে, কিন্তু সেটা হবে আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে। সে জাতীয়তা বোধ অন্ধ, উগ্র, উন্মত্ত না হ'য়ে, হবে প্রকৃত, যথাযথ। সে হবে ব্যাপকতায় প্রশান্ত, বহুজ্ঞানে গম্ভীর, উদারতায় সহিষ্ণু ও কুসংস্কারহীন। একদেশদর্শী নয়। আজকের সমাজ জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতায় বসবাস করতে হ'লে নিজের দেশের সীমানার গণ্ডি ছাড়িয়ে দৃষ্টিপাত করতে হবে বৃহত্তর জগতের দিকে, যে জগৎকে বাদ দিয়ে আমাদের দেশ নয়, বা আমরা নই। বস্তুতঃ আজকের দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের মানুষ প্রত্যেক দেশের মানুষের সাথে এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, প্রত্যেকটি দেশ প্রত্যেক দেশের সাথে এমনি অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত যে পৃথক ভাবে, একক ভাবে, কোনটিকেই দেখা যায়না। বিজ্ঞানের দ্রুত ও যুগান্তকারী উদ্ভাবনে সারা দুনিয়ার চেহারা যেমন পাল্টাচ্ছে তেমনি পাল্টাচ্ছে মানুষের মনের রং আর অন্য মানুষের সাথে তার সম্পর্কের ধারা।

যাতয়াত এত অবিশ্বাস্য ভাবে দ্রুত হয়েছে যে পৃথিবীর আয়তন যেন কমে আসছে। আমাদের গ্রহের অপরার্দ্ধের দেশ ও সেই দেশের অধিবাসী, তাদের সমাজ, আমাদের কাছে আজ আর দূর নয়। ব্যবসা বাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসারে, শিল্পায়নের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধিতে আমরা যেন পরস্পর আরও কাছাকাছি

এসে গিয়েছি। আজ পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে কোনো ঘটনা ঘটলে তার প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত নই। আমরা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে একথা উপলব্ধি করছি; আর দেখছি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, তার সমাজে, মানুষ একান্তভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এক দেশ অন্যদেশের সাথে সঙ্গীতযন্ত্রের একই তারে বাঁধা।

বস্তুতঃ মানুষের যে আজকের সভ্যতা তা তো কোনো বিশেষ জাতের, কোনো বিশেষ দেশের, একার অবদানে গড়ে উঠেনি। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন অবদানে সমৃদ্ধ এ এক অবিভিন্ন সভ্যতা,—আর এর উত্তরাধিকারী আমরা এই গ্রহের মানুষ। কাজে কাজেই মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তর্জাতিক মনোভাব তো গোড়ার কথা। এর প্রয়োজনীয়তা আগেও ছিল, আজও আছে। আজ কেবল নানা কারণে আমরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি, এই মাত্র।

ইতিহাস স্কুলে আগেও পড়ানো হোতো, আজও হয়। আগে উগ্র জাতীয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সারা আসর জুড়ে বসে থাকতো ইতিহাস পাঠ্যক্রমের। জাতীয় অহমিকা ভাবাবেগের ঢুলু ঢুলু নেত্রপাতে রক্তরাগচ্ছটায় জাল বুনতো ইতিহাস রচনায়। তাতে সত্য হয়ে যেতো ঝাপসা। ইতিহাস হোতো বিকৃত। জাত্যাভিমান ও জাত্যান্তরিতা ইতিহাসের ঘাড়ে ভর করতো বলেই নিজের দেশের সবকিছুকেই বড়ো করে, সুন্দর করে, মনোরম করে দেখানো হোতো। অনেক সময় অন্য দেশের সাথে নিজ দেশের সংযোগকে করা হোতো অস্বীকার। কখনো কখনো বা অন্যদেশের সাথে নিজ দেশের সংযোগ দেখানো হোতো। তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকতো অন্য দেশকে নিজ দেশের থেকে ছোটো করে, হেয় করে দেখানো। তাতে হোলোই বা ইতিহাসের বিকৃতি এবং বিকৃত ঘটনার পরিবেশন করা। যুদ্ধ ছাড়া যে এক দেশের সাথে অন্য দেশের অন্য কোনো কারণে সংযোগ সাধন হ'তে পারে একথা অনেক সময়ই বিদ্যার্থীর কাছে থেকে যেত অজ্ঞাত। নিজ নিজ দেশের গৌরব অম্লান রাখবার জন্যে দুই দেশের মধ্যে একই যুদ্ধে দুইটি দেশেরই জয়লাভের কথা ইতিহাসে লেখা হোতো। এসব তো ঠিক ইতিহাস নয়, ইতিহাসের বিকৃতি মাত্র।

প্রকৃত ইতিহাস পড়াতে গেলে এবং ইতিহাস প্রকৃতভাবে পড়াতে হ'লে অন্ধ জাতীয়তা জাগিয়ে তুলতে হবে এমন কথা আজ আর কেউই বলবেন না। ইতিহাসের কথা মানুষের সুখদুঃখের কথা মিলিয়ে। ইতিহাস পঠনপাঠনে একদিক দেখলে চলেবে না, সর্বাদক দেখতে হবে। তাতে যেমন থাকবে

মানুষের সুখ সমৃদ্ধির কথা, শান্তির অবদানের কথা, তেমনি থাকবে দুঃখের কথা, অশান্তির কথা, ধ্বংসের, হাহাকারের কথাও। সুখ সমৃদ্ধি শান্তির দিনে মানুষ সৃষ্টি করেছে যে বিশেষ সভ্যতা,—যে সভ্যতায় হয়তো আজকের সভ্যতায় যা নেই তা ছিল,—তার কথা যেমন ইতিহাসের পাতায় থাকবে, তেমনি থাকবে যুদ্ধের দানব জেগে উঠে ক্রুদ্ধ আক্রোশে আর নির্ম্মম হিংসায় যে ধ্বংস, হাহাকার এনেছে তাও। এমনিভাবে ইতিহাসের পঠনপাঠন চললে বিদ্যার্থী জানবে যে মানুষের জীবনে অবিমিশ্র সুখ শান্তিই শুধু ছিল না। বিদ্যার্থী যখন জানবে কি কি কারণে অতীতে বেঁধেছে সংঘাত তখন সে বড়ো হয়ে সে গুলিকে পরিহার করে চলবার চেষ্টা করবে। তার মনের নৈর্ব্যক্তিক কাঠামোয় তার তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন "প্রোপাগেণ্ডাকে" এড়িয়ে চলে আসল সত্যকে খুব সহজেই খুঁজে বের করবে এবং তাকে গ্রহণ করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ইতিহাস পড়ানোর সার্থকতা। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষির জন্যে, বিদ্যার্থীর নৈর্ব্যক্তিক মনের কাঠামো তৈরী করার জন্যে, মানুষের সুখদুঃখের, শান্তি সমৃদ্ধির, হিংসা হানাহানির যথাযথ ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্যে, মানুষের ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ তার কাছে উপস্থাপিত করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। খণ্ডে নয় অখণ্ডে, অংশে নয় সমগ্রের মধ্যেই সত্য। এর জন্যে স্কুলের ইতিহাস পাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি একান্তভাবে অনস্বীকার্য্য।

আজকে আমরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করছি যে মানুষ তার দুঃখকে যদি পরিহার করে চলতে পারে তো তা হবে বড় আনন্দের, সুখের। তাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তর্জাতিক বোধ জাগিয়ে তোলবার এই প্রচেষ্টা। ইতিহাস বিষয়টির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে সে সামগ্রিক ভাবে মানুষের কথা বলবে। সুতরাং ইতিহাস যখন থেকে স্কুল পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে সেই দিন থেকেই বিশ্বইতিহাসের সুর এর মধ্যে অনুরণিত। নানা গবেষণায়, পরীক্ষা নিরীক্ষায় আজ আমরা ইতিহাসের ব্যাপকতর জ্ঞান আহরণ করেছি। ইতিহাসের অনেক অন্ধকার অধ্যায় আজ জানার আলোয় ঝলমল। তাই আমরা বিশ্বইতিহাসের কথা বিদ্যার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে সক্ষম। বিশ্বইতিহাস আমরা পড়াবো। তার উদ্দেশ্য মানুষ যেন তার দুঃখকে এড়িয়ে চলতে পারে,—এড়িয়ে চলতে পারে যুদ্ধকে, হিংসাকে মত্ততাকে; আর দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে অনন্ত কালের পরিক্রমার পথে, সুখে, শান্তিতে, সৌহৃদ্যে, সৌভ্রাতৃত্বে, সহাবস্থানে, পরিপূর্ণ-মানবতায়, নিরঙ্কুশ সার্থকতায়, আর প্রাচুর্য্যসম্ভারমণ্ডিত জীবনে সার্ব্বজনীন মঙ্গলচিন্তায়।

কিন্তু তাই বলে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে গিয়ে অতীতে যেমন বিকৃত হতে হয়েছে ইতিহাসকে, সেরকম আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তুলতে গিয়ে ইতিহাসের বিকৃতি যেন না ঘটে। কোনো কোনো মহলে এরকম একটা প্রস্তাব উঁকিঝুঁকি মারে যে অতীতের যুদ্ধের কথাগুলি, দেশে দেশে, জাতে জাতে, হিংসা হানাহানির কথাগুলি ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলে দিয়ে কেবলমাত্র শান্তির কথা, সমৃদ্ধির কথা, মৈত্রীর কথা, সৌভ্রাত্রের কথা, বিদ্যার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা হবে এবং তাতে শুভ ফল হবে। বলাবাহুল্য, সত্যের এই অপলাপে ইতিহাসের বিকৃতিকে বেশীর ভাগ চিন্তাশীল ব্যক্তিই মেনে নেননি। "If there is a conflict between truth and international under-standing, I am for truth." এই তাঁদের মনোভাব। আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তুলতে গিয়ে সত্যকে ডালি দিতে স্বীকার করাটা সত্যভ্রষ্ট হওয়া! সেটা আদৌ ঠিক নয়।

এখন কথা হচ্ছে যে এই আন্তর্জাতিক মনোভাব শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে তোলার কাজটা কি করে বাস্তবে রূপায়িত করা যেতে পারে? এটা বহুলাংশে নির্ভর করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনে, বিষয়বস্তুগুলির পাঠ্যক্রমের মধ্যে সুষ্ঠু বিন্যাসে, এবং ইতিহাস শিক্ষকের যোগ্যতার উপর। "য়ুনো" প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই যাতে করে আন্তর্জাতিক মনোভাব মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে পারাযায় হাতেকলমে তার চেষ্টা করছে নানাভাবে। শিক্ষার মাধ্যমে এর পথ সুগম হবে। আজকে যারা কিশোর, আগামীকালে তারা পরিণত নাগরিক। দেশের ভাগ্য এবং বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্ত্রন করবে তারা আগামী দিনে। তাই উর্ব্বর এই কিশোর মনে আন্তর্জাতিক মনোভাবের বীজ যথাযথ ভাবে বপন করতে পারলে আমাদের এই গ্রহের বহু দুঃখের লাঘব হবে। সেই আশা নিয়েই চেষ্টা চলছে।

শিক্ষার সামগ্রিক দিক থেকে তো বটেই, ইতিহাস শিক্ষার দিক থেকেও দেখাগেছে যে এর মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক মনোভাব বিদ্যার্থীর মনে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারবে। কিন্তু আদর্শ আর তার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। তাছাড়া বিদ্যার্থীর মনে আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তোলার মত একটা উদ্দেশ্যকে পরিকল্পনা মত বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে একটা বাঁধাধরা 'ছক' একটা 'ফরমুলা' বাত্‌লে দেওয়া যায় না। বড় জোর পরীক্ষামূলক অনুসরণের জন্যে কতকগুলি পন্থা নির্দ্দেশ করা যায়, কতকগুলি মতামত দেওয়া যায় মাত্র। এর উপায় হচ্ছে ক্রমাগত এর উপায় নির্দ্ধারনের চেষ্টা করা।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ উপায় নির্দ্ধারণ করা ; আলাপে আলোচনায়, পরীক্ষা নিরীক্ষায়, চিন্তায় গবেষণায়, ভাবের এবং মতের আদান প্রদানে, বিশেষজ্ঞদের সমবেত মতের সুপারিশগুলি অনুসরণ করে, স্থান কাল পাত্র অনুসারে যুগোপযোগী পন্থা নির্দ্ধারণের বিরামহীন চেষ্টা করা। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ য়ুনেস্কো কর্ত্তৃক আহুত হয়ে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে "Sevres Seminar"-এ একত্রিত হয়ে যে সব সুপারিশ করেছিলেন স্কুলে ইতিহাস পঠন-পাঠন সম্বন্ধে সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। "ইতিহাসের পাঠ্যক্রম" এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের জন্যে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র হতে স্কুল পাঠ্য বিষয়গুলি কিরকম ভাবে নির্ব্বাচিত করা হবে, কি ভাবে পাঠ্যক্রমে সেগুলির বিন্যাস সাধন করা হবে। এখন কেবলমাত্র পৃথকভাবে উপরোক্ত বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ গুলির উল্লেখ ও আলোচনা করা যাবে। তবে একথাও আমরা মনে রাখবো যে এগুলি কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে সুপারিশ মাত্র। এগুলি কিন্তু সবকালে, সবক্ষেত্রে, সবসময়, আবশ্যিক ভাবে প্রয়োগসিদ্ধ নয়। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গেসঙ্গে ব্যবহারিক মূল্যায়ণে এগুলি পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের সাথে সাথে এ সম্পর্কে আরও উন্নততর এবং অধিকতর ফলপ্রসূ উপায় হয়তো আমাদের সন্ধানে আসবে।

সত্যের অনুসন্ধান ইতিহাস পাঠের অতি অবশ্য করণীয় এবং এটা একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য। সত্যানুসন্ধানে আবশ্যক হয় তথ্যের মূল উৎসের অনুসন্ধান। তথ্যের মূলথেকে 'মত' (opinion) নানাভাবে ও ভঙ্গিতে পল্লবিত হতে পারে; কিন্তু মূল পাল্টায় না। তার বিকার নেই। মূলের ব্যাখ্যায় (interpretation) পরবর্ত্তীকালের ব্যাখ্যাকারীরা নিজেদের মনের রং মিশিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন। ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত, সুতরাং পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। কিন্তু মূলতথ্য বিকারহীন, তাই অপরিবর্ত্তনীয় ও সেই দিক থেকে নৈর্ব্যক্তিক। তথ্যের মূল উৎসে গিয়ে, তাকে জেনে, তার থেকে বিচারসম্মত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হলে, অন্যের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির রঙে রাঙানো ইতিহাস পড়তে হয় না। অসংখ্য শতাব্দী ধরে পৃথিবীর আপন কক্ষপথে আবর্ত্তন। এই আবর্ত্তনের সাথে সাথে তার আপন বুকে যে মানব সভ্যতার বিবর্ত্তন তারই কথা যদি থাকে ইতিহাসের পাতায় তবে সেতো ক্রমিক ও ক্রমাগত এবং নিরবচ্ছিন্ন। কালের পরিক্রমার সাথে সেও ছেদহীন ঘটনা প্রবাহ। আর এই নিরবচ্ছিন্ন কালস্রোতে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বাহিত আমাদের এই বিংশশতকের মানব সভ্যতা রাতারাতি গড়ে উঠেনি। কতো যুগের কতো বিচিত্র কর্ম্মচাঞ্চল্যের, কতো

বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন দেশের অবদানে এর ক্রমপরিণতি। এর ব্যাপ্তির প্রতিপদে পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন নিত্য নতুন। গতিশীল প্রবাহের বাঁকে বাঁকে কতোনা নতুন জিনিস এসেছে, মিশেছে; তার রূপের পরিবর্ত্তন হয়েছে। আবার হয়েছে যাত্রা। পরিবর্ত্তন আর গতি এ কোনো কালেই হারায়নি। ইতিহাসকে তাই কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনী সমষ্টি বলে ভাবলে নিশ্চয়ই ভুল হবে। অনাদিকালের আদি থেকে অনন্ত কালের অন্ত অবধি এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বহন করে ইতিহাস; অথচ শত পরিবর্ত্তনে গভীর ভাবে ব্যঞ্জনাময় তার নির্ম্মিতি। ইতিহাস পঠন পাঠনে এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর জোর দিতে হবে। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতার এবং নিরবচ্ছিন্নতায় সূত্র ধরে মূল উপাদানের মৌলিকত্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে একদিকে সত্যের অনুসন্ধানে ইতিহাস হয়ে উঠবে মতবাদ মুক্ত; অন্যদিকে কল্পনার আজগুবি গল্প কাহিনী এবং তার সম্ভাব্য পরিণতির অসম্ভাবনাময় "ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি—" কিম্বা "সম্ভবতঃ—" প্রভৃতির পণ্ডিতী ফানুসে ফুঁ দেবার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ইতিহাস পঠন-পাঠনে এই দিকগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখলে ইতিহাস পড়ায় সার্থকতার পথ সুগম হয়, আর মানুষের অনেক দিনের আকাঙ্খা পূরণের পথে বিশেষ বাধা সৃষ্টি না হয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা বাস করতে পারেনা। সে তাই গড়েছে সমাজ। তাই তার দূর বা নিকট প্রতিবেশীদের সাথে আপদে বিপদে, সম্পদে সমৃদ্ধিতে, পরস্পরে ভাগাভাগি। ধরাপৃষ্ঠে ভিন্নতর পরিবেশে যে ভিন্নতর মানবসমাজ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আচার আচরণ, নিয়মকানুন মেনে চলে; যে কতকগুলি বৈশিষ্টের সমষ্টি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জাত; ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক প্রভাবের তরে এক এবং অবিভাজ্য পৃথিবীর দেহ ছিন্ন বিভিন্ন করে নাম দেওয়া হয়েছে দেশ,—এই ভিন্ন ভিন্ন মানব সমাজ, ভিন্ন জাত, ভিন্ন দেশ,—তাদের কৃষ্টিচর্য্যা, দর্শনবিজ্ঞান, শিল্পবাণিজ্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, আর সেগুলির ধারক ও বাহক হিসেবে মানুষ—সবগুলিই একে অন্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কোনো একটি মানুষকে যেমন একক রূপে, সম্পূর্ণ পৃথকভাবে চিন্তা করা যায়না, তেমনি তার সমাজকে, দেশকে, জাতকে, কৃষ্টিচর্য্যাকে আলাদাভাবে একান্ত পৃথকভাবে ভাবতে পারা যায়না। এগুলি পারস্পরিক আদান প্রদানে পরিবর্ধিত, একে অন্যের অবদানে পরিপুষ্ট। পরস্পর পরস্পরের নিকট নানাভাবে ঋণী। এই ঋণের সহজ ও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি থাকবে ইতিহাসের পাতায়, তাছাড়া বিভিন্ন মানব সমাজে ভিন্ন ভিন্ন আচার আচরণ, নিয়মকানুন, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বেশভূষা,

ভিন্ন আহার্য্য, ভিন্ন ধর্ম্ম,—এই সব টুক্‌রো টুক্‌রো ভিন্নতার পটভূমিকাটি বিশ্লেষণ করে এর অপরিহার্য্য কারণগুলি সম্যক অবহিত হলে এই সব ভিন্নতায় বিরুদ্ধতা বা বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি হবে না ; বরং এই সব বিভিন্নতার মধ্যে একটি সর্ব্বাত্মক ঐক্যের, অভিন্নতার ও সৌসাদৃশ্যের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিভিন্নতাগুলি তখন বৈচিত্র্য বলে মনে হবে। এতে আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তোলার যথেষ্ট সুবিধে হবে।

পৃথিবীর বুকে মানুষ আসবার পর থেকেই তার শুরু হয়েছে অবিরাম সংগ্রাম ; শত্রুসঙ্কুল প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষার জন্যে, খাদ্য পানীয় আশ্রয়ের আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। আজও তার সে সংগ্রামের শেষ নেই, মানুষের মত বাঁচার তরে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করবার তরে। আজকে আমাদের গৃহ, পরিধেয় আহার্য্য, যানবাহন আর চার পাশে যে নানা দ্রব্য সম্ভার দেখছি, যেগুলি আমাদের বাঁচবার তরে অপরিহার্য্য, কিংবা যেগুলি আমাদের দিচ্ছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম,—এর প্রত্যেকটির সাথে জড়িয়ে আছে লাখো বছোরের ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাস, আর আমাদের জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার ক্রমিক অভিব্যক্তির কথা। শত শতাব্দীর সংগ্রামে যা আজ মানুষের করতলগত সেটা কোনো মানুষের একক বা ব্যক্তিগত লাভ নয়, সেটা সমষ্টিগত সকলের। মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছে। গৃহ নির্ম্মাণ করতে শিখেছে। পশুপালনের উপকারিতা বুঝেছে। মাটির বুকে হালের আঁচড় কেটে চাষেবাসে মা-টির স্নেহলাভ করেছে। সে তো আজকে নয়। এক আধদিনে নয়। এদের প্রত্যেকটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে সংখ্যাতীত দিনের সংগ্রাম। আর এই সংখ্যাতীত দিনের অবিরাম সংগ্রামশীল জীবনে বিজয়লব্ধ অভিজ্ঞতায় এমন একটি সার্ব্বজনীন ভাব, উত্তরাধিকারের এমন একটি সাধারণতা এবং আপেক্ষিক নৈকট্য বর্ত্তমান, যেটি মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে করেছে আরো নিবিড়, নিকট। আগুনের ব্যবহার যে বা যারা আবিষ্কার করেছিল তারা যেমন সব মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের পথই প্রশস্থ করেছে, তেমনি পৃথিবীর যে জায়গায় চাষবাসের প্রথম অভিজ্ঞতা সেটা কেবলমাত্র সেই জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের মাটির পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে। তেমনি আজও শিল্পের আর বাণিজ্যের প্রসারে, উৎপাদন শক্তির অপরিমেয় বৃদ্ধিতে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর ব্যাপ্তি আর উন্নতিতে বৈষয়িক ক্ষেত্রে মানুষের যে দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপে অভিযান, তার ফল তো সব মানুষই ভোগ করবে। পারমাণবিক শক্তির প্রেরণায় রকেট ছুটছে আজ চাঁদে আর শুকতারার বুকে। তার ফলে যদি পৃথিবীর জীবন রহস্যের

উদ্ঘাটন হয় তো এ গ্রহের সবাই তাতে হবে উপকৃত। এই সব বিষয়গুলির মধ্যে এমন একটি সর্ব্বকালের বিশ্বজনীন কল্যাণ ও ছেদহীন সম্পর্কের সূত্র নিহিত আছে যে এগুলির আলোচনায় আন্তর্জাতিক মনোভাব স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠে বিদ্যার্থীর মনে অতি সহজেই।

এছাড়া মানুষের সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ আছে। মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে তুলেছে মানুষ সেতো তার জীবনকে সহজতর, সুন্দরতর করে তোলার প্রচেষ্টা মাত্র; বর্ব্বর উদ্দামতার বদলে শোভন শৃঙ্খলতা। তাই মানুষের সমাজ আধৃত নানা নিয়ম আর ধর্ম্মের অনুশাসনে। মানুষের কল্যাণ বুদ্ধির উৎসমুখ থেকে নিঃসৃত শুভঙ্কর এই সমাজ-নীতি। মানুষের সমাজে বিভিন্ন ধর্মগুলি মানুষের অবস্থান ভেদে, সমাজভেদে, মানুষের কল্যাণ কামনাজাত। স্থান ও কালের ব্যবধানে আপাত-দৃষ্টিতে কিছু বিভিন্ন বলে মনে হতে পারে; কিন্তু চিন্তাশীল অনুশীলনে দেখা যায় যে তার মূল সুর ও লক্ষ্য প্রায়ই এক। মাত্রার কম বেশী মাত্র। যুগ-প্রবর্ত্তক ধর্মগুরুদের বাণীর চিরন্তন সত্যতা এক ও অবিভিন্ন। বুদ্ধ কনফুসিয়াস্ যীশু যোরোআস্তার মোহম্মদের কথা তো মানব কল্যাণকামীর অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধ্বনিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য এক ও সমধর্মী।

মানুষের ইতিহাসের পাতায় যেসব ঘটনা দাগ ফেলে রেখে গেছে অম্লান স্বাক্ষরে, তাদের কারণ, প্রয়োজন, ও তাৎপর্য্যের যথাযথ বিশ্লেষণ করলে সবকালের সব মানুষের সার্ব্বজনীন ভাবের আকুতিরই অভিব্যক্তি চোখে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ভারত ইতিহাসের সুপ্রাচীন এক অধ্যায়ে মহারাজ অশোকের ধর্ম্মবিজয় প্রচেষ্টা: তাছাড়া, ইউরোপের রেনেশাঁ, রেফরমেশন, ফরাসী বিপ্লব কিংবা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, লীগ-অফ্-নেশনসের সংগঠন, য়ুনোর সৃষ্টি, মানুষের অধিকারের ঘোষণা,—এসবের মধ্যে দিয়েই অনন্তকালের পরিক্রমার পদক্ষেপে মানুষের মধ্যে যে সার্ব্বজনীন শুভবুদ্ধি, আন্তর্জাতিক মনোভাব, চিন্তাধারার যে গভীর ঐক্য ও নৈকট্য প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অতি সুনিপুণ হাতে কাজ করে যাচ্ছে তার নিদর্শন মিলে। এর অসংখ্য প্রমাণ আছে জাতীয় ইতিহাসের পাতায় পাতায়। এই প্রমাণ নিদর্শনগুলির সার্থকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে অন্য দেশের অনুরূপ ঘটনার সাথে তুলনামূলক অধ্যয়নে, খণ্ডকে অখণ্ডের সাথে, দেশকে বিশ্বের সাথে, ব্যষ্টিকে সমষ্টির সাথে সংযুক্ত করে। এতে মনে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের উদ্দীপন হবে। আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তোলার সহায়ক এরা।

কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য্য যে আমাদের এই মাটির ঘরে আমরা কাটিয়েছি দুর্যোগের বহু রাত। দুর্দ্দাম ঝঞ্ঝাবাতে আমাদের ঘরের দীপশিখা গিয়েছে বহুবার নিভে। আকাশের ঘনঘটা করেছে নৈশ অন্ধকারকে গাঢ়তর। দুঃখের রাত হয়েছে দুঃসহ, দীর্ঘ। অশান্ত ঝঞ্ঝার ঝাপট মাটির স্নিগ্ধ অবলেপনকে করেছে বিধ্বস্ত, ভিত্তিকে করতে চেয়েছে শিথিল, ঘরকে করতে ধূলিসাৎ। তাই দেখি অতীতের ইতিহাসে কোনো অধ্যায়ে কোনো ক্ষমতা লিপ্সু রাজা বা রাজ্য, ক্ষমতার মদগর্ব্বে, অন্ধ মোহে, অন্য দেশের সাথে করেছে যুদ্ধ ঘোষণা। লাখো বিজয়ী সৈন্যের পদাঘাতে ধরণীর স্নেহব্যাকুল বুক উঠেছে কেঁপে, শ্যামল শস্যক্ষেত্র হয়েছে মরুভূমি; ক্রুদ্ধ লুব্ধ লুণ্ঠনে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ও শত নিরপরাধের নির্মম হত্যায় সৃষ্টি হয়েছে নরক। বিধ্বংসী বিমান ছুটেছে লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে, সুনীল আকাশের অপার শান্তি ভেঙে চুরমার করে; নৈশ অন্ধকারে তারা বর্ষণ করেছে মৃত্যু গাঢ় সুপ্তিমগ্ন মানুষের নিরাপদ আবাসে; শ্রী সমৃদ্ধি মণ্ডিত জনাকীর্ণ নগরীকে করেছে নিমিষে ভয়াবহ শ্মশান সম। অসহায়ের আর্ত্তনাদ উঠেছে আকাশে। বিজয়ীর পৈশাচিক জয়োল্লাসের সাথে যুক্ত হয়ে তা আকাশ বাতাস করেছে পূর্ণ। ক্রুরচক্রী রাজনীতিকের আবিল চক্রান্তে মানুষে মানুষে মৈত্রীর বন্ধন হয়েছে ছিন্ন, শান্তির পরিবেশ হয়েছে বিষাক্ত, মানুষের চোখে ফুটেছে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। দেশে দেশে দেখা দিয়েছে শত্রুতা অশিবের সঙ্কেত বহন করে। এ সবের মূলে আছে চরম অসহিষ্ণুতা। এই অস্থির অসহিষ্ণুতা মাতৃস্নেহে লালন করেছে অন্ধ মূঢ় ধর্ম্মোন্মাদনাকে, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামিকে, জাত্যাভিমান আর ঘাতকতাকে। ধাতৃ সুলভ দাক্ষিণ্যে পালন করেছে জাতে জাতে বিজাতীয় ঘৃণা, জিঘাংসা, পাশব প্রবৃত্তি। আবার কোনো অধ্যায়ে দেখি মানুষের অসহায় অজ্ঞতা ইন্ধন জুগিয়েছে জঘন্য স্বার্থপরতার। মুষ্টিমেয় ব্যষ্টি কোথাও সমষ্টিকে করেছে শোষণে পীড়নে জর্জ্জরিত। নিপীড়িত ক্রীতদাসের চোখের জলে আর মূক অভিশাপে মহাকালের যাত্রাপথ হয়েছে পিচ্ছিল, ক্লিন্ন, কলঙ্কিত।

অতীতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর মানুষে মানুষে, হিংসা হানাহানির, জাতে জাতে বিজাতীয় ঘৃণার, কারণগুলির সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হ'লে আর তার ফলাফল পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হ'লে ভবিষ্যতে এগুলি এড়িয়ে যেতে পারা যাবে। মানুষের অশিক্ষা আর অজ্ঞতাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নির্ব্বাসিত করতে পারলে যে বিরোধ এবং সংগ্রামকে পরিহার করা যাবে সে সত্যটিও হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

মানুষের আদর্শ আর বাস্তবে আস্‌মান জমীন্ ব্যবধান। মানুষের যা কাম্য তা পূরণ হতে সময় লাগে, তার জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। তার অবস্থাকে, পরিবেশকে, সেই ভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সংঘাত জেগেছে; প্রাচীন আর নবীনের সংঘাত। নানাক্ষেত্রে নানা চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে এই সংঘাত নিত্য। আর এই নিত্য সংঘাতের মধ্যে দিয়েই ইতিহাসের সৃষ্টি। মানুষের চিন্তার গতি দ্রুততর। তাই মানুষের ভাবধারা অতি দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল। তার সাথে সমান তালে চলতে পারেনা মানুষের সমাজের রীতিনীতি, পরিবেশ, আইনকানুন প্রভৃতি। মানুষ যা কামনা করে চিন্তায় তা রূপায়িত হতে সময় লাগে। শুধু তাই নয় এক যুগে যেটা কাম্য ছিল পরের যুগে মানুষের চিন্তা ধারার দ্রুত পরিবর্ত্তনে হয়তো তার কাম্য হয়ে যায় অন্য, ভিন্ন। আর সেই জন্যে তার মনোজগতের সাথে বাস্তব পরিবেশের একটা ব্যবধান থেকেই যায়। এটা ঐতিহাসিক সত্য। ইতিহাস পাঠের মধ্যে দিয়ে বিদ্যার্থীর মন এদিকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে। চিন্তা ধারার এই ধারাবাহিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের এই যে নব নব সৃষ্টি স্মরণাতীত কাল থেকে, তার রহস্য এতে উদ্ঘাটিত হবে শিক্ষার্থীর কাছে। ইতিহাস সৃষ্টির যাথার্থ্য উপলব্ধি তার কাছে সহজতর হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সত্যের অনুসন্ধানে, বৈচিত্র্য সমন্বিত মানব সভ্যতার ভাণ্ডারে প্রতিটি জাতের প্রতিটি দেশের অবদানের কথা স্মরণে, অতীত ইতিহাসে যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণে, মানুষের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক জীবনের মূল ঐক্যের অনুধাবনের এবং যুগে যুগে মানুষের মধ্যে যে মঙ্গল চিন্তা ও শুভঙ্কর প্রেরণা, সাম্যের ও ঐক্যের, আন্তর্জাতিক মনোভাবের, যে ধারা বহে এসেছে স্মরণাতীত কাল থেকে, তার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গমে, আমাদের বিদ্যালয়ে ইতিহাস পাঠ হয়ে উঠবে সার্থক, সফল,—বিদ্যার্থীর মনে আন্তর্জাতিক মনোভাবের শুভ উদ্বোধনে। মানুষের অজ্ঞতা, অস্থির অসহিষ্ণুতা, স্বার্থপরতা, একদেশদর্শিতা, ধর্ম্মান্ধতা, মানুষের যে অনর্থের সৃষ্টি করেছে তা উপলব্ধি করে, ভিন্ন দেশের, ভিন্ন জাতের, ভিন্ন ধর্ম্মের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল মনের নৈর্ব্যক্তিক কাঠামো তৈরী করে ইতিহাস পাঠ বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলবে এই আশা পোষণ করে আজকের মানুষ।

আমাদের স্কুলে ইতিহাসপাঠ্যক্রম ও বিশ্বইতিহাস।

"ইতিহাস পাড়ানো ও আন্তর্জাতিক মনোভাব" এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি শিক্ষার্থীর মনে আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তোলার কাজে ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব কতখানি এবং স্কুল পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি অনিবার্য্য কারণেই প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ আজ আর কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছেই স্কুল পাঠ্যক্রমে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য নয়। আজকের এই বিংশশতকে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বিজ্ঞানের স্বপ্নাতীত সাফল্যের দানে সমৃদ্ধি মণ্ডিত। অতি দ্রুতগতিতে মানুষের বিজয় যাত্রা চলেছে সাফল্যের পর সাফল্যের বিজয়মাল্য লাভ করে। দেশে দেশে, মানুষে মানুষে, সংযোগ হয়ে উঠেছে সহজতর। এ সংযোগ নৈকট্যে নিবিড় না হলে মানুষের মধ্যে সংহতি আসবে না। সংহতি না এলে মানুষের এই গ্রহে আসবে না শান্তি। শান্তি সংহতির অভাবে সমৃদ্ধি আসবে না, আসবে না সুখ। তাই সুখে, শান্তিতে, সমৃদ্ধিতে, পৃথিবীতে বসবাস করতে হলে দেশে দেশে, মানুষে মানুষে, সংযোগ সাধন করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। আর এর জন্যে অন্যদেশের অন্য মানুষের সাথে আমরা মিলবো, মিশবো, সংযোগ স্থাপন করবো, তাদের কথা আমরা জানবো। তাদের সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবো। জানায় শোনায়, মেলায় মেশায় সম্পর্ক হয় সহজ, দূর হয় নিকট। পার্থক্যের বদলে আসে ঐক্যের বন্ধন, সঙ্কীর্ণতার বদলে উদারতা। সঙ্কোচ কেটে গিয়ে আসে অসঙ্কোচ। বিরাগের বদলে আসে সহানুভূতি। আমাদের সাথে যাদের পার্থক্য আছে আচার আচরণে, সাজে পোষাকে, আহারে বিহারে, ভাষায় ভাবে, এই সব পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান সহজ হবে এই জানা শোনায়। মানুষের মধ্যে যে ঐক্যের মূল সুর সেটি খুঁজে বের করা সহজ হবে এর সাহায্যে। বিশ্বইতিহাস পাঠ এর পথকে অধিকতর সুগম করবে। তাই বিশ্বইতিহাস পড়তে হবে। বিশ্বইতিহাস আমাদের স্কুল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আন্তর্জাতিক মনোভাব শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে তোলবার কাজে বিশ্বইতিহাসের ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এই জন্যে যে বিশ্বইতিহাস পড়া এবং পড়ানো আর আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে তোলার কাজ দুটিই খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

সেই জন্যে স্কুলপাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তির কথা পৃথক ভাবে আলোচনা করতে গেলেই পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়ের কিছু কিছু অনুবৃত্তি হবে। কিন্তু তবু স্কুল পাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তির কথা পৃথক আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতিতে মানুষের গমনাগমনের মন্থরতা কমে গিয়ে হয়েছে দ্রুত। নানা দ্রুতগামী যানবাহনের উদ্ভাবনে দূর হয়েছে নিকট। বিজ্ঞানের আনুগত্যে নানা যন্ত্র এসেছে মানুষের সাহায্যে। গড়ে উঠেছে যান্ত্রিক সভ্যতা। নানা দ্রব্যসম্ভারের প্রাচুর্যে উৎপাদন হয়েছে অভাবনীয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপ্তিতে এসেছে অবিশ্বাস্য প্রসারতা। ব্যবসা-বাণিজ্য আজ জগৎজোড়া। পৃথিবীর আয়তন যেন আজ মানুষের কাছে সীমিত। পৃথিবীর একজায়গার ঘটনা অন্যজায়গায় আলোড়ন সৃষ্টি করে. আজকের পৃথিবীতে কোনো জাত বা কোনো দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একাকীত্বের অগভীর কূপে আজ আর কোনো দেশ আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাতে হবে মৃত্যু। তাই চাই প্রসারতা আর সহাবস্থান। মানুষে মানুষে সহাবস্থানের পটভূমিকা রচনা করার কাজে বিশ্ব-ইতিহাস পাঠ অপরিহার্য্য।

মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির সৌধ গড়ে উঠেছে যুগের পর যুগ ধরে, রাতারাতি হয় নি। এর গঠন ক্রমিক ও নিরবচ্ছিন্ন। এর গঠন সৌকর্যে আছে বিভিন্ন দেশের নানা জাতের অবদান বৈচিত্র্য। মানুষের এ সভ্যতা বিভিন্ন অবদানে বিচিত্র হলেও অদ্ভুত সংহতি-সৌন্দর্যে সমন্বিত। বিচিত্র সুন্দর এই সভ্যতা কোনো দেশবিশেষের একক অবদানে পুষ্ট মোটেই নয়। মানব সভ্যতার উন্মেষের প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসের এমন কোনো অধ্যায় নেই যেখানে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, সংযোগ সাধিত না হয়েছে, একজাতের সাথে অন্য জাতের ভাবের আদান প্রদান না হয়েছে; এক সভ্যতার সাথে অন্য সভ্যতার সংমিশ্রণ না হয়েছে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে এমন কোনো জাত, এমন কোনো দেশ বা এমন কোনো সভ্যতা নেই যে এবিষয়ে সে একক মৌলিকত্ব দাবী করতে পারবে। আমরা বিংশ শতকের মানুষ যে বিচিত্র, সমৃদ্ধ মানব সভ্যতার উত্তরাধিকারী সেই সভ্যতার আসল রূপ হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে এবং এর ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্যে বিশ্বইতিহাস পড়বো এবং পড়াবো।

ইতিহাস মানুষের কথা। ইতিহাস পাঠে আছে সত্যের অনুশীলন ও সত্যের অনুসন্ধান। তাই ইতিহাস পঠন-পাঠনে ইতিহাসের আসল ও অবিকৃত তথ্যের নৈর্বক্তিক রূপটি শিক্ষার্থীর সামনে উদ্ঘাটিত করে তথ্যের ভুল ব্যাখ্যার

(interpretation) এবং সিদ্ধান্তের (conclusion) বিকৃতির সম্ভাবনাটিকে যেমন নিশ্চিহ্ন করতে হবে তেমনি ইতিহাসের সামগ্রিক রূপটিও তার সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। শুধুমাত্র নিজের দেশের বা দুটি দেশের ইতিহাস পাঠ করলে আসতে পারে একদেশদর্শিতা, ইতিহাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, সঙ্কীর্ণতা আর গোঁড়ামি, নিজদেশ ও সভ্যতা সম্বন্ধেও বিকৃত ধারণা। ইতিহাসের এই সামগ্রিক রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারা যায় বিশ্বইতিহাস পাঠের মাধ্যমে।

মানুষের অর্থ নৈতিক আর বৈষয়িক উন্নতিতে মানুষের যে সুখশান্তি এসেছে এর জন্যে যুগপরম্পরায় সবদেশের মানুষের যুক্ত প্রচেষ্টা ও অবদান একান্তভাবে স্বীকার্য্য। যুগের পর যুগ ধরে মানুষের এই প্রচেষ্টার ফলে যে সুখ ঐশ্বর্য্য মানুষ লাভ করছে তা শুধু সীমাবদ্ধ থাকেনি যে দেশ বা জাত এই প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করেছে সেই দেশ বা জাতের মধ্যে। এই সাফল্যের সুযোগ সুবিধে সব দেশ এবং জাত মিলে নির্ব্বিবাদে ভোগ করেছে। আজও মানুষের বৈষয়িক উন্নতি, প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ বিজয়ের সাফল্য, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে তা প্রসারিত হচ্ছে দেশে দেশে সারা পৃথিবীর মানুষের সুখ সুবিধের জন্যে। তাছাড়া শুভঙ্কর মনোবৃত্তির প্রভাবে মানুষের মধ্যে সব সময়েই আছে এক সার্ব্বজনীন মঙ্গল বোধের মূলগত ঐক্য। অনাদি কাল থেকে তার সাক্ষ্য মহাকালের খতিয়ানে উজ্জল অক্ষরে লিখে রেখে গেছে যুগস্রষ্টা মহামানব আর ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের আবির্ভাব। এর সাক্ষ্য বহন করে বুদ্ধ, কনফুসাস, যীশু, যোরোআস্তর, হজরত মোহম্মদ প্রভৃতির প্রচারিত বাণী। এর সাক্ষ্য বহন করে ধর্ম্ম সংস্কার আন্দোলন, দাসত্ব প্রথার লোপ প্রভৃতি আরো কত শত এমনি মঙ্গলকর কাজ। এর সাক্ষ্য বহন করে মানুষের শুভঙ্কর সামাজিক রীতিনীতি; মানুষের সমাজ বোধ, লীগ অফ্-নেশন্‌স, য়ুনো। এই মূলগত ঐক্য বোধের সাথে শিক্ষার্থীর মনকে যুক্ত করার প্রয়োজন আছে। আর সেই জন্যেই প্রয়োজন আছে বিশ্বইতিহাস পড়ার ও পড়ানোর।

যুদ্ধে আনে মহা অনর্থ। যুদ্ধ বাধে মানুষের কুসংস্কারে, অজ্ঞতায়, অসহিষ্ণুতায়, স্বার্থান্বেষী হীনচেতা রাজনীতিকের কারসাজিতে, রাজার রাজ্যলোভে, কোনো জাতের বৃথা দম্ভ ও স্বার্থলোলুপতায়, অত্যাচারে, উৎপীড়নে, শোষনে। যুদ্ধ একবার বাঁধলে যুগ যুগ সঞ্চিত শান্তির অবদান হয় ধ্বংস, ধূলিসাৎ। এই অসৎবুদ্ধিজাত-অমঙ্গলকে পরিহার করতে হবে ভবিষ্যতে। অতীতে মনীষীরা চেয়েছেন একে পরিহার করে চলতে। চেষ্টাও করেছেন

তার জন্যে নানা ভাবে। এ প্রচেষ্টায় সফল হতে হলে পৃথিবীর জাতে জাতে, দেশে দেশে, মানুষে মানুষে, দ্বন্দ্ব দ্বেষের কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। আর এই বিশ্লেষণ হবে সামগ্রিক। এই বিচার বিশ্লেষণে খণ্ডের স্থান নেই। খণ্ডে অপূর্ণতা আসবে। অসহিষ্ণুতার ভাব পরিহার করে মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি, সাম্য, ঐক্য। আর সুখ শান্তি সমৃদ্ধি স্থাপনে অতীত প্রচেষ্টার সাথে বর্ত্তমান দুনিয়ার মানব মনের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। আর তা করতে পারলেই আন্তর্জাতিক মনোভাব মানুষের মনে হবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এর জন্যে বিশ্ব ইতিহাস পড়ার প্রয়োজন আছে।

এই সব সদুদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের দেশের স্কুল-পাঠ্যক্রমে মামুলী, মান্ধাতার আমলের ইতিহাস-পাঠ্যক্রমে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, আর তার জায়গায় হয়েছে বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি। বিশ্বইতিহাসের এই অন্তর্ভুক্তির ফলে আমরা যে কিছুটা অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছি সে কথা শত চেষ্টাতেও অস্বীকার করতে পারা যায় না। সেই অসুবিধেগুলি কি এবং তার প্রতিকার করবার উপায় কি তার সম্বন্ধে আমাদের সরকার, স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক-মণ্ডলী এবং শিক্ষাবিদগণ যে চিন্তা করছেন না এমন নয়। তাঁদের চিন্তাধারার সূত্র ধরে দু-একটি কথা এখানে আলোচনা করা হবে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে যে কোনো জিনিসের শুরুতে, গোড়াপত্তনের যা অসুবিধে তার সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে। প্রথম কাজ শুরু করে নানা ঝঞ্ঝাট ঝামেলা থাকে, আর সে কাজ যদি দুরূহ হয় তাহ'লে তো কথাই নেই। প্রথম অধ্যায় তো কাটে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায়। উদ্দেশ্যকে বাস্তবে হাতে কলমে রূপায়ণ রাতারাতি সম্ভব হয় না। সেটা ক্রমে ক্রমে হয়ে থাকে। আমরা ইতিহাসের শিক্ষকেরা দৈনন্দিন পাঠদান কালে ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তার উপর ভিত্তি করেই দূর করতে চেষ্টা করি শিক্ষার্থীদের অসুবিধে, শিক্ষকদের নিজেদের অসুবিধে। যদি অসুবিধেগুলি প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমাদের সাধ্য-সীমার বাইরে হয় তবে আমরা সে বিষয়ে উচ্চতর মহলের, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করি ঐসব অসুবিধে দূরীকরণের মানসে। তারপর হয়তো চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা, গবেষণা। এমনি করেই ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে আসে সফলতা।

সব থেকে আগে যে অসুবিধে চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে ইতিহাস শিক্ষকের বিশ্ব-ইতিহাসের জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতা সম্পর্কীয়। ইতিহাস-শিক্ষকের

ইতিহাস বিষয় সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে বৈকি। তা না হলে ইতিহাস পড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে কি করে? আমাদের দেশে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর তার অধীন কলেজগুলির কথা বলছি) ইতিহাসের যা সাধারণ পাঠ্যক্রম তার মধ্যে দিয়ে এম, এ, ডিগ্রী নিয়ে এসেও বিশ্ব-ইতিহাসের (প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক এক সাথে) একটি সুষ্ঠু, সামগ্রিক ধারণা হওয়া মুস্কিল। তাই বিশ্ব-ইতিহাস যে ভাবে, যে উদ্দেশ্যে আমাদের স্কুল-পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা পড়াবার মত বিষয় বস্তুতে জ্ঞান, এবং দৃষ্টিভঙ্গি, সাধারণতঃ আমাদের দেশের ইতিহাস-শিক্ষক মশায়দের অতি অল্প সংখ্যকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করে নিজে পড়ে নেওয়া অনেক কারণে অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। যাঁরা অবশ্য দরদী শিক্ষক, যাঁদের সময় সুযোগ এবং অনুকূল অবস্থা আছে তাঁরা পেশাগত দায়িত্বে নিজেদের তৈরী করে নেন। এঁদের সংখ্যা অবশ্য খুবই অল্প। সেই জন্যেই বহু সংখ্যক শিক্ষককেই ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তককে একমাত্র অবলম্বন করে তাঁদের কার্য্য এবং কর্ত্তব্য সম্পাদন করে যেতে হয়। এছাড়া তাঁদের অন্য পথই বা আর কি থাকতে পারে?

তাছাড়া এখন যাঁরা শিক্ষক তাঁরা যে ইতিহাস পড়েছেন, যে গতানুগতিক ভাবে ইতিহাসের পাঠ নিয়েছেন তাঁদের ছাত্রজীবনে, সে ইতিহাস পাঠের সাথে এই অধুনা প্রবর্ত্তিত ইতিহাস পাঠের প্রভেদ অনেকখানি। বর্ত্তমানে পঠন-পাঠনে, পাঠ্যবস্তুর সংকলনে ও সংযোজনে, বিন্যাসে ও ব্যঞ্জনায়, উদ্দেশ্যে ও উপস্থাপনায়,—যে নতুনত্ব ও প্রাণ-প্রাচুর্য্য তার সাথে অতীতের ইতিহাসপাঠ ও তার পাঠ্যক্রমের মিল বিশেষ কিছুই নেই। কাজে কাজেই শিক্ষক মশাইরা নতুন পাঠ্যক্রমের ইতিহাস পঠন-পাঠনে অসুবিধের সম্মুখীন যে হবেনই সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ইতিহাস শিক্ষকের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানের ব্যাপ্তি এবং আনুষঙ্গিক গুণগত (academic) প্রস্তুতি ছাড়া তাঁর পেশাগত প্রস্তুতির কথাও এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। আমাদের পেশা দিন দিন চূড়ান্তভাবে "technical" হয়ে চলেছে। সুতরাং প্রয়োজন বিশেষ জ্ঞানের (specialisationএর)। কিন্তু পেশাগত প্রস্তুতির সময় (অবশ্য কলকাতা য়ুনিভার্সিটির বি, টি, কোর্সের কথা বলছি) কতটুকু সময় আমরা শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকি? পঞ্চাশ নম্বরের ইতিহাস পদ্ধতির জন্যে কতটুকু সময় আমরা দিই? যতটুকু সময় আমরা ইতিহাস পদ্ধতি পড়াবার জন্যে দিই বা

দেওয়া সম্ভব হয় তাতে এই বিষয় সম্বন্ধে পেশাগত প্রস্তুতি সম্যক পূর্ণতা লাভ করে না। পরীক্ষা এমনি জিনিস যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষার দিকে চেয়ে, পরীক্ষা-পত্রের নম্বরের গুরুত্ব অনুসারে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন বা দিতে বাধ্য হন। কতটুকু ব্যক্তিগত সংস্পর্শ এবং সান্নিধ্য, কতটুকু সংযোগ, শিক্ষার্থীদের সাথে ও ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকদের সাথে হয়? অবশ্য সময়ের স্বল্পতা (১০ মাস) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ব্যাপক ভাবে যেখানে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে, সময় বাড়িয়ে দেওয়ার সেখানে অসুবিধেও আছে। এখন তো জরুরী অবস্থা (emergency)। কিন্তু তবুও এই অল্পকালীন অবস্থিতিতেও একটি সুষ্ঠু ও উপযোগী ব্যবস্থার কথা চিন্তা করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। তা ছাড়া পেশাগত প্রস্তুতিতেও সেই রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি আগ্নিকালের ডাইনি বুড়ির মত বিরাজ করছে। যা কিছু মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব, এই পেশাগত প্রস্তুতি দাবি করে সে সবই তো উদরসাৎ করে এই প্রস্তুতিকে অতি সাধারণ, গতানুগতিক "রাবার ষ্ট্যাম্পে" পর্য্যবসিত করে রেখেছে ঐ পরীক্ষা পদ্ধতি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের সমমর্য্যাদা সম্পন্ন ও সমগুরুত্বপূর্ণ দু'একটি বিষয়ের (যেমন বিজ্ঞান, ভূগোল) উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'ল বলে এর অর্থ এই নয় যে কোনো বিষয় বিশেষের উপর দৃষ্টিসম্পাত করা হচ্ছে। এটি বাস্তব সত্য হিসেবে ও আমাদের স্কুলের শিক্ষক মশায়দের পেশাগত প্রস্তুতিতে অসামঞ্জস্যের প্রমাণ হিসেবেই উল্লেখিত হ'ল।

শিক্ষক মশায়দের পেশাগত প্রস্তুতিতে আমরা জীবন্ত পদ্ধতির কথা বলে থাকি; কিন্তু Practice Teaching-এ অনুসরণ করি বহু পুরাণো হার্ব্বার্ট সাহেব প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি। এতো দেউলে হয়ে যাবার লক্ষণ। নতুন দিনের নতুন আলোয় যে জোয়ার এসেছে, নতুন ভাবধারার যে প্রাণবন্যা এসেছে, তাকে বরণ করে নেবার কোনো আয়োজনই নেই। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা আর গবেষণা-প্রসূত আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে প্রগতিশীল দেশগুলি যখন এগিয়ে চলেছে গবেষণালব্ধ ফল একটির পর একটা বাস্তবে প্রয়োগ করে, শিক্ষার সাঙ্গীকরণ করে, আমাদের দেশে শিক্ষক মশায়দের মধ্যে কোনো সাড়া নেই, নেই কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থা যার মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা গবেষণা চালিয়ে গিয়ে নতুন এবং অতি দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে যথোপযুক্ত পদ্ধতির উদ্ভাবনে, বা উপযোগী কৌশলের প্রয়োগ নৈপুণ্যে সামগ্রিক ভাবে ইতিহাস পঠন-পাঠনের কলাকৌশল পরিবর্ত্তিত অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী গড়ে নিতে পারা যাবে। নেই

কোনো সমবেত প্রচেষ্টা, সাধনার দুর্জয় সঙ্কল্প। আমরা ইতিহাসের শিক্ষকেরা নিজেরা যৌথ প্রচেষ্টায় আমাদের পেশাগত শৈলীর পরিবর্ধনে এবং উন্নয়নে বিশেষ কোনো চেষ্টা করিনি, একথা অস্বীকার করে লাভ বিশেষ নেই। মাটির স্নেহরসে পরিবর্ধিত গাছ নিজের ফুল ফোটানোর শক্তি হারিয়ে ফেলে অনিমিষে আকাশের দিকে চেয়ে আছে কবে স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হবে আর সেই আকাশ থেকে বর্ষিত পুষ্প তার শাখায় পল্লবে সজ্জিত হয়ে গাছের শোভা বর্ধন করবে। সেতো আকাশ-কুসুম।

পেশাগত প্রস্তুতির সময়ে স্কুলে ইতিহাস পাঠের নতুন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেওয়া সম্ভব হ'ল, "অভ্যাস পঠন-পাঠনের" (practice teaching) মাধ্যমে তার ভিত্তি কিছুটা দৃঢ়ও করা গেল; কিন্তু পেশাগত প্রস্তুতির বাস্তব প্রয়োগ স্থল শিক্ষক মশায়দের আপন আপন স্কুলে গিয়ে সে ধারণা নানা রকমের প্রতিকূল পরিবেশের ঝঞ্ঝাবাতে নিভে যায়। আর তার পরেই আসে অন্ধকার। তাছাড়া আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য। শিক্ষক-মশায়ের বিষয়ের উপর দখল না থাকলে পদ্ধতি আসবে কোথা থেকে? স্থানকাল পাত্রের তারতম্য অনুসারে, স্থানীয় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে পাঠ-টীকায় পাঠ্যবস্তুর যথোপযুক্ত, প্রয়োজনমত সংবিন্যাস, ও উপস্থাপন, নানা Teaching aids-এর সাহায্য গ্রহণ,—সব কিছুই নির্ভর করে ইতিহাস বিষয়টির উপর শিক্ষক মশায়ের জ্ঞানের উপর, দখলের উপর। বিশ্ব-ইতিহাস আমাদের স্কুল-পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির পর যে ধরনের ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের স্কুলের ইতিহাস-শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন সে ধরণের জ্ঞান কলকাতা য়ুনিভার্সিটির বি, এ, এম্, এ, পাশ করে ঠিক হয় না; অথচ শিক্ষক শিক্ষণ-কলেজগুলিতে ইতিহাসের বিষয়বস্তু পড়ানোর বিশেষ কোনো চাপ বা ব্যবস্থাও নেই। পাঠটীকা প্রস্তুত করার জন্যে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত যতটুকু বিষয়বস্তু পড়ার এবং যেভাবে পড়ার ব্যবস্থা আছে তা সম্যক নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসের বিষয়বস্তু অনুধাবন করা এবং সেগুলিকে শ্রেণীকক্ষে বিদ্যার্থীদের সামনে উপস্থাপন করার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস পড়ার গুরুত্ব আর কলেজে কি বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, এম, এ, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার জন্যে ইতিহাস পড়ার গুরুত্ব এক ধরনের নয়। এ দুই ধরনের পড়ার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তাই যেখানে শিক্ষক

মশায়ের বিষয়ের উপর দখল নেই, এবং বিষয়ের উপর যাতে দখল হয় তার জন্যে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিতে বিষয় পড়ানোর সম্যক ব্যবস্থাও নেই সেখানে পেশাগত প্রস্তুতি কি হবে! শূন্যে সৌধ নির্মাণ।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে সুষ্ঠু এবং যথাযথ পদ্ধতির প্রয়োগ যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন নানা ধরণের Teaching aids-এর সাহায্য গ্রহণ। ইতিহাস বিষয়টির প্রকৃতি এমনি যে এর পঠন-পাঠনে থাকে বেশ কিছু বিমূর্ত্ত চিন্তা। ইতিহাস পাঠ্যক্রমে এমন বহু জিনিস সন্নিবেশিত থাকে যেগুলির সাথে বিদ্যার্থীর বাস্তব জীবনের পরিবেশের বিশেষ কিছুই সম্পর্ক নেই। তাই Teaching aids ছাড়া ইতিহাস পঠন-পাঠন নিরর্থক। Teaching aids ছাড়া ইতিহাস পড়ানো একমাত্র সম্ভব তখনই যখন ইতিহাস পাঠ্য পুস্তকের আবশ্যকীয় এবং তলায় দাগ-দেওয়া-পঙক্তি শিক্ষার্থীকে বার বার পড়তে বলে মুখস্থ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করা যায়। সেটা তো ঠিক ইতিহাস পড়ানো নয়, সেটা অন্য কিছু। তাই ইতিহাস পাঠে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার করতে হবে, ঐতিহাসিক মানচিত্র, চিত্র, চার্ট, মডেল, ডায়াগ্রাম, সম্ভবস্থলে সময়রেখা, প্রভৃতি ব্যবহার না করলে ইতিহাসের পাঠ আদৌ হয় না। আজ কাল সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতে সবাক চলচ্চিত্র, টেলিভিসন, প্রভৃতির সাহায্য নেবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে আমরা শিক্ষা-ভ্রমণ, তর্ক, আলোচনা নাটকাভিনয় প্রভৃতির সাহায্য নিতে পারি। কিন্তু আমাদের স্কুলগুলিতে এসব ধরনের Teaching aids-এর ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য বৈকি। ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষের কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু সাধারণ শিক্ষোপকরণ-গুলিরও একান্ত অভাব। আর এগুলির অভাব থাকলে ইতিহাস পড়ানো দুষ্কর।

নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে ইতিহাস পড়ানোর কাজে পাঠ্যপুস্তক আর একটি অসুবিধের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে অধিকাংশ ইতিহাস শিক্ষকের বিশ্ব-ইতিহাসের সামগ্রিক জ্ঞানের অভাব, তাই ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের উপরই তাঁদের সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। ইতিহাসের স্কুলপাঠ্য পুস্তক-গুলিতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনে, বিন্যাসে ও উপস্থাপনে কি নীতি অনুসরণ করা হয় তা অনেক সময় বোঝা যায় না। কেবলমাত্র "বোর্ড অফ্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন" (ওয়েষ্ট বেঙ্গল)-এর নির্দিষ্ট বিষয়গুলির সঙ্কলনে, সমাহারেই তো পাঠ্যপুস্তক রচনা হয় না। শুধু শুষ্ক বিষয় বস্তুর পর পর সঙ্কলনে পাঠ্য পুস্তকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তার জন্যে প্রয়োজন সুষ্ঠু বিন্যাসের। সুষ্ঠু বিন্যাসে পাঠ্যপুস্তক জীবন্ত হয়ে উঠে। জীবন্ত না হলে পাঠ্যপুস্তক কতকগুলি

নীরস বিষয়বস্তুর সংযোজন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকগুলিরই সেই দশা। পাঠ্য পুস্তকের ভাষা, ছাপার ভুল, ছাপাই, চিত্র ও মানচিত্রের সমাবেশের কথা তো বাদ দেওয়াই ভাল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের স্কুল-পাঠ্যক্রমে বিশ্ব-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি সে উদ্দেশ্যকে সফল ও সার্থক করে তুলতে হলে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন।

স্কুলের লাইব্রেরীগুলির দুরবস্থার কথা আমাদের অজানা নয়। অধিকাংশ স্কুলেই একটির বেশী ইতিহাসের দুটি পাঠ্যপুস্তক মেলা ভার। বিশ্ব-ইতিহাসের ভাল "রেফারেন্স" বইও খুব কম স্কুলেই আছে। যেখানে বা আছে সেখানেও ইতিহাসের শিক্ষক মশায় হয়তো সেগুলি পড়বার বা দেখবার অবকাশ পান নি।

এগুলি ছাড়া স্কুলের পরিবেশ, অভিভাবকদের মনোভাবও অনেক সময় ইতিহাস শিক্ষকের নতুন পাঠ্যক্রম নতুন পদ্ধতিতে পড়ানোর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলে ও স্কুলের বাইরে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় ইতিহাসের শিক্ষককে। বেচারা যদি একা পড়েন তো অনেক সময় দমে যেতে হয়। এতেও বেশ খানিকটা অসুবিধে হয় অধুনা প্রবর্ত্তিত বিশ্ব-ইতিহাসের পঠন-পাঠনে।

এছাড়া আছে পরীক্ষা। স্কুলের মধ্যে অর্দ্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা আর স্কুল-পাঠ্যক্রমের শেষে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা। সেখানে আছে নিদ্ধারিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করবার ব্যাকুলতা। আর আগ্নিকালের গতানুগতিক পরীক্ষা-প্রশ্নের উত্তর দানের চিরন্তন বিড়ম্বনা। এই পরীক্ষা পদ্ধতিও বিশ্ব-ইতিহাস পঠন-পাঠনে এবং তার উদ্দেশ্যের সার্থক রূপায়ণে অনেকখানি অসুবিধের সৃষ্টি করে।

নব প্রবর্ত্তিত ইতিহাস-পাঠ্যক্রমের পঠন-পাঠনে এমনিতরো নানা সমস্যা ও অসুবিধে আমাদের আছে। সব কাজে সব সময়েই সমস্যা থাকবে, নতুন সমস্যা জাগবে। সমস্যাহীন কাজ দুর্লভ। বিশেষতঃ আমাদের যা পেশা তাতো সমস্যা জর্জ্জর। সমস্যাকণ্টকিত পথেই তো আমাদের আনাগোনা। সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তার সমাধান করার মধ্যেও আনন্দ আছে, আছে সন্তুষ্টি। এই সব সমস্যা দেখে ভয় পেলে চলবে না। সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

ইতিহাস শিক্ষকের জ্ঞানগত প্রস্তুতি নিয়ে যে অসুবিধের সৃষ্টি হচ্ছে তা সমাধান করতে গেলে জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে ট্রেনিং কলেজগুলিতে পদ্ধতি পড়ার সাথে বিষয় (Contents) পড়ানোর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে

বর্ত্তমান বি টি, পাঠ্যক্রম অনুযায়ী তিনটি স্কুল পাঠ্য বিষয় ও পদ্ধতির সম্বন্ধে না পড়ে (বিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ে অবশ্য কিছুটা স্বতন্ত্র অবস্থা) দুটি বিষয় পড়ার ব্যবস্থা করে তার সাথে প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু পড়ার জন্যে একশো নম্বর ও পদ্ধতি পড়ার জন্যে পঞ্চাশ নম্বর করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থায় ইতিহাসের বিষয়-শিক্ষক অধুনা প্রবর্ত্তিত স্কুলপাঠ্যক্রমের বিশ্বইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে পড়বেন এবং পেশাগত দায়িত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুধাবন করবেন। পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়বস্তু-গুলি অধীত হবে বলে এর ব্যবহারিক মূল্য বেশ খানিকটা থাকবে। এছাড়া অন্য রকমের ব্যবস্থা ও করা যেতে পারে ; ইতিহাস-শিক্ষকদের জন্য ছ-মাসের একটি পৃথক পাঠ্যক্রম করে তাঁদের বিশ্বইতিহাসের বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি পড়বার ব্যবস্থা করাও যেতে পারে। এই পাঠ্যক্রমটি সাধারণ কলেজে বা ট্রেনিং কলেজ-গুলিতে চালু করা যেতে পারে। এই পাঠ্যক্রমটি পড়বার সময়ই স্কুলপাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব কি সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়ে যাবে। যে ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বইতিহাস উপস্থাপিত করা হবে এবং বিশ্বইতিহাসের যে যে দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবার প্রয়োজন আছে সেগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়ে পড়বার ব্যবস্থা থাকলে কাজ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

মোট কথা স্কুল-পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিশ্বইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করবার একটি যুক্তিসম্মত ব্যবস্থা ও সুযোগ শিক্ষক মশাইদের সামনে তুলে ধরতে হবে ; তা সে ছ-মাসের বা এক বছরের বিশেষ পৃথক-পাঠ্যক্রমেই হোক বা ট্রেনিং কলেজে পেশাগত প্রস্তুতির সময় বিষয়-পদ্ধতির জ্ঞানার্জ্জনের সময়ই বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সুচিন্তিত এবং উপযুক্ত পাঠ্যক্রমই হোক।

পেশাগত প্রস্তুতিতে যে অসুবিধে তা অনেকটা নিরসন হবে বিষয়গত জ্ঞানের ব্যাপ্তিতে। তারপর পদ্ধতি সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা নেবার জন্যে সমবেত ভাবে চেষ্টার প্রয়োজন। ট্রেনিং কলেজগুলির ইতিহাস-পদ্ধতি পড়ানোর অধ্যাপক ও স্কুলের ইতিহাস পড়ানোর অধ্যাপকদের নিয়ে একটি সংস্থা গড়ে তুলে তার মাধ্যমে আলাপ আলোচনায়, সেমিনারে, ওয়ার্কশপে, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি অনুধাবনে, কোনো পত্রিকা প্রকাশনের মাধ্যমে, যুগোপযোগী পদ্ধতির অনুসরণ করাটা একটা খুব দুরূহ কাজ বলে মনে হয় না। সরকারী সাহায্যে দেশ বিদেশের স্কুলের অভিজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষকদের আমাদের দেশে আমন্ত্রণ করে এনে আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থা ও পরিবেশের সাথে তাদের পরিচিতি ঘটিয়ে তাঁদের সাথে যুক্তি করা, তাঁদের নিজ নিজ দেশের পরিবেশের পরি-

প্রেক্ষিতে তাঁরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা শোনা, আমাদের দেশের অভিজ্ঞ ইতিহাস-শিক্ষকদের অন্য প্রগতিশীল দেশে পাঠিয়ে সেখানকার বাস্তব অবস্থায় ইতিহাস পড়ানোর অনুসৃত পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করা—এই সব উপায়ে বহু অসুবিধে যেমন দূর করা যায় তেমনি সুষ্ঠু, বিজ্ঞানসম্মত, ও বাস্তবধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করার পথও প্রশস্ত হয়। ট্রেনিং-কলেজগুলি থেকে পেশাগত প্রস্তুতি সমাধা করে ইতিহাসের শিক্ষকমশায়রা নিজ নিজ স্কুলে ফিরে গিয়ে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করতে কি কি বাধা বা অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছেন তা অনুসন্ধান করবার জন্যে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁদের দৈনন্দিন পঠনপাঠনে সবরকমের অসুবিধে দূর করবার জন্যে, এবং শিক্ষকমশায়দের সক্রিয় সাহায্য দেবার জন্যে ট্রেনিং কলেজগুলিতে Extension service বা অনুরূপ কোনো সংস্থা সরকারের আনুকূল্যে গঠন করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনামত কাজ করলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। এটি শুধু ইতিহাস কেন অন্যান্য সব বিষয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। এই রকম সংস্থা সব ট্রেনিং কলেজের সাথেই যুক্ত থাকবে। এক একটি ট্রেনিং কলেজের নির্দিষ্ট এলাকা থাকবে। ঐ এলাকার সব স্কুলই ঐ সংস্থার আওতায় আসবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন কোনো স্কুল এমনিতরো সংস্থার সাথে সংযুক্তি থেকে বাদ না যায়।'

বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুলেই ইতিহাস শিক্ষোপকরণের—যেমন ঐতিহাসিক মানচিত্র, লেখ, মডেল প্রভৃতির—অভাব আছে। আবার অন্যান্য "aids"-এর ও, যেমন শিক্ষা ভ্রমণ, নাটকাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রভৃতির তেমন বিশেষ ব্যবস্থা নেই এবং কোনো কোনো বিষয়ের একেবারেই নেই। ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ নেই। এসব অভাব দূরীকরণের জন্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক মশায়দের সহানুভূতি চাই। আর চাই ইতিহাস শিক্ষকের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ইতিহাস-শিক্ষক মশায়ের এসব বিষয়ে অনেক কিছু করবার আছে। ঐতিহাসিক মানচিত্র, টাইম লাইন, টাইমচার্ট বা অন্য ধরণের বিভিন্ন লেখ, চিত্র, মডেল প্রভৃতি ছাত্রদের সাহায্যে নিজ তত্ত্বাবধানে, আবশ্যক হলে স্কুলের ভূগোল-শিক্ষকের এবং Craft-শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে ক্রমে ক্রমে তৈরী করে নিতে পারেন। আবশ্যক মত পাঁচ বছরের বা সাত বছরের একটি পরিকল্পনা ও নেওয়া যেতে পারে এই ব্যাপারে। ইতিহাস পঠন-পাঠনের চার্ট, মডেল প্রভৃতি তৈরী করার ছোটোখাটো প্রোজেক্ট ও নেওয়া যেতে পারে। প্রোজেক্ট নিলে "Learning by doing"-ও হয়। এতে অল্প খরচে অনেক ভাল, মনোমত এবং স্থায়ী শিক্ষোপকরণ ক্রমে ক্রমে তৈরী করে নেওয়া যেতে

পারে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্তে ট্রেনিং কলেজগুলিতে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতির পদ্ধতি শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষোপকরণ প্রস্তুত করবার বিষয় ও হাতে কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ট্রেনিং কলেজগুলির বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা আর্টস ও ক্র্যাফ্‌টস্ শিক্ষকের সাহায্য সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে একাজ সম্পাদন করতে পারবেন বলে আমরা মনে করি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। সে কথাটি হচ্ছে এই যে ট্রেনিং কলেজগুলিতে বিজ্ঞানের ও ভূগোলের ল্যাবরেটারী আছে, কিন্তু ইতিহাসের ল্যাবরেটারী যাকে আমরা "ম্যুজিয়ম" বলি অধিকাংশ কলেজেই তা নেই। এদিক থেকে আমাদের ট্রেনিং কলেজগুলির অবস্থাও প্রায় আমাদের স্কুলগুলিরই সমান। ইতিহাস বিজ্ঞান কিনা সে বিতর্কমূলক আলোচনা ছেড়ে দিয়েও একথা স্বীকার্য্য যে "ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি" বিজ্ঞান পদবাচ্য; তার জন্যে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন এবং সেই জন্যেই প্রয়োজন তার "প্রেক্ষাগৃহ"। ট্রেনিং কলেজে ইতিহাসের "ম্যুজিয়ম" থাকার প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে আরও অনেক যুক্তি দেওয়া যেতে পারে এবং বিশদ ভাবে আলোচনাও করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে তা প্রাসঙ্গিক হবে না। তাই এ প্রসঙ্গের জের মিটিয়ে আমরা যা আলোচনা করছিলাম তাতে ফিরে আসি। শিক্ষোপকরণ তৈরী করা ছাড়াও স্কুলের ইতিহাস অধ্যাপক আরও কিছু করতে পারেন। তাঁর নানা জিনিস সংগ্রহ করবার ঝোঁক থাকবে। যেখানেই তিনি যাবেন তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থাকবে কোন্ জিনিসের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, বা কোন জিনিস ইতিহাস পড়ানোর কাজে শিক্ষোপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারবে। সেই সব জিনিস তিনি সংগ্রহ করবেন। এতে শিক্ষোপকরণের অভাব অনেক পরিমাণে কমবে। প্রধান শিক্ষকমশায়ের এবং স্কুলকমিটির সহানুভূতি ও সহযোগিতায় এবং সরকারী আনুকূল্যে অন্যান্য aids-এর যথাযথ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইতিহাস পঠন-পাঠনে যথাযথ aids এর ব্যবস্থা হলে বিশ্বইতিহাস আমাদের স্কুলগুলিতে পড়ানোর অসুবিধে হবে না।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক-সংশ্লিষ্ট অসুবিধে দূর করতে হলে পাঠ্যপুস্তকের সুনির্ব্বাচনের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। দেখতে হবে যে বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু বিন্যাসে ও বিশ্লেষণে, মননশীলতায় এবং পরিকল্পনায় ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। নাম ভাড়া-দেওয়া-লেখকের লিখিত ইতিহাস-পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে সতর্ক এবং জাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে। লেখকের বই লেখার অধিকার এবং অনধিকারের কথা চিন্তা করতে হবে। দেখতে হবে পাঠ্যপুস্তক-লেখক পুস্তকলেখার

ব্যাপারে যথেষ্ট সময় যেন পান। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের স্কুলের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখে আমাদের দেশের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে, ছাপার, প্রচ্ছদপটের, ভাষার, বিষয়বিন্যাসের, চিত্রসংযোজনের দিকে দৃষ্টি রাখলে পাঠ্য-পুস্তক জীবন্ত হয়ে উঠবে। স্কুলে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে, ইতিহাসের "রেফারেন্স" বই ও একাধিক পাঠ্যপুস্তক রেখে শিক্ষক মশায়দের ও বিদ্যার্থীদের গ্রন্থাগারে পড়বার অভ্যাস সৃষ্টি করে বহু অসুবিধে দূর করা যাবে।

স্কুলের মধ্যের ও স্কুলের বাইরের অসহযোগী পরিবেশ এবং অভিভাবকদের বিরুদ্ধ মনোভাব পাল্টে দেওয়া যায় ইতিহাস শিক্ষকের একান্ত নিষ্ঠায়, প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায়। পরীক্ষা সংস্কার সাধনের জন্যে নানা পরীক্ষা ও গবেষণা শুরু হয়ে গেছে সরকারী প্রচেষ্টায়। অদূর ভবিষ্যতে পরীক্ষার সামগ্রিক রূপটি যেমন পালটাবে তেমনই ইতিহাস পরীক্ষার ধরনও বদলাবে।

এমান করেই আমাদের স্কুলগুলিতে বিশ্বইতিহাস পড়ানোর অসুবিধেগুলি ক্রমে ক্রমে অপসারিত হবে আর বিশ্বইতিহাসের সফল পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়েই হবে স্কুলপাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাস অন্তর্ভুক্তির যে উদ্দেশ্য তার সার্থক রূপায়ণ।

ইতিহাসের পাঠ্যক্রম

ইতিহাসের পাঠ্যক্রম আমাদের স্কুলে প্রবর্ত্তিত হয়েছে "যুনেস্কোর" সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে। বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি আমাদের স্কুল-পাঠ্যক্রমে আমরা করেছি। এতে ছাত্রছাত্রীদের আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে উঠবে, অশান্ত এই বিশ্বে দেশে দেশে, জাতে জাতে, পরস্পর বোঝাপড়া ভাল হবে। এইরকম নানা যুক্তি আছে এর পিছনে। বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব জাগিয়ে তোলা, আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে তোলা,—এগুলি তো ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্যর সাথে সংশ্লিষ্ট। একটু তলিয়ে দেখলেই চোখে পড়বে যে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনা সম্বন্ধে, সংশ্লিষ্ট-ব্যক্তিদের, ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য ছাড়াও যেন অনেক কিছু বলার থেকে গেছে।

ইতিহাসের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার কারণও আছে। বস্তুতঃ ইতিহাসের সর্ব্বজন-স্বীকৃত. আদর্শ পাঠ্যক্রম বিরল। তা রচনা করাও যায় না। সেটা করা উচিতও নয়। তার কারণ আছে। কারণ একটি নয়, একাধিক। কারণগুলি অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে "ইতিহাস" এই বিষয়টির বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের প্রধান উপাদান মানুষ। বিচিত্র মানব-সভ্যতার বিচিত্রতর অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট এবং পরিবর্ধিত ইতিহাসের ধারা। নিত্য-গতিশীল সে ধারার যেমন আদি নেই, তেমনি অন্তও নেই। গতির ছন্দে সে বহুমুখী। এই বহুমুখী রচনায় সমৃদ্ধ ইতিহাস পঠন-পাঠনে সার্ব্বজনীন স্বীকৃত "ফরম্যুলা" ইতিহাসের পাঠ্যক্রম বিন্যাসে উপযোগী হবে না। বিবিধের মাঝে ঐক্য খুঁজতে হবে, সে ঐক্য হবে সার্ব্বজনীন সত্য। তাতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের শিক্ষকেরা যে ভাবে অগ্রসর হবো ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনায়,—ইংলণ্ডে বা আমেরিকায়, রাশিয়ায় বা ফ্রান্সে হুবহু সেই ভাবে এবং সেই পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া হয়তো ঠিক হবে না। শুধু ফ্রান্স আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া কেন, আমাদের দেশে, পশ্চিমবাংলায় আমরা যে ভাবে করবো ইতিহাস পাঠ্যক্রমের বিন্যাস, ঠিক সেই ভাবে, সেই পদ্ধতিতে হয়তো পাঞ্জাবে, বোম্বাইয়ে, বা মাদ্রাজে পাঠ্যক্রম রচনায় অসুবিধে হবে।

ঠিক এই প্রসঙ্গেই মনে আসে বিদ্যালয়ের স্কুল পাঠ্যসূচীর উপর স্থানীয়

ইতিহাসের প্রতুল ও বিস্ময়কর প্রভাবের কথা। আমরা সকলেই আজ স্বীকার করি যে স্কুল কেবলমাত্র একটি ইট কাঠ পাথরের তৈরী মৃত প্রতিষ্ঠান নয়। আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্কুল জীবন্ত সমাজ, কর্ম্মচাঞ্চল্যে প্রাণময়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের প্রেরণায় ভরপুর। পরিবেশের সুখদুঃখ হাসিকান্না, আশা আকাঙ্খা, সন্দেহ-সংশয় সেখানে প্রতিফলিত। তাই পরিবেশের প্রভাব সেখানে অপরিহার্য্য। পরিবেশের সাথে স্কুলের সাক্ষাৎ সংযোগ অনস্বীকার্য্য। বিদ্যার্থী তার জীবন পরিক্রমায় পরিচিত হয় সর্ব্বপ্রথমে তার নিকট পরিবেশের সাথে। আর সেই নিকট পরিবেশের প্রভাব তার জীবনে অবিচ্ছেদ্য। বিদ্যার্থীর জীবনে তার পরিবেশে যা ঘটেছে আর ঘটছে এ দুয়েরই মূল্য অপরিমেয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে আপনার নিকট পরিবেশে যা ঘটে গিয়েছে তার স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলির সাথে আমার পরিবেশের অতীত ঘটনা সম্বলিত স্থানগুলির সাথে যেমন মিল নেই তেমনি আমার পরিবেশে যে গাজনের, টুসুর বা ইঁদপরবের মেলা বসে বহু প্রাচীনকাল থেকে, আর সেই সব মেলায় যে স্থানীয় শিল্পীরা কাঠের ঘোড়া, মাটির পুতুল, বিক্রী করতে বসে তাদের সাথে আপনার পরিবেশের মেলা বা তার "traditi⸱⸱n"-এর হুবহু মিল নিশ্চয়ই নেই। আমার পরিবেশের যে সব লৌকিক আচার বহুকাল থেকে মানুষের জীবন ধারার সাথে একই গতিতে চলে এসেছে আপনার পরিবেশের সেইসব লৌকিক আচার প্রভৃতির থেকে অন্ততঃ কিছুটা বিভিন্ন। স্থানীয় পরিবেশের এই বিভিন্নতার দরুণ ইতিহাসের পাঠ্যসূচী যে সবজায়গায় একই ছাঁচে ঢালা হবে না সেটা সহজেই বোঝা যায়।

যে সমস্ত দেশে শিক্ষার সংগঠন-কাঠামো একই ছাঁচে ঢেলে গড়া হয়নি, যেখানে বিকেন্দ্রীকরনের দরুন যথেষ্ট বিকল্প ব্যবস্থার স্থান আছে সে সমস্ত দেশে একটি সার্ব্বজনীন, ও সব স্কুলে প্রযোজ্য ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর "ফরমূ্যলা" মেনে নিলে সেখানকার সংগঠন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য লোপ পাবে আর তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। উদাহরণ স্বরূপ ইংলণ্ডের শিক্ষাসংগঠন-কাঠামোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে বিভিন্ন 'Stream" সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের স্কুল। Stream কোথাও বা তিনটি চারটি কোথাও বা একটি দুটি। সেখানে ইতিহাসের একই পাঠ্যসূচী অচল। সেখানে অবস্থার সাথে খাপ-খাইয়ে পাঠ্যক্রমে বৈচিত্র্য রাখতেই হবে। আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার সংগঠনকাঠামোতে কেন্দ্রীয়করনের ছাপ রয়েছে যথেষ্ট সেখানেও বর্ত্তমানে জুনিয়ার হাইস্কুল, সিনিয়ার বেসিক স্কুল, দশমশ্রেণীযুক্ত ও একাদশশ্রেণীযুক্ত স্কুল,

কিংবা মিশিওনারী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির কথা চিন্তা করলে ইতিহাস পাঠ্যক্রমের একটি সার্ব্বজনীন "ফরম্যুলা" মেনে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় বলেই মনে হবে।

তাছাড়া বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীদের এবং বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নানা কারণে সমান নয়। আমাদের দেশে অবশ্য শিক্ষার্থীদের বয়েসের পরিমাপে তাদের যোগ্যতা পরিমাপ করার নানা অসুবিধে আছে। শ্রেণী হিসেবে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা মাপ করবারও বাধা অনেক। আবার সব স্কুলের একই শ্রেণীর মান সমান নয়। পরিবেশ অনুসারে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা কমবেশী হয়ে থাকে। একটি সহরের ভালো স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা নিশ্চয়ই দূরতম পল্লীর নিভৃতে যে বিদ্যালয়টি টিম্‌টিম্ করে চলছে তার সপ্তমশ্রেণীর ছাত্রদের চেয়ে স্বভাবতই কিছু উচ্চ মানের। সুতরাং যেহেতু সব বিদ্যার্থীর যোগ্যতা সমান নয়, এবং সব স্কুলের মানও সমান নয় সেই জন্যেই ইতিহাসের একটি "য়্যুনিফর্ম" পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না।

স্কুলের ইতিহাস-পাঠ্যক্রম রচনা করবার সময় যেমন স্কুলের অবস্থান, পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বিচার করতে হবে তেমনি ইতিহাস শিক্ষকদের সামর্থ্য তাঁদের পেশাগত প্রস্তুতি এক কথায় ইতিহাস শিক্ষককে দেখতে হবে। ইতিহাস শিক্ষকের হাতেই তো ইতিহাস পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শগুলি শ্রেণীকক্ষে রূপায়ণে সার্থকতা লাভ করবে। শ্রেণীকক্ষে ইতিহাসের আলোচনায়, শিক্ষার্থীর কাছে তার উপস্থাপনায়, বর্ণনায়, প্রশ্নে, অভিযোজনায় পঠন-পাঠনের প্রতিটি পদক্ষেপে ইতিহাস-শিক্ষক এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে ইতিহাস পাঠ্যক্রমের সাথে জড়িত যে ইতিহাস শিক্ষককে বাদ দিয়ে ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনার কথা চিন্তাই করা যায় না। ইতিহাস-পাঠ্যক্রমের উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষকমশায় তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যকেও শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত না করে পারেন না। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে শিক্ষকের পবিত্র দায়িত্ব ও তাঁর বৃত্তিগত সদাশয়তা ও ব্যক্তিগত সৌজন্য বশতঃ তিনি কোনো বিশেষ মতবাদ বা রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করবেন না—এমন কি তিনি নিজে তাতে বিশ্বাসী ও অনুরক্ত হলেও। কিন্তু একথাও ঠিক যে যতো ইতিহাস শিক্ষক আছেন তাঁদের ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির যে মান তার গড় নির্ণয় করে এবং সেই হিসেবের উপর নির্ভর করে একটি ফরম্যুলা তৈরী করে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনা করা যায় না। তবে স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে মূল কাঠামোটি ঠিক করে নিতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। কিন্তু ইতিহাস পাঠ্যক্রমের

মূল কাঠামোটি ঠিক করে নিলেও একথা বলা প্রাসঙ্গিক বলেই আমরা মনে করি যে তার মধ্যে থাকবে স্বাধীন প্রযোজনার, যুক্তিনির্ভরশীল দৃষ্টিভঙ্গির, বাস্তব প্রয়োগ কৌশলের যথেষ্ট অবকাশ। এক কথায় বৈচিত্র্য সমাবেশ করবার সুযোগ সেখানে থাকা প্রয়োজন; বৈচিত্র্যেই পঠনপাঠনে আসে সমৃদ্ধি। কিন্তু সংহতি বাদ দিয়ে নয়।

ইতিহাস পাঠ্যক্রমের রূপায়ণ নির্ভর করে এ বিষয়টি পড়ানোর পদ্ধতির উপর। যদিও শিক্ষকমশায় নিজেই পদ্ধতির প্রায় প্রতিমূর্ত্তি তবুও পদ্ধতির স্বতন্ত্র রূপ আছে। সফল রূপায়ণ নির্ভর করে শিক্ষোপকরণ (Teaching aids and appliances) পুস্তক সরবরাহ, গ্রন্থাগারের সুখসুবিধে, ইতিহাস শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতি প্রভৃতির উপর। এই সব অতি আবশ্যকীয় বিষয়-গুলির অভাবে ইতিহাস শিক্ষকের যোগ্যতা অনেক সময় কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। সেই জন্যে পদ্ধতির মধ্যে আসে অহেতুক আলস্য, তার গতি হয় শ্লথ, পঠনপাঠন হয় মামুলী, দায়-সারা। এ ছাড়া পরীক্ষা (স্কুলের পরীক্ষা নয়, বাইরের) আছে। এই পরীক্ষার প্রভাব ইতিহাস-পাঠ্যক্রম রচনায় অনস্বীকার্য্য। শ্রেণী-কক্ষে ইতিহাস-শিক্ষক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের অভিনবত্বে, অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায়, সুষ্ঠু সৌকুমার্য্যে, যতই কুশলী হোননা কেন,—পরীক্ষা আর তার ফলাফলের কথা মন থেকে কখনই তিনি মুছে ফেলতে পারেন না। তাই পরীক্ষার প্রভাব ইতিহাস পাঠ্যক্রম-বিন্যাসে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কোনো কোনো মহলে আবার বলা হয়ে থাকে যে উপযুক্ত ইতিহাস শিক্ষকের সংখ্যার উপরেও ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনা অনেকাংশে নির্ভর করে। তার কারণ হিসেবে বলা হয় যে পাঠ্যক্রম রচনা করে যদি তা রূপদেবার লোক না থাকে তাহলে তা হয় অবাস্তব এবং তার উদ্দেশ্য হয় ব্যাহত।

তাহলে কি ইতিহাস পড়াবো ?

ইতিহাসের একটি সর্ব্বজনস্বীকৃত, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে প্রযোয্য পাঠ্যক্রম রচনা করা যায় না বা তা করা উচিতও নয়—এই আলোচনার পর আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করে নেওয়া আবশ্যক। প্রশ্নটি হচ্ছে কি ইতিহাস পড়াবো আমরা ? আমাদের স্কুলের ছেলে মেয়েদের যে ইতিহাস পড়াবো, তাতে আজ আর দ্বিমত নেই। কিন্তু 'কি ইতিহাস পড়াবো', তা নিয়ে নানা যুক্তিতর্কের অবকাশ আছে। কি ইতিহাস পড়াবো ? এই প্রশ্নটি মূলতঃ ইতিহাস-পাঠ্যক্রম রচনার সাথে জড়িত। স্কুলের ইতিহাস-পাঠ্যক্রম রচনা কালে কি ইতিহাস আমরা পড়াবো সে ধারণা পরিস্কার থাকা চাই। কি ইতিহাস পড়াবো

সেটি নির্ভর করে কতকগুলি বিষয়ের উপর। সুতরাং সেগুলির দিকেও সম্যক দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথম কথা, বিদ্যার্থীর বিদ্যালয়-জীবনের দীর্ঘতা, অর্থাৎ কতদিন বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে অবস্থান করবে, তার উপর বিদ্যালয়ে ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনা করা অনেকাংশে নির্ভর করবে। কারণ ইতিহাস এই বিষয়টির পরিধি এবং বিস্তৃতি এত ব্যাপক এবং এর উপাদান এতই বিচিত্র যে এই বিষয়টির সাথে বিদ্যার্থীর সম্যক পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্যে হাতে সময় কতটুকু পাওয়া যাবে তার উপরে অনেক খানি নির্ভর করবে এর পাঠ্যক্রম রচনা ও বিন্যাস সাধনের। দ্বিতীয় কথা, আমাদের মনে রাখা দরকার যে বেশীর ভাগ ছাত্রই স্কুলজীবনের পর ইতিহাস পড়বার অবকাশ আর পাবে না। একথা অবশ্য কোনো একটি বিশেষ দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য নয় এটা সারা দুনিয়ার, সব দেশের ছাত্রদের পক্ষেই প্রযোজ্য। আর্থিক অস্বচ্ছলতা, খুব তাড়াতাড়ি রুজি রোজগারের তাগিদ, বিদ্যার্থীর সংসারের ও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিদ্যার্থীর সামাজিক অবস্থা, মনীষা প্রভৃতি নানা কথা বিবেচনা করে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে যে সাধারণ ছাত্রেরা অর্থাৎ শতকরা পঁচাশি থেকে নব্বই জন শিক্ষার্থী স্কুলেই ছাত্রাবস্থায় ইতিহাস পড়বার সুযোগ পেয়ে থাকে,—আর তাদের এ ছাত্র জীবন সাধারণ স্কুলের জীবন, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এর হিসেব নয়, এ হচ্ছে অতি সাধারণ শিক্ষা। এ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার জলুসে অভিজাত নয়, এ স্থূল সংখ্যাধিক্যে আটপৌরে। তবে আশার কথা এবং সুখের কথা এই যে আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই অতি-সাধারণ শিক্ষার কালরেখা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সামান্য কিছু লিখতে পড়তে অঙ্ক কষতে শেখা আর কিছু ধর্ম্মের বা নীতির শিক্ষালাভের মধ্যে সীমিত থাকছে না এ শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার পরও মাধ্যমিক শিক্ষাটাও এর ক্রমপরিণতি হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশের সংবিধানে এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর চোদ্দো বছর বয়স পর্য্যন্ত চলবে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য উন্নত দেশে কোথাও যোল, আঠারো, বছর পর্য্যন্ত।

মানুষের জীবনে ক্রমবর্ধমান জটিলতার কথা আর অসংখ্য পেশার সার্থক নির্ব্বাচন ও প্রস্তুতি ও অনেকটা সময় ছিনিয়ে নিচ্ছে বিদ্যার্থীর ছাত্রজীবন থেকে। অনেক দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ ধাপ তিন কি চার বছর রাখা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি বা "টেকনিক্যাল" শিক্ষার কিংবা পেশাগত যোগ্যতা অর্জ্জনের কাল হিসেবে। সাধারণ শিক্ষালাভের সময় তাতে নিঃসন্দেহে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আর একটি কথা আছে। ইতিহাস

আমরা পড়াবো অন্যান্য বিষয়ের সাথে। তাই আমাদের চিন্তা করতে হবে যে ইতিহাস পড়ানোর 'সময়' আমরা "টাইম-টেবলে" কতটুকু দিতে পারবো! প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সপ্তাহে দুঘণ্টা, আর মাধ্যমিক স্তরে মেরে কেটে সপ্তাহে তিন চার ঘণ্টা। এইতো সময় আমাদের হাতে! অথচ ইতিহাসের বিষয়বস্তু? সেতো অগাধ!

সময় যত সংক্ষিপ্তই হোকনা কেন সাধারণ শিক্ষার্থীকে ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভে সাহায্য করবে এরকম পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। আজকাল অবশ্য ইতিহাসের পাঠ্যক্রম নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। যে নতুন বিজ্ঞান-যুগের সূত্রপাত আমাদের জীবনে, তাতে শুধু ইতিহাসের পাঠ্যক্রমই নয়, বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয়গুলিরই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠ্যক্রমে পুনর্বিন্যাসের কথা উঠবে। নতুন পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সামগ্রিক কাঠামো রচনার প্রয়োজন হবে। আগামীকালের নাগরিকদের কাছে মানুষের জ্ঞানের আর অভিজ্ঞতার সম্যক উপস্থাপন করবার চিরাচরিত প্রথা আর তাদের সনাতন রূপ এই পাঠ্যক্রম; সুতরাং নতুন করে তার বিন্যাস-সাধনের কথা উঠবে, উঠেছে। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কিন্তু স্কুল-পাঠ্যসূচীর রূপায়ণ যতই নতুন করে হোক না কেন, নবতর বিন্যাসে রচনার যত কলাশৈলীই তাকে সহজ, শোভন, সম্পূর্ণ ও যথোপযুক্ত করুক না কেন, একথা আমরা কেউই স্বীকার করতে পারবোনা যে অতি সাধারণ এই শিক্ষার্থীর দলকে—যারা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে ভিড় করবে মাত্র কয়েক বছরের জন্যে আর তারপর অবস্থাবৈগুণ্যে বাধ্য হবে আপন আপন পেশায় প্রবেশ করতে রুজি রোজগার করবার তাগিদে,—বঞ্চিত করা হবে ইতিহাসের জ্ঞান থেকে, মানুষের অতীত সম্বন্ধে ধারণা থেকে। ইতিহাসের সম্বন্ধে তাদের কিছু জানাতেই হবে। স্কুল-পাঠ্যসূচীর যতই নবতর বিন্যাসই সংসাধিত হোক না কেন ইতিহাস সেখানে স্থান পাবেই।

কিন্তু যিনি ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনা করবেন তাঁর সামনে কিংবা যে শিক্ষক ইতিহাস পাঠ্যক্রমকে শ্রেণীকক্ষে রূপ দেবেন তাঁর সামনে পড়ে আছে মানুষের অনাদি অতীত থেকে আজ পর্যন্ত নিরবধিকাল আর তার প্রবাহের ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের আজকের এই পরিণতি। ঐযে,—যারা পাহাড়ের গুহায় বাস করে পাথরের টুকরো ঘষে শাণিত করছে বণ্য জন্তুকে মেরে নিরাপদ করবে আপন অবস্থানকে, মৃত্যুসঙ্কুল পরিবেশে প্রতিপদক্ষেপে বীভৎস, বন্য, হিংস্র সংগ্রামের মধ্যে জীবন ধারণের এবং সংরক্ষণের দুর্জ্জয় এবং মৃত্যুঞ্জয়ী প্রচেষ্টা!—আর এই যে, এখানে যারা পাড়ি দিতে চাইছে মহাকাশে, চন্দ্রলোকে

মঙ্গলগ্রহে, তাদের উভয়ের মধ্যে কালস্রোতের যে দুস্তর ব্যবধান, আর এই ব্যবধানের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে ঘটনার রাশি ফেনিল, উদ্বেল হয়ে লাখো স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে রেখেগেছে ইতস্ততঃ, তাদের সবগুলির সম্যক না হোলেও প্রধান-প্রধানগুলির সমাবেশ ইতিহাস পাঠ্যক্রম-বিন্যাসে নিশ্চয়ই স্থান পাবে। যেগুলি তুচ্ছ, কিংবা যেগুলি এখনও অন্ধকারময় উপলখণ্ডের তলে, বা যেগুলির সম্বন্ধে বিচার যুক্তিপুষ্ট উপসংহারে পৌছানো যাইনি,—সেগুলি বাদ দিয়েও ইতিহাসের জ্ঞাতব্য বা অধীতব্য বিষয় এত অধিক যে যথোপযুক্ত বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচন ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর সে নির্ব্বাচন অনেক সময় হবে নির্ম্মম। চক্ষুলজ্জার কমনীয় আবেশ পরিহার করে, রূঢ় বাস্তবকে সামনে রেখে সে নির্ব্বাচন করতে হবে। এ কাজ যে অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই নির্ব্বাচনে কি কি বিষয় বিবেচনা করা হবে তার মীমাংসা করাও সহজসাধ্য নয়। সেখানেও আছে নানা মুনির নানা মত, নানা যুক্তি, তর্ক। এ বিষয়ে আধুনিকতম ও বহুজন স্বীকৃত মত হচ্ছে যে মানুষের ইতিহাস সামগ্রিক ভাবে পড়তে হবে। একটি কি দুটি দেশের ইতিহাস পাঠে ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ ধরা যায় না। ইতিহাস সেখানে হয়ে যায় খণ্ড, ছিন্ন। তাই বিশ্বইতিহাস পড়া যুক্তিশুদ্ধ। এই বিশ্বইতিহাস অন্তর্ভুক্তির কারণ বিশ্লেষণে সবথেকে যেটি বেশী করে চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে এই যে বিশ্বইতিহাস পাঠে শিক্ষার্থীর আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগবে, তার দৃষ্টিভঙ্গি হবে ব্যাপক, মন হবে উদার, সঙ্কীর্ণ নয়। সঙ্কুচিত গোঁড়ামির বদলে মনে আসবে নিঃসঙ্কোচ সার্ব্বজনীন সৌভ্রাত্র ও মৈত্রী, উদারতা এবং সাম্যভাব। আজকের দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। বিশ্বইতিহাস স্কুল-পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির ফলে বিদ্যালয়ের ইতিহাস-পাঠ্যক্রমকে নতুন করে বিন্যস্ত করতে হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের বর্ত্তমানের চারদিকের আবহাওয়া ও লক্ষণ দেখে একথা অনুমান করা মোটেই অসমীচীন হবে না যে মানুষের জীবনে ভবিষ্যতে জটিলতা আরও বাড়বে। আর শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য যদি সমাজে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বাস করতে শেখা হয় তাহলে যে শিক্ষার্থী আজকের সমস্যাসঙ্কুল বিশ্বে বসবাস করছে এবং ভবিষ্যতে তার পরিণত বয়সে যে বিশ্ব হয়ে উঠবে হয়তো অধিকতর সমস্যাসঙ্কুল,—তার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা তাকে লাভ করতে হবে। তাকে জানতে হবে সেই অতীতকে যে অতীত তৈরী করেছে বর্ত্তমানকে। বর্ত্তমান

তো অতীতের পরিণতি, আর বর্তমানের সম্ভাবনাই রূপ পরিগ্রহ করে ভবিষ্যতে। তাই বিদ্যার্থীকে জানতে হবে সমসাময়িক ইতিহাস এবং তার অব্যবহিত পূর্ব্বের ইতিহাস; আর এ দুটিরই রূপ চিত্রিত হবে বিশ্বইতিহাসের পটভূমিকায়। তাই বলে জাতীয় ইতিহাসের বিলুপ্তি ঘটবে না ইতিহাসের পাঠ্যক্রম থেকে। জাতীয় ইতিহাস কে রাখতে হবে। জাতীয় ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আসবে জাতীয় সংহতি। জাতীয় সংহতি না হলে আন্তর্জাতিক সংহতি বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ নেহাতই অন্তঃসার শূণ্য।

আমরা আগেই দেখেছি যে ইতিহাসের অগাধ, অপার বিষয়বস্তু সমূহথেকে স্কুল-পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্যে কঠিন হাতে নির্ব্বাচনের আবশ্যকতা একান্ত ভাবেই আছে। বিশ্বের বহুদেশের বিশেষ অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী এই নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁদের মতে স্কুলে ইতিহাস পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে বিশ্বইতিহাস, শিক্ষার্থীর জাতীয় ইতিহাস, স্থানীয় ইতিহাস, সামাজিক অর্থনৈতিক ও সভ্যতার ইতিহাস, সমসাময়িক ইতিহাস ও চলতি দুনিয়ার ঘটনাবলী, শিক্ষার্থীর দেশ থেকে বহুদূরে অবস্থিত দেশের ইতিহাস, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের ইতিহাস। এই সমস্ত বিশেষজ্ঞ অবশ্য একথাও বলেছেন যে তাঁদের এ সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রস্তাব মাত্র। একথাও অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে এঁরা আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্যে বিশ্বইতিহাসের উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়েছেন। এর স্বপক্ষে যুক্তির সার-বত্তাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম কিছু ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে তাঁদের এ প্রস্তাব মত ইতিহাস পাঠ্যক্রমের বিন্যাসে। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা দেখান যে বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত তালিকায় (১) শিক্ষার্থীর দেশ থেকে বহুদূরে অবস্থিত দেশের ইতিহাস, (২) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের ইতিহাস,—অপরাপর বিষয়বস্তুগুলির সাথে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে ইতিহাস পাঠ্যক্রম ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে এই তাঁদের মত। এ দুটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে এর রূপায়ণ সম্বন্ধে সততই মনে সন্দেহ জাগে।

ইতিহাস-পাঠ্যক্রম রচনা সম্বন্ধে উপরোক্ত বিশেষজ্ঞরা বহু চিন্তার পর ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে কি কি বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। সেই তালিকায় যে বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে সেগুলির সামান্য আলোচনা এই প্রসঙ্গে নেহাৎ অবান্তর হবে না।

বিশ্বইতিহাস : ধরাপৃষ্ঠে মানুষের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান মানুষের ক্রমপরিণতির, মানুষের এবং মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের বহুশতাব্দী বিস্তৃত এই ইতিকথা যেমন ব্যাপক ও বিশাল, এর বিষয়বস্তুও তেমনি জটিল ও দুরধিগম্য, আর সেগুলি আয়ত্ত করাও বহু আয়াসসাধ্য। এর পঠন-পাঠনে আছে শিক্ষার্থীর বয়েসের প্রশ্ন, তার মেধার মান, মনের পরিণতি অপরিণতির কথা। তাই সব দিক ভেবে সুবিবেচিত ও সুপরিকল্পিত নির্ব্বাচন এখানে প্রয়োজন। কাজেই এই নির্ব্বাচন মোটেই সহজসাধ্য নয়।

শিক্ষার্থীর জাতীয় ইতিহাস ঃ—ইতিহাসপাঠ্যক্রমের এটিই হবে মধ্যবিন্দু, কেন্দ্র। একে ঘিরেই ঘুরবে পাঠ্যক্রমের পরিধি। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মান, শিক্ষকের যোগ্যতা, স্কুলের পরিবেশ, ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে এই প্রসঙ্গে। জাতীয় ইতিহাস অবশ্য এমন ভাবে পড়ানো হবে না যাতে বিদ্যার্থী গোড়া এবং অন্ধ জাতীয়তাবাদী হয়ে যায়। তাতে তো ইতিহাস হবে বিকৃত। জাতীয় ইতিহাস পড়ানো হবে বিশ্বইতিহাসের পটভূমিকায়। জাতীয় ইতিহাস ও বিশ্বইতিহাসের টানা পোড়েনে নিজ বিচার বুদ্ধির মাকু চালিয়ে মনের মণিকোঠায় যে শিল্পশৈলীর বিন্যাস হবে সেইতো প্রকৃত ইতিহাস জানা এবং প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস জানা। জাতীয় ইতিহাসের সাথে বিশ্বইতিহাসের নিকট ও নিবিড় সম্পর্ক। ভাবের আদান প্রদানে তাদের উভয়ের পরস্পর নির্ভরশীলতা শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য হয়ে উঠবে জাতীয় ইতিহাসের সম্যক সার্থক অধ্যয়নে। বিদ্যার্থীর জাতীয় ইতিহাস এককভাবে, পৃথকভাবে—অর্থহীন,—অসম্ভব। বিশ্বইতিহাসের সাথে সংযুক্তিতে সে সঙ্গতিপূর্ণ, ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বিশ্বইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে জাতীয় ইতিহাস পড়াতে হবে।

স্থানীয় ইতিহাস ঃ—নীচের শ্রেণীর শিক্ষর্থীর মনে স্থানীয় ইতিহাসের প্রভাব অবর্ণনীয়, আর তার মূল্যও তাই অপরিমেয়। নিকট পরিবেশ তো বালক বিদ্যার্থীর কাছে জীবন্ত। তাই অল্পবয়েসের শিক্ষার্থীর ইতিহাস-পাঠ্যক্রমে স্থানীয় ইতিহাস একটি অতি প্রয়োজনীয়, একান্ত অপরিহার্য্য এবং অত্যন্ত মূল্যবান অঙ্গ। বস্তুতঃ স্থানীয় ইতিহাসের রাস্তাধরে বিদ্যার্থী ক্রমে জাতীয় ও বিশ্বইতিহাসের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে উপনীত হয়ে থাকে। স্থানীয় ইতিহাসের "রোমান্টিক" স্পর্শে তার মনে যে কৌতুহল, ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলবে সেটাই তো আবার কৈশোরে এবং কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষনে সোনার কাঠির স্পর্শ হয়ে জাগিয়ে তুলবে ইতিহাসের সামগ্রিক ও অভিনব রূপকে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সভ্যতার ইতিহাস :—স্কুলের ইতিহাস-পাঠ্যক্রমে এইগুলির অন্তর্ভুক্তির যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত বিদ্যার্থীর কাছে রাজনৈতিক ইতিহাস নীরস প্রতিভাত হয়ে থাকে তাদের মনকে এগুলি স্বভাবতই আকৃষ্ট করবে নানা বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার উপলব্ধিতে, সীমাবদ্ধপরিবেশে প্রাথমিক গবেষণা প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলবার খোরাক জোগাবে। তাছাড়া মানুষে মানুষে, জাতে জাতে, পরস্পর নির্ভরশীলতার সূত্রটি এর মাধ্যমে সহজেই আবিষ্কৃত হবে। ইংলণ্ডের মত দেশে যেখানে "গ্রামার" স্কুলে বিদ্যার্থীদের মনের পরিণতি অনুসারে প্রতি শ্রেণীতে (class) ত্রিধারা (streams) বর্ত্তমান সেখানে "গ" ধারার (C' stream) ছাত্রদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। "গ" ধারার ছাত্রদের মেধার মান অপেক্ষাকৃত স্বল্প, তাই রাজনৈতিক ইতিহাসের জটিলতা সেখানে পরিহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইতিহাসকে এইভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ভাগে ভাগ করে পড়ানোর বিপক্ষেও যুক্তি আছে। আবার স্বপক্ষেও যুক্তি আছে। স্বপক্ষ ও বিপক্ষ এই দ্বিপাক্ষিক যুক্তির আবর্ত্তে পড়ে বিষয়টি এমনি বিভ্রান্তিকর রূপ নিয়েছে যে এখানে দু' পক্ষের যুক্তিগুলির অবতারণা করলে বিষয়টির অস্পষ্টতা বাড়বে বৈ কমবে না। তবে এটা ঠিক যে কোনো জিনিসের সামগ্রিক রূপ বিশেষভাবে জানবার প্রয়োজনে তার বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন আছে। আর আছে বর্ণনা নৈপুণ্যের। বস্তুতঃ ইতিহাস পঠন-পাঠনের অনেকখানি নির্ভর করে বিষয়বস্তুর বর্ণনা সৌকর্যের উপর। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি অধ্যায়, "বাংলায় বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপন", নেওয়া যাক। এটির সম্যক আলোচনার জন্যে প্রয়োজন হবে কিছু বিশ্লেষণের। ভারতে বৃটিশ এসেছিল কেন? বৃটিশ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিল কেন? বাংলা দেশে প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ায় সারা ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করবার পথ সুগম হয়েছিল কেন? পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের জয়-লাভের কারণ কি? এইসমস্ত প্রশ্ন তুলে যেমন বিষয়টির বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে, তেমনি আছে মনোজ্ঞ বর্ণনাশৈলীর প্রয়োজন। নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করতে হবে সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে চক্রান্তের, বর্ণনা করতে হবে সামাজিক পরিবেশের, নবাবের রাজধানীর জীবনযাত্রার আর তার চারপাশ ঘিরে স্বার্থপরতার আর বিশ্বাসঘাতকতার যে আবিল আবর্ত্ত রচিত হয়েছিল তার। এই বিশ্লেষণে এবং বর্ণনায় নিশ্চয়ই আসবে ইতিহাসের সামগ্রিক রূপের অঙ্গ হিসেবে

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দিকগুলি, এবং এগুলি সামগ্রিক ভাবে জানার মাধ্যমেই ইতিহাসের সমন্বিত নিখুঁত রূপটিই চোখে ভেসে উঠবে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে মানুষের শরীরের সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানবার জন্যে বিশ্লেষণ করে শুধু যদি মানুষের কানের কথা কি চোখের কথা অত্যন্ত বিশদভাবে জেনে নি আর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা বাদ দিয়ে দি, তাহলে মানুষের শরীরের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আমরা আহরণ করতে পারি না।

অনেকে অবশ্য অনুমান করে থাকেন যে ইতিহাস পাঠের বেলায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর এমন বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হ'তো যে ইতিহাস কেবল রাজনৈতিক চক্রান্ত, যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রাজারাজড়াদের কাহিনীতেই পর্য্যবসিত হয়ে পড়েছিল। তাই এই ঝোঁকটাকে কাটাবার জন্যে কিংবা তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই ব্যবস্থা এবং সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত তাই চূড়ান্তভাবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং বিপরীত মতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আসল ব্যাপার বুঝতে অসুবিধে কিছু নেই। নানা ভাগে বিশ্লেষণে ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের উপর জোর (emphasis) দেবার প্রশ্নই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা ইতিহাস পঠন-পাঠনে পরিহার করা যায় না একথা মেনে নিয়েও আমাদের চিন্তা করতে হবে যে ইতিহাস পাঠ কালে এমনি ভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি নামে ইতিহাসকে বিশেষিত করা সমীচীন হবে কিনা। স্কুলে যে সমস্ত বিদ্যার্থী পড়ে তাদের মনের পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে একথা অনেকে বলেন যে স্কুলে সাধারণ ছাত্রদের কাছে ইতিহাস উপস্থাপিত করবার সময় ইতিহাসের বিভিন্ন দিকগুলি এমনিভাবে খণ্ডে খণ্ডে নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে ভাগ না করাই যুক্তিযুক্ত। যে বিদ্যার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে বিশেষ পাঠ নেবে তার বিশেষ প্রস্তুতি হিসেবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শেষ পর্য্যায়ে এরকম ভাগ করে বিস্তারিত বিশ্লেষণের হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেটাও ইতিহাসের সামগ্রিক রূপের কোনোরকম ক্ষতি সাধন না করে। বস্তুতঃ ইতিহাস তো মানুষের অতীত ও বর্ত্তমানের কথা, অতীত বর্ত্তমানের মানুষের কথা। আমাদের পৃথিবীতে মানুষের সমাজের, রাষ্ট্রের, অর্থনীতির, ধর্ম্মের, কৃষ্টির, বিজ্ঞানের, শিল্পের, ক্রম বিবর্ত্তনের কথা। তাই ইতিহাসের বিভিন্ন দিকগুলি এক একটি নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা শুধু অযৌক্তিকই নয় তা রীতিমত বিভ্রান্তিকর। তাই অঙ্গাঙ্গি সংশ্লিষ্ট ও একান্ত ভাবে অবিচ্ছেদ্য এই দিকগুলি সর্ব্বতোভাবে এবং সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে, বিচার করতে হবে। কোনো এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে যেমন তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক

বিচার করে দেখবার প্রয়োজন আছে তেমনি কোনো এক বিশেষ সামাজিক পরিণতির কারণ অনুসন্ধানে বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষির প্রয়োজন আছে। এগুলি পরস্পর নির্ভরশীল এবং অবিচ্ছেদ্য।

সমসাময়িক ইতিহাস ও চলতি দুনিয়ার ঘটনাবলী :—

আমরা যে সমাজে বাস করি সে সমাজ-জীবন জটিল। আগামী কালের সমাজ-জীবন যে জটিলতর হবে এ ধারণা নিঃসন্দেহে সত্য। আজ যে বিদ্যার্থী আগামী কাল সে নাগরিক। তাই যে ঘটনাবলী রচনা করেছে আজকের ইতিহাস সেগুলির সম্বন্ধেও তার যথাযথ ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা যে নিতান্ত প্রয়োজন সে কথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। আবার আজকের এই বর্ত্তমান-ইতিহাসের মধ্যে ভবিষ্যত নিহিত রয়েছে সম্ভবনা হয়ে। ভবিষ্যত তৈরী করতে হলে বর্ত্তমানের সম্ভাবনাকে জানতে হবে। তাই সমসাময়িক ইতিহাস এবং চলতি দুনিয়ার ঘটনাবলী দুটিই বিশেষভাবে সম্পর্কিত বিদ্যার্থীদের জীবনের সাথে। তাদের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করার প্রয়োজন আছে বিদ্যার্থীর। তাই স্কুল-ইতিহাস-পাঠ্যক্রমে এইগুলির অন্তর্ভুক্তির ঔচিত্য সমন্ধে প্রশ্ন করার কিছু নেই বলেই অনেকে মনে করেন। কিন্তু কোনো কোনো মহলে এরূপ মত ব্যক্ত করা হয়েছে যে সমসাময়িক ইতিহাস ও চলতি দুনিয়ার ঘটনাবলীর সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ ও নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। তাই এইগুলি হয়তো রাজনৈতিক মতবাদের প্রচার অস্ত্রে বা "প্রোপাগ্যাণ্ডাতে" পর্য্যবসিত হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সবক্ষেত্রের মতই ইতিহাসের শিক্ষক মশায়ের বিচার বুদ্ধি, তাঁর পেশাগত সাধুতা ও দায়িত্বের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি ?

শিক্ষার্থীর দেশথেকে বহুদূরে অবস্থিত দেশের ইতিহাস—

এই বিষয়টি ইতিহাস পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে বিশ্ব ইতিহাস যে আকারে ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাতে তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সার্থক হবে না ; কারণ বিদ্যার্থীর স্কুলজীবনের অল্পপরিসরে এবং অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করা যাবে এমন বিশ্বইতিহাসের পাঠক্র্যম রচনা করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে সেটি হয়েগেছে অস্পষ্ট, এবং কতকাংশে অসংলগ্ন। তাই অপর দেশের মানুষের কথা, তাদের চিন্তা বা ভাবাদর্শের কথা, তাদের জাতীয় জীবনের ক্রম অভিব্যক্তির কথা, বিদ্যার্থী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বইতিহাস স্কুলইতিহাস-পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে তা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়ে যাবে। মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, এক জাতের

সাথে অন্য জাতের ভুল বোঝাবুঝির ফলেই দুনিয়ায় যত রকমের অনর্থ আর বিপদ। বিদ্যার্থীর দেশ থেকে বহুদূরে অবস্থিত দেশের ইতিহাস পাঠের ফলে ভিন্ন দেশের ভিন্ন মতাবলম্বী ভিন্ন কৃষ্টির, ভিন্ন সমাজের, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষের কথা একদিক থেকে যেমন সে বুঝতে পারবে তেমনি সে দেখবে যেসমস্ত মানবিক বিষয়গুলি,—মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ভয়ভাবনা, আনন্দবেদনার দোলা—তার নিজের জাতীয় জীবনে দোলা দিয়েছে আর সাথে সাথে সৃষ্ট হয়েছে তার দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস,—অনুরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই ঐ সব দেশের ইতিহাসের ধারাও চলে এসেছে। তাই এই ধরণের পাঠের মধ্যে দিয়ে বিদ্যার্থীর নিজের দেশের মানুষ ছাড়া ভিন্‌দেশের মানুষকে বোঝবার পথ সুগম হয়ে উঠবে। মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে মানুষে মানুষে যে একটি অতি ঘনিষ্ঠ নৈকট্য আছে, জগৎজোড়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে একটি মূল ঐক্যের সুর আছে, তা উপলব্ধি করা বিদ্যার্থীর পক্ষে সহজ হবে।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের ইতিহাসও পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই যে উদ্দেশ্যে বিদ্যার্থীর নিজদেশ থেকে বহুদূরে অবস্থিত দেশের ইতিহাস এই পাঠ্যক্রমে স্থান লাভ করেছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের ইতিহাস বিদ্যার্থী হয়তো পড়বার বা জানবার অবকাশ স্কুলোত্তর জীবনে আর পাবেনা। কিন্তু এইসব দেশের মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে এবং তাদের ইতিহাসের সাথে, বিশেষ করে ইতিহাসের যে সব অধ্যায়ে বিদ্যার্থীর নিজদেশের ইতিহাসের সাথে সাদৃশ্য আছে, যে সব বিষয়ে এই দুই দেশ পরস্পর প্রভাবিত হয়েছে, সেগুলির সাথে পরিচিত হলে দূরও নিকট হয়ে আসবে এবং দূরদেশের মানুষকেও বোঝাবার পথ সুগম হবে।

বিষয়বস্তুর বিন্যাস -- কি ইতিহাস পড়ানো হবে এটা ঠিক হয়ে যাবার সাথে সাথে ইতিহাস পাঠ্যক্রমে বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হয়ে যাবে। নির্ব্বাচন করবার সময় আমাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হারালে চলবে না। আদর্শের রঙীন নেশায় নির্ব্বাচন কালে অনেক সময় বাস্তবতা বোধ হারিয়ে যায় আর তার ফলে নির্ব্বাচন হয়ে পড়ে অবাস্তব। অবাস্তব পাঠ্যক্রম চালু করলে পড়ানো হয় অসুবিধাজনক। স্কুলে স্কুলে হাজার হাজার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকও শিক্ষার্থীর অশুভ অস্বস্তির মাধ্যমে আসে জটিলতা, অচল অবস্থা। আদর্শ অবশ্য আমাদের থাকবে। আদর্শে উপনীত হবার চেষ্টা আমরা সব সময়েই করবো, কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করে নয়, বাস্তবকে বাদ দিলে আদর্শ থকবে না। এই

সব কারণেই পাঠ্য বিষয়গুলির নির্ব্বাচন হবে বাস্তবানুগ। যে সব বিষয় নির্ব্বাচন করলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অসুবিধে হবে না, অসুবিধে হবে না পাঠ্যক্রম চালু করবার এবং বাস্তবে রূপায়িত করবার, তেমনি বিষয় নির্ব্বাচন করতে হবে।

বিষয় নির্ব্বাচনের পরই এর পরের স্তরটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হচ্ছে পাঠ্যক্রমে বিষয়বস্তুর বিন্যাস। নির্ব্বাচন পর্ব্ব সমাধা করবার পর প্রশ্ন হচ্ছে নির্ব্বাচিত বিষয়গুলি বিন্যস্ত করা হবে কি করে ক্রমের অভ্যন্তরে? পাঠ্যক্রমে বিষয়-বস্তুর বিন্যাস সাধন করবার সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে,—(১) সময়ানুগ (chronological) (২) "লাইন অফ ডেভেলপমেন্ট" (৩) "প্যাচ"। কালের ক্রমকে অনুসরণ করে পাঠ্যক্রমে বিষয়-বস্তুর সাজানোর বা বিন্যাসের যে পদ্ধতি আছে তা হচ্ছে সময়ানুগ পদ্ধতি। সময়ানুগ পদ্ধতি সময়কে অনুসরণ করবে। তার মানে সময়ের যে ধারা অনাদিকাল থেকে বয়ে এসেছে আজকে এই বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সেই ধারাকে অনুসরণ করে পাঠ্যক্রমের বিন্যাস সাধন করা হবে। মহাকালের পরিক্রমা বর্ত্তমানের পথে যেমনটি হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবেই এগিয়ে আসবে পাঠ্যক্রমে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিন্যাস। কালের স্রোতকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে অনুসরণ করে বলেই এ-ধরণের বিন্যাসের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতার স্থান হয় না। ইতিহাস ঠিক যেভাবে ক্রম পরিণতির পথে এগিয়ে এসেছে ঠিক সেই ক্রম অনুসরণ করে বলেই এ ধরণের বিন্যাস সহজভাবেই স্বাভাবিক। এ ধরণের পাঠ্যক্রমের বিন্যাস অনায়াসেই শিক্ষার্থীর মনে ইতিহাসের সময়ের নির্ভুল ধারণা দিতে পারে; কারণ এর মধ্যে এমন কোনো ঘটনা উল্টাপাল্টা ভাবে সন্নিবিষ্ট হবে না যেটি বিদ্যার্থীর সময়ের ধারণাকে ব্যাহত করে দেবে। তাছাড়া ইতিহাসের পাঠ্যক্রমকে শ্রেণীকক্ষে এবং শিক্ষার্থীদের মনে রূপায়িত করে থাকেন ইতিহাসের শিক্ষক। আজকের অধিকাংশ শিক্ষকই এই সময়ানুগ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত ইতিহাসের পাঠ্যক্রম পড়ে এসেছেন ছাত্র-জীবনে। তাই এই পদ্ধতি অনুসারে বিন্যস্ত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন চালানো তাঁদের কাছে সহজ এবং স্বাভাবিক বোধ হবে। পাঠ্যপুস্তক সময়ানুগ পদ্ধতিতে রচনা করা সহজ আর বাজারে যে সমস্ত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক দেখতে পাওয়া যায় তার অধিকাংশই এই পদ্ধতি অনুসরণ করে রচিত। বলা বাহুল্য সময়ানুগ পদ্ধতির স্বপক্ষে দেখানোর মত যুক্তি হিসেবে শেষের যুক্তি দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা বলবেন শিক্ষক মশায়দের বিশেষ "ট্রেনিং" দিয়ে এবং অন্য পদ্ধতিতে বিন্যস্ত পাঠ্যক্রমের পুস্তক বেশী করে

ছাপিয়ে এ দুটি অসুবিধে দূর করা যায়। এই পদ্ধতির স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। আধুনিক কালের ইতিহাস নিঃসন্দেহে অপেক্ষাকৃত জটিল। আর এই সময়ানুগ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত পাঠ্যক্রমে আধুনিক কালের ইতিহাস বিদ্যার্থীরা সাধারণতঃ পড়ে থাকে উচ্চ শ্রেণীতে, যখন কিছুটা জটিলতা অনুধাবন করবার বা বিশ্লেষণ করবার মত পরিণত বুদ্ধি তাদের হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সেটি এই সময়ানুগ (chronological) পদ্ধতিতে বিন্যস্ত পাঠ্যক্রম সম্পর্কেই। আমরা কি ইতিহাস পড়াবো সেটি ঠিক হয়েছে, অর্থাৎ বিষয় নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত হয়েছে। কিন্তু সেই বিষয়বস্তু গুলির বাস্তব বিন্যাস পাঠ্যক্রমে কেমন করে হবে? পাঠ্যক্রম সাজানো হবে কি করে? সেই প্রসঙ্গে সময়ানুগ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীর অবস্থান ১১+বছর বয়েস থেকে ১৭+বছর বয়েস পর্য্যন্ত। এই ছয়টি বছর ছয়টি শ্রেণীতেঁ বিভক্ত। বিষয় নির্ব্বাচন করবার সময় দেখেছি যে ভূপৃষ্ঠে মানুষের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তার কাহিনী ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে স্থান লাভ করেছে। এখন খুব প্রাসঙ্গিক ভাবেই একটি প্রশ্ন জাগে যে ইতিহাস পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়গুলিকে কি এক বৎসরের মধ্যেই সমস্তটুকু পড়ানোর ব্যবস্থা হবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে, আর বছরের পর বছর শিক্ষার্থী যতো উঁচুশ্রেণীতে উঠবে বিষয় বস্তুগুলির পরিধি ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিয়ে সেগুলিই অধিকতর বিশদভাবে পুনরাবৃত্তি করা হবে? যাঁরা আমাদের দেশের স্কুলের ইতিহাস পড়ান তাঁরা জানেন যে বর্ত্তমানে আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে, যে পাঠ্যক্রম চালু আছে তাতে এক বছরে সবটুকু পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত না করে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও বর্ত্তমান এই তিনভাগে ভাগ করে তিন বছরে পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। এটি তিন বছরে পড়ানো হবে না চার বছরে পড়ানো হবে এনিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। আমরা এখানে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবোনা।

ক্রমানুগ পদ্ধতির স্বপক্ষে যুক্তিগুলি দেখে যদি আমরা এই ধারণা করি যে এই পদ্ধতি অনুসারে বিষয়বস্তু পাঠ্যক্রমে বিন্যাস সাধন করলে তা ত্রুটিহীন হবে,—তাহলে সে ধারণা ভুল হবে। এ পদ্ধতি অনুসৃত পাঠ্যক্রমেরও ত্রুটি আছে। যেটি প্রধান এবং সহজেই আমাদের চোখে পড়ে সেটি হ'ল এই যে এই পদ্ধতি অতি যত্ন সহকারে ঘটনা স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্ভূত ইতিহাসের ক্রমের দিকেই দেখে, কালস্রোতকে যুক্তি ও বিচারসিদ্ধ, সহজ ও স্বাভাবিক

ভাবে অনুসরণ করার কথাই ভাবে, বিদ্যার্থীর কথা, তার মনের ক্রমবিকাশের কথা, তার ক্রমপরিণতির কথাকে মোটেই আমল দেয় না। এক কথায় এ পাঠ্যক্রম ইতিহাস আর তার বিষয়বস্তুকে দেখে, হাতে সময় কতো আছে আর সেই সময়ের মধ্যে নির্ব্বাচিত বিষয়গুলি বিদ্যার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা যায় কি করে কেবল সেই কথাই ভাবে,—বিদ্যার্থীর কথা ভাবেনা, তার মুখ চায়না। মনোবিজ্ঞানের কোনো বালাই নেই সেখানে। মনোবিজ্ঞানের কোনো বালাই নেই এই জন্যে যে বিদ্যার্থীর বয়েসের অনুপাতে ও তার মনীষার বিকাশের উপর নির্ভর করে পাঠ্যক্রম রচনা করার এখানে কোনো ব্যবস্থাই নেই। অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যার্থীর জন্যে রেনেসাঁ, ফরাসীবিপ্লব প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণীতে যে বিদ্যার্থী পড়ে তার এইগুলি বা অষ্টাদশ শতকের বিশ্বইতিহাসের জটিলতা অনুধাবন করবার মত বিশ্লেষণী বুদ্ধি জাগেনি। তাই এই পদ্ধতিতে বিন্যস্ত পাঠ্যক্রমকে মনোবিজ্ঞান সম্মত বলা যায়না। এই ধরনের বিষয়বস্তুর পঠনপাঠনে তাই দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

এই দুরূহ সমস্যার সমাধানেরও চেষ্টা করা হয়ে থাকে। সে চেষ্টা অবশ্য ফলপ্রসূ করা খুব সহজ কাজ নয়। এর সমাধান নির্ভর করে ইতিহাস শিক্ষকের উপর। একথা স্বীকার্য্য যে পাঠ্যক্রম, বা পাঠ্যপুস্তক বা পরিবেশ যেটি যেমনই হোক না কেন সার্থক ভাবে ইতিহাস পড়ানো নির্ভর করে বিষয়টি পড়ানোর পদ্ধতির উপর। পাঠ্যক্রমের বিন্যাস আর পড়ানোর পদ্ধতি খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। কোনো বিষয় পড়ানোর পদ্ধতি সেই বিষয়ের পাঠ্যক্রম বিন্যাসের উপর বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। পড়ানোর পদ্ধতি নির্ভর করে শিক্ষকমশায়ের উপর। তাঁর অস্মিতা, ইতিহাসে জ্ঞান, পেশাগত প্রস্তুতি, বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবার বিশিষ্ট ভঙ্গি, এ সব মিলে ইতিহাস শিক্ষককেই তো ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতির জীবন্ত প্রতীক করে তুলেছে। তাই তিনি যখন অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়েসের শিক্ষার্থীদের পড়াবেন, সেই শিক্ষার্থীদের বয়েস অনুসারে, তাদের মনীষার বিকাশের মান অনুসারে, বিষয়বস্তুগুলি সুবিধামত নির্ব্বাচন করে সেগুলি উপস্থাপিত করবেন তাদের কাছে। আর এগুলি উপস্থাপিত করবার সময় "জোর" (emphasis) দেবেন এমন সব বিষয় বস্তুর উপর যেটি বুঝতে বিদ্যার্থীর কোনো অসুবিধে না হয় এবং বিষয়বস্তুর উপরও অবিচার কিছু না করা হয়। এই "জোর" (emphasis) দেবার তারতম্যের উপর ইতিহাস পড়ানোর সফলতা অনেকখানি নির্ভর করে একথা যেন ভুলে না যাই।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ক্রমানুগ (chronological) পদ্ধতি ছাড়া "Lines of Development" এবং "Patch" প্রথা অনুসরণ করেও ইতিহাসের নির্ব্বাচিত বিষয়-বস্তুগুলি পাঠ্যক্রমে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে। এই দুটি পদ্ধতির কথা যথাক্রমে M. V. C, Jeffreys ও Miss Marjorie Reeves আলোচনা করেছেন।

ইতিহাসের নির্বাচিত বিষয়-বস্তুর পাঠ্যক্রম বিন্যাসে "Lines of Development" পদ্ধতি হচ্ছে কালস্রোতে আবর্ত্তিত ঘটনাবলীকে যথাযথ অনুসরণ করে পাঠ্যক্রম বিন্যস্ত না করে মহাকালের গতিপথের পদক্ষেপে যে যে দিকগুলি, যে যে বিষয়গুলি বিবর্ত্তিত হয়েছে তাদের সবগুলিকে একসাথে উপস্থাপিত না করে, একটি একটি করে নির্ব্বাচিত করে, শুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত তাদের ধারাবাহিক রূপাঙ্কন করা। বিদ্যার্থীর বয়েসের অনুপাতে তার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে যে বিষয়গুলি তার মনের মণিকোঠায় আনে নিত্য বহু-কৌতুহলের ভিড়, নানা জিজ্ঞাসায় আলোড়িত করে তার বিচার বুদ্ধিকে, তেমনি কতকগুলি সুনির্বাচিত বিষয়-বস্তু নিয়ে বিন্যস্ত থাকবে পাঠ্যক্রমটি। উদাহরণ স্বরূপ এই প্রসঙ্গে দু-একটী বিষয় বস্তুর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে :—যান-বাহন, গৃহ, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার্য্য, অসুখ-বিসুখ, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি। এই বিষয়গুলি কিন্তু বিদ্যার্থীর মনের পরিণতি, পরিবেশ, পছন্দ-অপছন্দ, যোগ্যতা, স্বাচ্ছন্দ্য, বয়েস, প্রবণতা প্রভৃতির যথোচিত বিচার বিবেচনার পর নির্বাচিত করতে হবে। অনাদি কালের শুরু হতে মহাকালের নিত্য স্রোতের দোলা লেগে বিভিন্ন যুগ পরিক্রমার পথে বিষয়-বস্তুগুলির এক একটীর যে ক্রম পরিণতি ঘটেছে আমাদের এই বর্ত্তমান পর্য্যন্ত, তার বিশ্লেষণে হবে জ্ঞানের আহরণ। এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে নানা জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে, তথ্যের সমাহারে, জ্ঞান আহরণ হবে সমৃদ্ধ। মানুষের বর্ত্তমান সমাজে তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির,—তার গৃহের, আহারের সাজপোষাকের, যানবাহনের, আইন কানুনের, রীতিনীতির, শাসনতন্ত্রের এমনি বহুতর বিষয়ের প্রত্যেকটির পিছনেই রয়েছে অতীতের অনেক স্মৃতি, অনেক কথা। তারা আজকে যা, একদিনে তা হয়নি। বর্ত্তমান রূপ বা অবস্থায় পৌঁছুতে বহু যুগ লেগে গেছে। "Lines of Development"-এ এদের একটির পর একটি ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করে বিদ্যার্থীর সামনে উপস্থাপিত করবার নীতি বিঘোষিত হয়েছে।

"Lines of Development" বিদ্যার্থীর মুখ চায়। এ পদ্ধতি অনুসারে

বিদ্যার্থীর বয়েস, মনের পরিণতি, যোগ্যতা, প্রভৃতি বিচার করে "Line" বা বিষয় নির্ব্বাচন করবার অবকাশ আছে। কাজে কাজেই এ পদ্ধতিটি মনো-বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু এতে ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ বা সামগ্রিক রূপে ইতিহাস বিদ্যার্থীর সামনে উপস্থাপিত করবার কাজ ব্যাহত হয়। এতে ইতিহাসের সময়ের ধারণা বিদ্যার্থীর মনে সুপরিস্ফুট হয় না। সময়ের ধারণা বিদ্যার্থীর মনে এলোমেলো অস্পষ্ট থেকে যায়। যুগ যুগ ব্যাপী বহু শতাব্দীর বুকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনারাশি বিদ্যার্থীর মনে সামগ্রিক রূপে উপস্থাপিত যদি না করা হয় বা সময়ের সূত্র দিয়ে সেগুলিকে গ্রথিত না করা হয় তাহলে ইতিহাসের "ক্রম" সম্বন্ধে একটী নিখুঁত ধারণা হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ ঘটনাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে; আর "ক্রমের" সূত্রে গ্রথিত হলে মালিকার সুসংবদ্ধ শোভন সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে। "Lines of Development"-এ কোনো বিষয়ের (Line-এর) ক্রমবিকাশ দেখাবার সময়, সেই বিশেষ বিষয়ের ক্রমবিকাশের "ক্রমসূত্র" ধরে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসবার রীতি আছে বটে, কিন্তু এর পঠন-পাঠন উপযুক্ত হাতে না পড়লে বা একটু এদিক ওদিক হলেই অসুবিধের সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে রচিত পাঠ্যক্রমের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব; এই পাঠ্যক্রম অনুসারে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন চালু করবার মত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। এই দুই তরফা অভাব মেটানো অবশ্য এমন কিছু একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। যাঁরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করবার পক্ষপাতী তাঁরা বলে থাকেন যে এই ধরনের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তক রচনা করে এবং এই বিষয়ে বহু সংখ্যক শিক্ষককে উপযুক্ত "ট্রেনিং" দিয়ে এ দুটী অভাবই পূরণ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে আর একটী ত্রুটী হবার সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় বিষয় ("Line") নির্ব্বাচনটি নৈর্ব্যক্তিক না হবার সম্ভাবনা আছে। বিদ্যার্থীদের মুখ না চেয়ে অনেক সময় যিনি পাঠ্যক্রম তৈরী করেন বা যিনি বিশেষ বিষয়টী ("Line") নির্ব্বাচিত করেন তাঁর বা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ছাপ এই পাঠ্যক্রম রচনায় বা বিষয় নির্ব্বাচনে ছায়াপাত করে থাকে। যদিও নৈর্ব্যক্তিক নির্ব্বাচন অত্যন্ত জটিল তাহলেও যতটা সম্ভব একে নৈর্ব্যক্তিক করা যেতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। এদিক থেকে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

"Patch System" অনুযায়ী পাঠ্যক্রমে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করতে হলে ইতিহাসের এমন অধ্যায়গুলির পর পর সন্নিবেশ করতে হবে যেগুলি অনু-

যথাযথ ভাবে অনুসরণ করাহবে। "Lines of Development" পদ্ধতি—অনুসৃত পাঠ্যক্রমে কেবল কয়েকটি বিষয়ের ক্রম-পরিণতির উপরই জোর দেওয়া হবে বেশী। কতকগুলি বিষয়ের (Lines) উপর বেশী জোর দেওয়া হলেও এ পদ্ধতিতে সময়ের স্রোতকে অনুসরণ করতে হবে। সময়ের সূত্রে এ বিষয়গুলির (Lines) ক্রম-পরিণতির স্তরগুলি না গাঁথলে সেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও খাপছাড়া হয়ে থাকবে। এ পদ্ধতিতে সময়ের ক্রমকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে পৃথক পৃথক একক বিষযগুলির ক্রমপরিণতি উপস্থাপনের সময়। "Patch System" তো ক্রমানুগ ও Lines of Development এই দুই পদ্ধতির এক বিশেষ সমন্বিত রূপ। ইতিহাসের যে অধ্যায়টি (Patch) নির্ব্বাচিত করা হয় তার মধ্যেকার প্রধান প্রধান বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনা করবার ব্যবস্থা এর মধ্যে আছে। এমনি অনেকগুলি অধ্যায়ের প্রধান প্রধান বিষয়গুলির ক্রম পরিণতির কথা বিভিন্ন অধ্যায়গুলি আলোচনা কালে জানা যাবে; কারণ বিভিন্ন অধ্যায়ের এই প্রধান প্রধান বিষয়গুলি প্রায়ঃশই এক। আর যখন সময়ক্রমের সূত্রে সেগুলি গাঁথা হবে তখন Patch System যে ক্রমানুগ পদ্ধতি ও Lines of Development-এর সমন্বয়ে উদ্ভূত সেটি বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমরা দেখেছি যে ইতিহাসের সর্ব্বজন স্বীকৃত, আদর্শ, সব স্কুলে প্রযোজ্য, একটি পাঠ্যক্রম রচনা করা অসম্ভব, এবং সেই জন্যেই ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনার একটি ফরম্যুলাও বাতলানো যায় না তবে একথাও ঠিক যে এই পাঠ্যক্রম রচনার প্রসঙ্গে আমরা কতকগুলি জিনিস মনে রাখতে পারি যাতে করে স্থান কাল পাত্র পরিবেশ এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুসারে বাস্তবমুখী একটি পাঠ্যক্রম রচনা সম্ভব হয়।

পাঠ্যক্রমটি এমন হবে যে সেটি যেন বাস্তবে রূপায়িত করা চলে, বাস্তবে এটির প্রয়োগে যেন কোনো অসুবিধে না হয়। আদর্শ পাঠ্যক্রম রচনা এক জিনিস আর তা বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন কোনো যাদু থাকে না যার ফলে পাঠ্যক্রম আপনা আপনিই প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। শিক্ষকের উপস্থাপনা শৈলী ও সার্থক পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষমতা ইতিহাস পঠন পাঠনে রূপকথার গল্পের রাজপুত্তুরের হাতে সোনার কাঠি। তার ছোঁয়ায় শিক্ষার্থীর মনে কৌতুহল হয়ে উঠবে উদ্বেল, কৌতুহল নিবারণে শুরু হবে অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ; আর জ্ঞান আহরণ হবে সার্থক, সফল। এমনি ভাবেই কাগজে কলমে, পুঁথির পাতার মধ্যে বন্দী পাঠ্যক্রম হয়ে উঠবে জীবন্ত।

পাঠ্যক্রমের বাস্তব রূপায়ণ ও সার্থক প্রয়োগ সফল কর্ত্তে হলে সেই পাঠ্যক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সর্ব্বপ্রকারের স্বচ্ছন্দতানুভূতি থাকা চাই। এটা হচ্ছে গোড়ার কথা। এটা থাকলেই পাঠ্যক্রম হয়ে উঠবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রাণোচ্ছলতায় জীবন্ত।

বহু অভিজ্ঞ ইতিহাসের শিক্ষক ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনা প্রসঙ্গে কতকগুলি জিনিস স্মরণ করিয়ে দেন :—ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনা করবার সময় যে বিদ্যার্থী এই পাঠ্যক্রমটি পড়বে তার কথা সবার আগে মনে করতে হবে। পাঠ্যক্রম বিষয়বস্তুর অতি ভারে ভারাক্রান্ত যেন না হয়। পাঠ্যক্রম আয়ত্ত করতে বেচারা শিক্ষার্থীর মুখ দিয়ে যেন রক্ত না উঠে। আবার পাঠ্যক্রম যেন অতি লঘু না হয় যার ফলে এটা হয়ে উঠে মৃদু, কোমল (soft)। পাঠ্যক্রম রচনায় বিদ্যার্থীর বয়েস এবং সেই সঙ্গে তার মনের পরিণতি অপরিণতির, তার মনীষার মান প্রভৃতির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখতে হবে। এক কথায় পাঠ্যক্রম যেন মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং পরিমিত হয়।

ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র হতে নির্ব্বাচিত বিষয়গুলির সন্নিবেশ পাঠ্যক্রমে এমনভাবে সাধন করতে হবে যে সেটি যেন অর্থপূর্ণ, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত হয়। থাপছাড়া, অসংলগ্ন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অর্থহীন তথ্যের সমাহার বা সঙ্কলনে পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ।

ইতিহাস পাঠের যে মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তার সঙ্গে সঙ্গতি থাকে যেন ইতিহাস পাঠ্যক্রমের। ইতিহাস পড়ানোর যে উদ্দেশ্য তারই অভিব্যক্তি হবে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম। ইতিহাস পাঠের বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলির সাধনে সহায়ক না হলে সে পাঠ্যক্রম "ইতিহাসের পাঠ্যক্রম" বলে পরিগণিত হবে কি করে?

এই পাঠ্যক্রম হবে পরিকল্পনা সম্ভূত। যথেষ্ট চিন্তা, বিচার বিবেচনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা, যুক্তি গবেষণা থাকবে পাঠ্যক্রম রচনার পিছনে। হঠাৎ, আচমকা, আবেগপ্রলুব্ধ রচনায় পাঠ্যক্রম ছাড়া অন্য কিছু রচিত হতে পারে। পাঠ্যক্রম রচনা হবে পরিকল্পনা মত। পরিকল্পনার অভাবে পাঠ্যক্রম হয়ে উঠে অগোছালো, আগডুম বাগডুম, বিষয়বস্তুর অর্থহীন জটলা।

পরিকল্পনাটি যেন একদেশদর্শী না হয়। উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনাটি পুষ্ট হওয়া চাই। পরিকল্পনাটি এমন হবে তাতে যেন বিদ্যার্থীর জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু তাই বলে সে জাতীয়তা অন্ধ উন্মত্ততায় পরিণত যেন না হয়। জাতীয়তা স্থাপন করতে হবে আন্তর্জাতিক মনোভাবের আধারে। আজকের পৃথিবীতে মানুষে মানুষে, জাতে জাতে, দেশে দেশে

সহাবস্থান ভিন্ন গত্যন্তর নেই। তাই শিক্ষার্থীর যাতে জাতীয়তার সাথে আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগে তার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। মধ্য বিন্দুকে কেন্দ্রস্থলে রেখে যেমন বৃত্ত রচনা করে পরিধি, তেমনি নিজ দেশের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বিশ্বইতিহাসের বিন্যাস সাধন করবে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম,—জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে আন্তর্জাতিক মনোভাবের অভিপ্সিত সুউচ্চ সৌধ।

ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকবে যথেষ্ট নমনীয়তা (Plasticity) যাতে করে সহজেই কালের নিত্য নতুন গতির ছন্দে তাল রেখে তার সংস্কার সাধন সম্ভব হয়। পাঠ্যক্রম ইস্পাতের তৈরী "পাইপ" না হয়ে যেন রাবারের তৈরী "হ্যাক্সন হোস" হয়। অবিরাম কৌতুহলী গবেষণায় আর দুর্নিবার এষণায় যে আলোক সম্পাত হবে নতুন করে ইতিহাসের পুরানো অধ্যায়ে, আর তাতে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন হবে কালের বিবর্ত্তনে,—তার সুযোগ গ্রহণ করে সংস্কৃত হবার অবকাশ থাকে যেন পাঠ্যক্রমের কাঠামোতে। পাঠ্যক্রম যেন স্থাণু হয়ে বন্দী না হয়ে পড়ে ব্যাপ্তিহীন সঙ্কীর্ণ কূপের মধ্যে। এর মধ্যে গতির প্রয়াস যেন থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে ইতিহাসের বর্ত্তমান পাঠ্যক্রম ও অন্যান্য দেশের স্কুল ইতিহাস পাঠ্যক্রমের সাথে তার তুলনা :—

ইতিহাসের পাঠ্যক্রম আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। সে আলোচনার প্রারম্ভেই পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে ইতিহাসের বর্ত্তমান পাঠ্যক্রমটি কি সেটি দেখার প্রয়োজন হবে। ইতিহাসের বর্ত্তমান পাঠ্যক্রমটি জানবার আগে একটি কথা প্রাসঙ্গিক ভাবেই উল্লেখযোগ্য যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর আরম্ভ হয় শিক্ষার্থীদের ১১+বছোর বয়েস থেকে যখন তারা ষষ্ঠমানে পড়াশোনা শুরু করে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ইতিহাস পাঠ্যক্রমকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ হচ্ছে ষষ্ঠমান থেকে অষ্টম মান পর্য্যন্ত পাঠ্যক্রম। আর দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে নবম মান থেকে "স্কুল ফাইনাল" পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় ভাগটি আবার বর্ত্তমানে দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগের পাঠ্যক্রম দশম শ্রেণী সম্বলিত বিদ্যালয়গুলির জন্যে, অন্যটি একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়গুলির জন্যে। আমাদের পরিকল্পনা মত যখন দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়গুলি একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাবে তখন আর শেষোক্ত ভাগটি থাকবে না। যতদিন দশম শ্রেণীর স্কুল থাকবে ততদিন এ ভাগ রাখতে হবে।

দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ইতিহাস একটি আবশ্যিক বিষয়। কিন্তু একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে তা নয়। সেখানে সমাজ-বিদ্যা (Social studies) আবশ্যিক, আর ইতিহাস সাতটি "stream"-এর মধ্যে থেকে নির্ব্বাচিত একটি "stream"-এর (Humanities) অন্তর্গত একটি বিষয়। দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীর প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যেখানে একাধিক "stream" চালু হয়েছে সেখানে সে ব্যবস্থা আছে। দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠ্যক্রমে নবম এবং দশম মানে বিশ্ব-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি নেই। একাদশ শ্রেণী সম্বলিত বিদ্যালয়ে নবম থেকে একাদশ শ্রেণীতে জাতীয় ইতিহাসের সাথে বিশ্ব-ইতিহাসও পাঠ্য।

ষষ্ঠ মান থেকে অষ্টম মান পর্য্যন্ত ইতিহাসের পাঠ্যক্রমকে একটি ছেদহীন, ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ অংশ বলে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে। এখানে বিশ্ব-ইতিহাস পাঠ্যক্রমান্তর্গত। ষষ্ঠ মানের পাঠ্য প্রাচীন পৃথিবী, সপ্তম মানে মধ্যযুগ, আর অষ্টম মানে বর্ত্তমান যুগ।

ষষ্ঠ মান থেকে অষ্টম মান পর্য্যন্ত ইতিহাস-পাঠ্যক্রমের বিস্তারিত রূপটি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :—

ষষ্ঠ শ্রেণী :—প্রাচীন পৃথিবী

১। ভূমিকা : প্রাচীন মানুষের কথা আমরা কেমন করে জানতে পারি।

২। প্রাচীন মানব ; মানব জাতির বিভিন্ন শাখা।

৩। পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা—ইজিপ্ট, মেসোপোটেমিয়া, সিন্ধু উপত্যকা, চীন।

৪। আর্য্য জাতি। বৈদিক ভারত। প্রাচীন ইরাণ। হোমারের যুগে গ্রীস।

৫। ফোনেসীয় বণিক এবং ইহুদি 'প্রফেটগণের কথা।

৬। গ্রীস দেশের নগরসমূহ,—এথেন্স ও স্পার্টার জীবন যাত্রা।

৭। পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও ইহার গ্রীস-বিজয় অভিযান। থার্ম্মাপলি ও ম্যারাথনের ঘটনা। ৮। বুদ্ধের কাহিনী। ৯। কনফুসিয়াসের কাহিনী। ১০। আলেকজাণ্ডার, পুরু ও চন্দ্রগুপ্তের কথা। ১১। মহারাজ অশোক। ১২। রোমের অভ্যুত্থান। হ্যানিবলের কথা। ১৩। রোমান সম্রাটদের শাসনাধীনে রোমে জীবনধারা। ১৪। এই যুগের ভারতবর্ষের নৃপতিবর্গ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার। ১৫। যিশু-খৃষ্টের কাহিনী। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রসার। ১৬। ভারতে গুপ্তবংশের "সোনার যুগ"।

সপ্তম শ্রেণী :—মধ্য যুগ

১। বর্ব্বর জাতির আক্রমণ এবং রোম সাম্রাজ্যের পতন। বিদেশী আক্রমণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন। ২। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সভ্যতা। ৩। ভারতে হর্ষবর্ধনের আমল। হুয়েনসাঙের কথা। হুয়েনসাঙের সময় চীন দেশ। ৪। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় সভ্যতা। ৫। ইস্‌লামের কাহিনী এবং আরবীয়গণ। ৬। শার্লমেনের কথা। ৭। মধ্য-যুগীয় ইউরোপে মানুষের জীবনধারা—অভিজাত সম্প্রদায়, ভূমিদাস, নগর, বিশ্ব-বিদ্যালয়, সঙ্ঘারাম, ধর্ম্মযুদ্ধ। ৮। তুর্কীদের কথা। তুর্কীদের ভারতে আগমন। সুলতানী আমলে ভারত। ৯। মধ্যযুগে বঙ্গদেশ। ১০। মোঙ্গলদের কথা—চেঙ্গিস, কুবলাই, তৈমুর। ১১। অটোম্যান তুর্কিদের কাহিনী এবং কনস্টান্‌টিনোপলের পতন।

অষ্টম শ্রেণী :—বর্ত্তমান যুগ

১। ইউরোপে নবজীবন ও ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন। ২। ভৌগলিক আবিষ্কার ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক বসবাসের শুরু। ৩। ভারতে মোগল যুগ। ৪। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব। ৫। ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্তি ৬। আমেরিকায় বিপ্লব। ৭। ফরাসী বিপ্লব। ৮। শিল্প বিপ্লব। ৯। খণ্ডিত জার্ম্মানীতে ও বিভক্ত ইটালিতে ঐক্য। ১০। এমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি। ১১। এশিয়া ও আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার। ১২। চীন ও জাপানে নব জাগরণ। ১৩। রাশিয়ায় বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৪। দুটী বিশ্বযুদ্ধ। লীগ অফ্ নেশন্‌স্। য়ুনো। ১৫। ভারত ও এশিয়ার অপরাপর দেশের স্বাধীনতা। চীন দেশে বিপ্লব।

অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ইতিহাসের পাঠ্যক্রমটি উদ্ধৃত করবার পর ইতিহাসের পাঠ্যক্রমটি দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে। দশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে ইতিহাস ও ভারতীয় শাসনপদ্ধতি আবশ্যিক পাঠ্য ; একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে ইতিহাস আবশ্যিক পাঠ্য নয়। সেথা সমাজবিদ্যা আবশ্যিক পাঠ্য। পাঠ্যক্রমে সমাজ বিদ্যার অন্তর্ভুক্তির কারণ আছে। "ইতিহাস ও সমাজ বিদ্যা" এই অধ্যায়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। সমাজ-বিদ্যার মধ্যে অবশ্য ভারতীয় ইতিহাস ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভূগোল ও শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বিত করে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। ইতিহাস নতুন পরিপ্রেক্ষিতে ভূগোল ও শাসন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে বলে ইতিহাস পৃথকভাবে, আবশ্যিকভাবে একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না।

দশম শ্রেণী ও একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠ্যক্রমটি উদ্ধৃত করবার আগে একটি কথা প্রাসঙ্গিক ভাবেই উল্লেখযোগ্য। সেটি হচ্ছে এই যে যদিও ইতিহাস অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আছে বর্ত্তমানে, অদূর ভবিষ্যতে সমাজবিদ্যা (ইতিহাস ও ভূগোল একত্রিত করে) প্রবর্ত্তিত হতে পারে সেখানে। নবম দশম শ্রেণীতেও (দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে) সমাজবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত হবার কথা শোনা যাচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে বর্ত্তমান আকারে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম আর সেখানে থাকবে না।

দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে নবম-দশম শ্রেণীতে ইতিহাস পাঠ্যক্রম :—

নবম দশম শ্রেণীতে ইতিহাস আবশ্যিক পাঠ্য। এখানে ভারতীয় ইতিহাস পড়ানো হয় ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করে। এছাড়া ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাস কিংবা ইংলণ্ডের ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে পড়াবার ব্যবস্থা আছে।

একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্যক্রম :—

এখানে ভারতীয় ইতিহাস ও বিশ্বইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম ভাগের পত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় ভাগের পত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বর্ত্তমান যুগ ও আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিম বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত ইতিহাস পাঠ্যক্রমের এই হচ্ছে মোটামুটি সংগঠন।

এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনা করবার মূল যে পদ্ধতি ও নীতির আলোচনা করা হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বঙ্গের বিদ্যালয় গুলিতে অধুনা অনুসৃত ইতিহাস পাঠ্যক্রমটি বিচার করে দেখবার প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথম দৃষ্টিতেই আমাদের চোখে পড়বে যে বিশ্ব ইতিহাস এই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আজকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষে মানুষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্যে আন্তর্জাতিক মনোভাব মানুষের মনে জাগিয়ে তোলার কথা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। এই মহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির আনুকূল্যেই বিশ্বইতিহাস বিদ্যালয়ে পাঠ্য-ক্রমান্তর্গত। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ইতিহাস পাঠ্যক্রমের যে তালিকা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ প্রকাশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে এই পর্য্যায়ে ইতিহাস পাঠকে আখ্যানমূলক করে মহাকালের পরিক্রমায় যে যুগান্তকারী ঘটনাগুলির আবহ, আর যুগে যুগে যুগস্রষ্টা মহামানবদের আবির্ভাব এবং চলমান জীবনস্রোতের মধ্যে যেখানে যেখানে আছে রঙ আর আলো আর নাটকীয় ভাব সেইগুলির উপরই জোর দিতে হবে। বেশী খুঁটিনাটি

বা বিস্তারিত বিবরণ বিশ্লেষণের বোঝা এই স্তরে শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে না চাপিয়ে, তথ্যের ভিড়ে তাদের অসহায় ভাবে ফেলে না দিয়ে, তাদের মনে আগ্রহ এবং কৌতূহল সৃষ্টি করে যেগুলি অর্থপূর্ণ, সঙ্গতিপূর্ণ এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতা-বাহক সেইসব তথ্যগুলি শিক্ষার্থী দের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে।

একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পক্ষেই ইতিহাসের পাঠ তাদের স্কুল জীবনের এই পর্য্যায়েই শেষ হয়ে যাবে। কাজে কাজেই বিশ্ব ইতিহাসের একটি মোটামুটি ধারণা এই অবকাশে শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ও চিন্তাশীলতা আছে। ১৯৫১ খৃস্টাব্দে Sev́res Seminar-এ বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষকেরা স্কুলের ইতিহাসের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে যে সুপারিশগুলি করেছিলেন তার মধ্যে বিশ্ব-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তিই আমরা আমাদের স্কুল-পাঠ্যক্রমে করতে সক্ষম হয়েছি। অন্যগুলি করা সম্ভব হয়নি এইজন্যে যে সেগুলি বর্ত্তমানে কাজে পরিণত করা অসম্ভবের কোঠায়। এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে পাঠ্যক্রমান্তর্গত বিশ্বইতিহাস আমরা শ্রেণীকক্ষে ঠিক ঠিক রূপায়িত করতে পারছি না। শ্রেণীকক্ষে বিশ্বইতিহাসের সঠিক রূপায়ণের জন্যে নেই কোনো গবেষণা বা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা।

তাছাড়া বিশ্বইতিহাসের বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচন ও পাঠ্যক্রমে সেগুলির বিন্যাস-সাধন সম্বন্ধে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে। প্রশ্নজাগবে যে বিশ্বইতিহাসের কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা ও যুগস্রষ্টা মহামানবদের জীবনী পরপর সময়ের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে দিলেই কি বিশ্বইতিহাস-পাঠ্যক্রমের বিন্যাস সাধন করা হয়ে গেল? এই পদ্ধতিতে বিন্যস্ত ঘটনাগুলি কি বিশ্বইতিহাস পদবাচ্য? পাঠ্যক্রম রচনা করার মত জটিল কাজের নানা দিক থেকে সমালোচনা অবশ্য হবে। সমালোচনা হওয়া ভাল। তাতে আসল বস্তু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। এখানে আমরা কোনো পক্ষাপক্ষের মতের কথা বা যুক্তিতর্কের কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে বিশ্বইতিহাস অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হচ্ছে বা হয়েছে সেদিকে আমাদের চিন্তার মোড় ঘোরানো অধিকতর লাভজনক বলে মনে করি।

আমাদের স্কুলের ইতিহাস-পাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাস অন্তর্ভুক্তির যে উদ্দেশ্য তার বিপক্ষে কারো কিছু বলবার আছে বলে আমাদের মনে হয় না। কিন্তু যেভাবে এটি করা হয়েছে, যেভাবে এটির রূপায়ণ শ্রেণীকক্ষে করবার ব্যবস্থা, সেগুলি বিচার বিবেচনা করে এবং ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনা করবার যে

মূল নীতিগুলি আমরা পর্যালোচনা করেছি সেই পটভূমিকায় কোনো কোনো মহল থেকে বলা হয়ে থাকে যে এই পাঠ্যক্রমের অনুসরণে শিক্ষার্থীদের মনীষার মানের দিকে না তাকিয়ে সম-মানের (equal standardএর) নীতি গ্রহণ করা হয়েছে; শিক্ষার্থীর স্থানীয় পরিবেশ এবং স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্ব এই পাঠ্যক্রমে দেওয়া হয়নি; এখানে শিক্ষক মশায়ের স্বাধীন চিন্তাও বিশেষ আমল পায় না। এই মহল থেকে আরো বলা হয়ে থাকে যে বিভিন্ন দেশের কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন ভাবে বিন্যস্ত করে আমরা বিশ্বইতিহাস নাম দিয়ে স্কুলে চালু করেছি। বিশ্বইতিহাসে স্থান লাভ করবার জন্যে নির্ব্বাচিত তথ্যগুলির বিন্যাসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঠিকমত হয়নি। তাই সেগুলি অনেক সময়ই শুষ্ক তথ্যের বাণ্ডিল বলেই মনে হয়। Developmental approach বা অন্য কোন পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রম রচনা করবার কোনো প্রচেষ্টাও এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না, কোনো গবেষণা বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। এতে বিশ্ব ইতিহাসের সামগ্রিক রূপের ধারণা স্পষ্ট হয় না। তাই যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ব ইতিহাস পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

এই পাঠ্যক্রমের অনুসরণে ষষ্ঠমান থেকে অষ্টম মান পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীদের কাছে জাতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিক রূপটি প্রায় অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থী যখন নবম মানে উত্তীর্ণ হচ্ছে তখন সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় গুলিতে, সমাজবিদ্যার অন্তর্গত ইতিহাস অংশটুকু এবং ইতিহাস এই বিষয়টির মধ্যে বিন্যস্ত তথ্যগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে দুরধিগম্য দুর্ব্বোধ্যতার সৃষ্টি করছে। বলাবাহুল্য এখানে জাতীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে। দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়গুলিতেও নবম দশম শ্রেণীতে অনুসৃত জাতীয় ইতিহাস পাঠ শিক্ষার্থীদের কাছে অসুবিধাকর প্রতিভাত হচ্ছে। আর যারা ১৪+ বছর বয়সের মধ্যে স্কুলে শিক্ষার্থীর জীবন শেষ করছে (আমাদের দেশে অধিকাংশ ঐ বয়সের ছেলেরা তাই করে থাকে বর্ত্তমানে) তারা জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আদর্শ আর বাস্তবে তফাৎ অনেক। আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে আদর্শে উপনীত হবার জন্যে অদূর ভবিষ্যতে আরও কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে এ আশা আমরা পোষণ করি। আদর্শ যেখানে মহৎ সেখানে তাতে পৌঁছানোর জন্যে যে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের যখন এই অবস্থা তখন পৃথিবীর দু'একটি

প্রগতিশীল দেশের ইতিহাস-পাঠ্যক্রমের পর্য্যালোচনা করার জন্যে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের স্কুলসমূহে অনুসৃত পাঠ্যক্রম নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই উদ্ধৃতি থেকে আমাদের দেশের স্কুলের ইতিহাস-পাঠ্যক্রমের সাথে উক্ত দেশগুলির ইতিহাস-পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক ধারণা গঠন করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ইংলণ্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাস পাঠ্যক্রম :—

ইংলণ্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাস পাঠ্যক্রম উদ্ধৃত করবার আগে এখানকার মাধ্যমিক শিক্ষার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা অন্ততঃ বলার প্রয়োজন হবে। এখানে মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হয়ে থাকে শিক্ষার্থীদের ১১+বছর বয়েস হতে। মাধ্যমিক শিক্ষা এখানে তিন ধরনের। তিন রকমের পৃথক পৃথক স্কুলে এই শিক্ষা চলে। তিন রকমের স্কুল হচ্ছে (১) 'গ্রামার' স্কুল (২) 'টেক্‌নিক্যাল' স্কুল ও (৩) 'মডার্ন' স্কুল। গ্রামার স্কুলগুলিতে শিক্ষা বিদ্যাবিষয়ক (academic); শিক্ষার্থীর ১৬।১৮ বছর বয়েস পর্য্যন্ত এ শিক্ষা চলে; এ শিক্ষা দেওয়া হয় সমাজের উচ্চ স্তরের বৃত্তির জন্যে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে। 'টেকনিক্যাল' স্কুলে কারিগরী বা ব্যবসা বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। 'মডার্ন' স্কুলগুলিতে বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ বিধান করে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করবার ব্যবস্থা করা হয়। যে সব বিদ্যার্থীদের বিদ্যাবিষয়ক (academic) বা কারিগরী বিষয়ক শিক্ষার প্রবণতা থাকেনা সাধারণতঃ সেই সব শিক্ষার্থীদের এই ধরনের স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়। 'মর্ডার্ণ' স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষার কাল ১১—১৪, এই চার বছর। নীচে 'মডার্ণ' স্কুল ও 'গ্রামার' স্কুলের ইতিহাস পাঠ্যক্রম উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

'মডার্ণ' স্কুলের ইতিহাসপাঠ্যক্রম :—

শিক্ষার্থীর বয়স ১১—১৩ বছর যখন থাকবে :—

এই সময় সাধারণতঃ মানুষের পোষাক পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, যানবাহন প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্যনিচয় শিক্ষার্থীর জানতে হবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, ধারাবাহিক ভাবে এগুলি বিভিন্ন যুগে কেমন ছিল সেই গুলিই পাঠ্য। এই তথ্যগুলি যে কেবলমাত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসের মধ্যেই সীমিত থাকবে এমন নয়। এর পরিধি প্রসারিত করে বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তথ্য আহরণ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ইংলণ্ডের ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় অথবা বর্ত্তমান ইউরোপের ইতিহাসের পাতা থেকে, অথবা আমেরিকা বা ইংলণ্ডের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস থেকে এইসব তথ্য

আহরণ করা যেতে পারে। তবে সাধারণতঃ ইংলণ্ডের ও ইউরোপের ধারাবাহিক ইতিহাস থেকেই এই তিন বছর বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর বয়েস যখন ১৪ বছর থাকবে তখন ঃ—

উপরোক্ত পাঠ্যক্রমের সাথে কখন কখন সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক বিষয় সমূহ (যথা,—পার্লামেণ্ট, স্থানীয় শাসন, ট্রেড-ইউনিয়ন, কয়লা প্রভৃতি) অধীতব্য থাকবে।

'গ্রামার' স্কুলের ইতিহাস-পাঠ্যক্রম ঃ—

শিক্ষার্থীর বয়েস ১১—১২ বছর যখন থাকবে—

এই সময় প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলির কথা রোমের বৃটেন বিজয় পর্য্যন্ত, শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে। এ ছাড়া ইংলণ্ডের ইতিহাস ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পড়বার ব্যবস্থা থাকবে, আর এই ইতিহাস অধ্যয়ন করা হবে ইউরোপের এবং প্রাচ্যের ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে।

শিক্ষার্থীর বয়েস যখন ১৩ বছর থাকবে—

এই সময় সংক্ষিপ্তাকারে ইউরোপের ইতিহাস এবং উপনিবেশ বিস্তারের কথা উনবিংশ শতক পর্য্যন্ত, আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকবে।

১৪ বছর বয়েসের শিক্ষার্থীকে পড়তে হবে—

(ক) ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৃটেনের রাজনৈতিক ইতিহাস, ইউরোপের ঘটনাবলীর পটভূমিকায় ;

(খ) ১৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বৃটেনের শিল্পায়ন ;

(গ) বৃটেনের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনের ইতিহাস, শিক্ষার ইতিহাস আর ট্রেডইউনিয়নের ইতিহাস।

১৫ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে—

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ বা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ও ইউরোপের ইতিহাস।

১৬ বছর বয়েসের শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে ঃ—

১৬০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ বা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস ;

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ বা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস।

ইংলণ্ডের স্কুলগুলিতে অনুসৃত ইতিহাস-পাঠ্যক্রমের এই হ'ল মোটামুটি নমুনা। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব মুক্ত। বিভিন্ন স্কুলের প্রধানগণ নিজনিজ

এলাকার কথা চিন্তা করে, স্থানীয় পরিবেশের দিকে দৃষ্টি রেখে, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষণ-পদ্ধতি নির্ধারিত করবার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। সরকারী বিধিনিষেধের দ্বারা তাঁদের কাজ বা সিদ্ধান্ত মোটেই নিয়ন্ত্রিত নয়। এখানে ইতিহাস-পাঠ্যক্রম রচনায় এবং শ্রেণীকক্ষে তার বাস্তব রূপায়ণে বহু বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এ বৈচিত্র্য শুধু বিভিন্ন ধরনের স্কুলেই দেখা যায় না একই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন স্কুলেও নানা বৈচিত্র্য আছে। কাজেকাজেই উপরে উদ্ধৃত ইতিহাস-পাঠ্যক্রম দুটি "নমুনা" হিসেবে গ্রহন করাই ভাল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলের ইতিহাস পাঠ্যক্রম :—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপরিচালিত শিক্ষা পদ্ধতি নয়, শিক্ষায় সেথা বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্নভিন্ন পাঠ্যক্রম। তাই নীচে যে ইতিহাসের পাঠ্যক্রমটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে সেটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনুসৃত পাঠ্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্তসার বলেই পরিগণিত হবে। উদ্ধৃত পাঠ্যক্রম থেকে ইতিহাস পাঠ্যক্রমের একটি মোটামুটি ধারণা হবে।

শিক্ষার্থীর ৯ বছর বয়েস অবধি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে ইতিহাস বা ভূগোল পৃথক-ভাবে পাঠ্যক্রমান্তর্গত হয় না। এই সময় সমাজবিদ্যা পড়ানো হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর যখন ১০ বছর বয়েস হয় তখন—

ক্যানাডা ও ল্যতিন আমেরিকা সহ সব স্কুলেই সামগ্রিক ভাবে আমেরিকার ইতিহাস পড়ানো হয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দথেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই ইতিহাসের পরিধি। মানুষের জীবনধারণ প্রণালী, আবিষ্কার উদ্ভাবন, বিভিন্ন এলাকায় মানুষের জীবনযাত্রা, আমেরিকার পশ্চিমভূখণ্ডের দিকে ক্রমপ্রসার ও বসতিস্থাপন,— প্রভৃতির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়ে থাকে। এই পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর ১২ বছর বয়েস অবধি অনুসৃত হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর বয়েস যখন ১৩—১৪ বছর থাকবে তখন—

১৪৯২ খৃষ্টাব্দ থেকে আধুনিককাল পর্য্যন্ত আমেরিকার ইতিহাস পড়তে হবে। আমেরিকার স্বাধীনতা, আমেরিকার ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার, যানবাহনের উন্নতি এবং প্রধান প্রধান যানবাহন শিল্পের বৃদ্ধি ও প্রভাব প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থীর বয়েস যখন ১৫ বছর হবে তখন—

শিক্ষার্থীকে পড়তে হবে বিশ্বইতিহাস, আদিমানব থেকে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত। অর্দ্ধেক সময় নির্দ্দিষ্ট থাকবে বিশ্বইতিহাসের ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে

বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পড়বার জন্তে। এখানে মানুষের আজকের সভ্যতায় বি ভি জাতের অবদানের উপর এবং বিভিন্ন ধরনের "ইনষ্টিট্যুশন্"-এর ক্রমিক পরিণতির উপর জোর দেবার ব্যবস্থা আছে। এই সময় পাশ্চাত্য সভ্যতা ছাড়া অন্তসভ্যতার কথা, বিশেষভাবে সেই সব সভ্যতাশ্রয়ী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করবার প্রচেষ্টা থাকে, কিন্তু সর্ব্বাত্মকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে বেশী। ইতিহাসের এই পাঠ্যক্রমটি ভূগোলের সাথে অনুবন্ধ প্রথায় গ্রথিত।

শিক্ষার্থীর বয়েস যখন ১৬ বছর হবে তখন—

বিশ্বইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস পড়ানো হবে। "পৃথিবীর পটভূমিকায় একটি গণতন্ত্রের দেশ"—এই হচ্ছে পরিকল্পনা। অর্দ্ধেকের বেশীসময় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পরের আমেরিকার ইতিহাস পাঠে ব্যয়িত হবে; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান পরিণতি, তার রাজনীতির ধারা, গণতন্ত্রের বিবর্ত্তন, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পর অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি, যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ ও ভাবধারা, বিশ্বের ঘটনা প্রবাহে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হবে।

ফ্রান্সের স্কুলে ইতিহাস-পাঠ্যক্রম :—

ফ্রান্সের যা শিক্ষাপদ্ধতি তাতে শিক্ষার্থীর ১৩ বছর বয়েসকাল অবধি প্রাথমিক শিক্ষা দেবার প্রথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চালু আছে। ১১ বছর বয়েস শেষ করে ১২ বছর বয়েসে শিক্ষার্থী যদি ইচ্ছা করে তো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে পারে। আর যদি সেরকম ইচ্ছা না থাকে তো ১৩ বছর বয়েস পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থেকেও যেতে পারে। আমরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইতিহাস-পাঠ্যক্রম উদ্ধৃত করছি, তাই শিক্ষার্থীর যখন ১২ বছর বয়েস হবে তখন থেকে তার ইতিহাস-পাঠ্যক্রম কি হবে সেইটিই কেবলমাত্র এখানে উদ্ধৃত করবো।

শিক্ষার্থীর ১২ বছর বয়েসে—প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী এবং প্রাচীন ইতিহাস রোমান সাম্রাজ্যের পতন অবধি পড়বে।

শিক্ষার্থীর ১৩ বছর বয়েসে—ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস পঞ্চদশ শতক অবধি।

শিক্ষার্থীর ১৪ বছর বয়েসে—ইউরোপের ইতিহাস; আবিষ্কারের যুগ (ষোড়শ-শতক) থেকে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

শিক্ষার্থীর ১৫ বছর বয়েসে—ইউরোপের ইতিহাস, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এটি পড়তে হবে পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের প্রধান প্রধান ঘটনার সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

শিক্ষার্থীর ১৬ বছর বয়সে—১৬১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস। এর সাথে মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচ্যের কথা, অষ্টাদশ শতকে ঔপনিবেশিক সমস্যাগুলির কথা এবং আমেরিকার স্বাধীনতার কথাও থাকবে।

শিক্ষার্থীর ১৭ বছর বয়সে—১৭৮৯ খৃষ্টাব্দথেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস। এই পর্য্যায়ে ফরাসী ইতিহাসের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে, ঔপনিবেশিক ও আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা হবে।

শিক্ষার্থীর ১৮ বছর বয়সে—১৮৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস এবং তার সঙ্গে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের কথা।

ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের স্কুলের ইতিহাস পাঠ্যক্রমের তথ্যপ্রাপ্তির উৎস :—

১। ইংলণ্ডের—Information supplied by the United kingdom National Commission for UNESCO in 1951.

২। আমেরিকা—(i) American History in schools and colleges, Report of the committee on American History, New york, Macmillan co. 1944.

(ii) Howard, R. Anderson—Teaching of United states history in Public high schools ; U. S. Office of education Bulletin 1949 No. 7. etc.

৩। ফ্রান্স—Programmes for primary schools, 1947 and for secondary schools, 1949, published by the ministry of Public Instructions, and information Supplied by the French National Commission for UNESCO in 1952.

ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি

ইতিহাস পড়ানো শক্ত এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। ইতিহাস শিক্ষকের সামনে আছে নানারকমের জটিল সমস্যা। বর্ত্তমানে স্কুল পাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি ইতিহাস শিক্ষকের কাজকে করেছে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ, সমস্যাকে করেছে জটিলতর আর সমস্যার সংখ্যাকে বহুতর। স্কুলে ইতিহাস পাঠ সম্বন্ধে একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। অভিযোগ এই যে স্কুলে ইতিহাস যেভাবে, যে পদ্ধতিতে পড়ানো হয় সেটার মধ্যে ত্রুটি আছে যথেষ্ট। এটি অনেকাংশে এবং অনেকক্ষেত্রে সত্য। আমাদের দেশে ইতিহাস-শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে যে সুষ্ঠুভাবে পড়ানোর অভাবে ইতিহাস, ছাত্র এবং অভিভাবকদের কাছে, দিন দিন জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছে। একথা অবশ্য অস্বীকার করার নেই যে ইতিহাস পড়ানোর যা সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিদ্যার্থীর বিদ্যালয়ের জীবনে তা সম্যক সফল হয়নি, এর অধিকাংশগুলিই আসে পরে। এখানে সেগুলির বীজ বপন করা হয় মাত্র। কিন্তু তবু কতকগুলি জিনিস আছে যেগুলির দিকে একটু দৃষ্টি দিলে স্কুলে ইতিহাস-পাঠ নিষ্ফল প্রয়াসের কোঠায় পড়বে না। কোনো রকম চটক লাগিয়ে দিয়ে ছাত্র এবং অভিভাবকদের মন হরণ করবার প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে আমরা পরিহার করে চলবো। ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি যে আমাদের স্কুলগুলিতে অত্যন্ত নীরস, ত্রুটিপূর্ণ, গতানুগতিক ও একঘেয়ে হয়ে পড়ছে বা পড়েছে এই বাস্তব সত্যটিকে মেনে নিয়ে ইতিহাস পড়ানো কি করে ভালো করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। একটু ভালো করে তাকালেই দেখতে পাওয়া যাবে যে স্বাদ-হীন এই ইতিহাস পড়ানোর দৌলতে বিদ্যার্থীরা ক্রমশঃ ইতিহাস পড়াটাকে এড়িয়ে চলছে। শিক্ষক মশায়ও যেমন অধিকাংশক্ষেত্রে দায়ঠেলা ঝকমারির কাজ কোনো রকমে সেরে নিষ্কৃতি পান, তেমনি বিদ্যার্থীরাও পরীক্ষা বৈতরণী পার হবার জন্যে কোনো রকমে ইতিহাসের "শর্টকাট", "ইজি সাক্‌সেস্‌" প্রভৃতি অপূর্ব্ব নামধারী রক্ষাকবচের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি মুখস্থ করে তরে যায়। আর তাতেই তাদের ইতিহাস পড়ার শেষ। শ্রেণীকক্ষে হাতনেড়ে ঘাড়নেড়ে, "বুঝেছি স্যার" বলে, ইতিহাস শিক্ষককে ফাঁকি দেওয়া এমন-একটা শক্ত ব্যাপার নয়

কিন্তু একথাও আমরা জানি যে ইতিহাস পড়ানোর যে নীরসতা, ইতিহাসের শিক্ষকের সামনে যে নানা সমস্যা, এর জন্যে ইতিহাস এই বিষয়টির প্রকৃতিও অনেকাংশে দায়ী। তাই স্কুল-পাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি যখন ইতিহাস পড়ানোর কাজটিকে করেছে দুরূহতর আর তার সমস্যাকে করেছে জটিলতর তখন ইতিহাস-শিক্ষক মশায় তাঁর পেশাগত দায়িত্ব এবং শিক্ষাগুরুর কর্ত্তব্য আর দরদ নিয়ে এগিয়ে না এলে এ সমস্যার সমাধান হওয়া দুষ্কর।

কেতাবে অনেক সময় ফলাও করে ইতিহাস পঠন-পাঠনের যে সব বর্ণাঢ্য উপদেশ থাকে সেই "থিওরি" ছেড়ে আমরা আমাদের শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পড়াতে গিয়ে যে সব অসুবিধে হাতে কলমে পাই সেগুলির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করবো।

ইতিহাস পাঠে আছে বেশ কিছু বিমূর্ত্ত চিন্তা। স্কুলের শিক্ষার্থীদের বয়েস অনুপাতে এ চিন্তার উদ্বোধন দুষ্কর। তাছাড়া ইতিহাস মানুষের কথা, আর তার উপাদান হচ্ছে মানুষ, মানুষের কার্য্যাবলী, মানুষের বিভিন্ন চিন্তাধারা তাও আবার একই সময়ের, একই প্রকৃতির একই যুগের নয়। তারা নানা বৈচিত্র্যে জটিল, বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন অথচ বহু সংমিশ্রনে অভিনব এবং ব্যঞ্জনাময়। আবার যে সব মূল উপাদান-সম্ভার থেকে ইতিহাসের তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে তাদের প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ এবং সংস্পর্শ সুকঠিন। তাছাড়া মূল তথ্যগুলির ব্যাখ্যা (interpretation) ও অনেক সময় বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন ভাবে করে থাকেন। ইতিহাসের মূল উপাদানগুলি অনেক সময়ে সহজগম্য নয় বলেই ইতিহাসপাঠে সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে সিদ্ধান্তে আসার প্রক্রিয়া অবরোহী,—অনুমান সাপেক্ষ (Deductive), আরোহী (Inductive) নয়।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু বেশীর ভাগই অতীতের অগম্যতীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কোথাও কোথাও অতীত এত সুদূর, এবং তার সম্বন্ধে তথ্যোপকরণ ও জ্ঞান এত সীমিত যে আমাদের এই বর্ত্তমানের সাথে ব্যবধান তার একান্তভাবেই দুস্তর। নির্ব্বাক সেই অতীতের অগম্যতীরে সশরীরে উপনীত হবার যেমন কোনো উপায় নেই তেমনি সেই অতীত-ইতিহাসের তথ্যরাজিকে সাক্ষাৎভাবে, প্রত্যক্ষভাবে, অবলোকন করবারও কোনো সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া অতীত এবং বর্ত্তমানের মধ্যে আছে শত পরিবর্ত্তনের ভাঙাগড়া। মহাকালের প্রবাহের বাঁকে বাঁকে কতো বিভিন্ন সভ্যতার, কতো বিভিন্ন চিন্তার, সংমিশ্রণ ঘটেছে; কতো হাজারো মানুষের কর্ম্মস্রোত সমাজ জীবনে পরিবর্ত্তন এনেছে। সেই সব বিভিন্ন সভ্যতার ও চিন্তার ধারা, যুগে যুগে মানুষের যুগান্তকারী কার্য্যাবলীও

আমাদের এই বর্ত্তমান থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে অতি বিচিত্র ও অদ্ভুত বলে মনে হয়। অথচ এই সবের সাথে শিক্ষার্থীর মনের নিকট ও নিবিড় সংযোগ সাধন করতে হবে। তাদের ইতিহাসের শিক্ষা যাতে করে সার্থক হয়, যাতে করে কার্য-কারণের বিশ্লেষণে, বর্ত্তমানে মানব সভ্যতার বিস্তীর্ণক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত তথ্য ও ঘটনা-বহুল ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাসের বিবর্ত্তনের যে সামগ্রিক রূপ সেটি সুপরিস্ফুট হয় শিক্ষার্থীর কাছে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজ সুকর মোটেই নয়।

মহাকালের অনন্ত যাত্রার প্রতি পদক্ষেপে আছে আলোড়ন। কর্ম্মমুখরা ও প্রাণচঞ্চলা পৃথিবীর বুকে নিত্য নানা পরিবর্ত্তনে হাজারো ঘটনার ভিড়। ঘটনা শূন্যে ঘটেনা। ঘটনা ঘটবার জন্যে যেমন কারণ আছে, তেমনি ঘটনা ঘটবার জন্যে আছে স্থান আর কাল। স্থান-কালহীন-ঘটনা আজগুবি গল্প। তার সাথে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই শ্রেণীকক্ষে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে বিদ্যার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করবার সময় এই ঘটনাগুলিকে তাদের ঘটবার স্থানের ও কালের সাথে সংযুক্ত করে উপস্থাপিত করবার প্রয়োজন আছে। ঘটনাকে কালের সাথে সংযুক্ত করার উপায় মানচিত্র। মুখে বলা আর কানে শোনার সেথা কোনো বিশেষ মূল্য নেই। ঘটনাকে "কালের" সাথে সংযুক্ত করা দুরূহ। কাল অনাদি ও অনন্ত। কালের ধারণা পরিণত মনেই অনেক সময় হেঁয়ালি হয়ে উঠে। সময়বোধ শিক্ষার্থীদের বয়েস অনুপাতে জাগে। সুতরাং শিক্ষক মশায়কে সেদিকে বিশেষ সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। নিরবধি কালের ধারণা আমাদের সীমিত জ্ঞানের গণ্ডিতে যে ভাবে ধরে রাখার প্রক্রিয়া আমরা অবলম্বন করেছি তাকেই অনুসরণ করে ঘটনাকে কালের সাথে সংযুক্ত করে সময়ের ধারণা দিতে হবে শিক্ষার্থীকে। একাজও সহজ নয়।

ইতিহাসের পাতায় যে হাজারো ঘটনা তারা সব এক ধরনের নয়। তাদের প্রকৃতি ভিন্ন, পরিপ্রেক্ষী ভিন্ন; ভিন্ন তাদের কারণ ও পটভূমিকা। এই ঘটনাগুলিকে আবার "ক্রম" অনুসারে আবহ বজায় রেখে উপস্থাপিত করতে হবে। ক্রম অনুসারে সাজিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে উপযুক্ত করে উপস্থাপন করা সহজসাধ্য নয়। শুধু ক্রম অনুসারে সাজালেই আবার যথেষ্ট হবেনা। তাকে সাজাতে হবে, ভাগ করতে হবে। এই সব ঘটনাগুলি মানুষ তার বুদ্ধিতে নাগাল পাবার জন্যে কতকগুলি পর্য্যায়ে ভাগ করেছে। এই ভাগ করার ফলে ঘটনাগুলির বিন্যাস সাধন সহজও সুষ্ঠু:হয়ে উঠছে। ঘটনাগুলির বিন্যাস

আমরা যে যে ভাগে চিহ্নিত করেছি তাদের মধ্যে আছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রভৃতি নানা সীমা রেখার চিহ্ন। এই ভাগগুলি করা সত্ত্বেও ঘটনাগুলির সুষ্ঠু বিন্যাসে ও সন্তোষজনক উপস্থাপনে অনেক সময় আবার সময়ের ক্রম এসে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এ বাধা দূর করা অনেক সময় দুরূহ হয়। ইতিহাস-শিক্ষককে এবিষয়ে অবহিত হয়ে উপায় অবলম্বন করতে হবে।

তাছাড়া নিত্যচলমান কালের বুকে যে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে,—বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন পটভূমিকায়,—তাদের শুধু বর্ণনাই তো ইতিহাস নয়। তাদের চিন্তাশীল অনুশীলনে, কার্য্যকারণের সম্যক সম্পর্ক বিশ্লেষণে, তাদের পরস্পরের সংযোগ স্থাপনে এবং তাদের সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আসবে ইতিহাস পঠনপাঠনের সার্থকতা। এই বিশ্লেষণে ও উপসংহারে ঘটনাগুলির পরস্পর পারম্পর্য্য বজায় রাখা এবং ঘটনার স্থানের ও কালের সাথে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যথাযথ সংযোগ স্থাপন করার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে ইতিহাসের শিক্ষককে। আর এই দৃষ্টি নিয়ে দেখলে ইতিহাসের শিক্ষক নিজেই দেখতে পাবেন যে তার কাজ বেশ কঠিন এবং তাঁর দায়িত্বও যথেষ্ট গুরু।

এই যখন অবস্থা এবং ইতিহাস এই বিষয়টির প্রকৃতি অনুসারে এটির পড়ানোর যখন এই সব সমস্যা তখন ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠনপাঠন সফল করে তোলবার জন্যে শিক্ষক মশায় কি উপায় অবলম্বন করবেন? শিক্ষার্থীর বয়েস ও মনীষার বিকাশ অনুযায়ী পাঠটীকায় অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যক্রমাংশের চাহিদা মত পাঠ্য বিষয়বস্তুর উপস্থাপন সহজ ও কার্যকরী করবার জন্যে কি ব্যবস্থা তিনি করবেন স্বভাবতই সে প্রশ্ন মনে জাগে।

যে যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠনপাঠন সফল হয়ে উঠে সেগুলির মধ্যে প্রধানতঃ (১) ইতিহাস শিক্ষক মশায়ের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পেশাগত প্রস্তুতি ও ব্যক্তিত্ব (২) তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ও (৩) ব্যবহৃত Teaching aids—আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "ইতিহাস-শিক্ষক" এই অধ্যায়ে শিক্ষক মশায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে আর "Teaching aids" সম্বন্ধে একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজিত কয়া হয়েছে। এখানে পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করবো।

শুধু ইতিহাসের কেন কোনো বিষয়েরই পড়ানোর একটি সর্ব্বজনস্বীকৃত ও সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতি ঠিক করা যায়না। যে কোনো বিষয়ই হোকনা কেন সেটির পঠন পাঠন কতকগুলি জিনিসের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল

এটি ইতিহাস পঠনপাঠনের বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যে জিনিস গুলির উপর ইতিহাস পঠন-পাঠন একান্তভাবে নির্ভরশীল সেগুলি আবার সবজায়গায় সমান নয়। আমার স্কুলের যে পরিবেশ তার সাথে আপনার স্কুলের পরিবেশের সাথে হুবহু মিল নেই। আপনার স্কুলে ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ হয়তো আছে, আমার স্কুল বা অন্য স্কুলে সেটি না থাকতে পারে।

স্কুলের অবস্থান-বৈচিত্র্য ইতিহাস পঠন-পাঠনের উপর সমধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। স্থানীয় পরিবেশ, অভিভাবক সমূহের মনোভাব এবং শিক্ষা, তাদের জীবন-মান, প্রধান শিক্ষকের সহানুভূতির তারতম্য, ইতিহাস পড়ানোর আধুনিক সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির ক্রয়-ক্ষমতা, আমাদের দেশে ম্যানেজিং কমিটির মনোভাব প্রভৃতি বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানোর উপর এমন একটি প্রভাব বিস্তার করে যা আমরা আদৌ অবহেলা করতে পারিনা। আর এটা ঠিক যে এইগুলি সব জায়গায় এক নয়।

ইতিহাসের শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, তাঁর রুচি, যোগ্যতা স্কুল ভেদে, শিক্ষক ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন। একটি গাছের দুটি পাতা যেমন হুবহু এক রকম নয় তেমনি দুটি ইতিহাস-শিক্ষকও হুবহু এক হতে পারেন না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যা পার্থক্য তা এখানেও দেখতে পাওয়া যাবে। অনুরূপ ভাবেই শিক্ষার্থীদের মনীষার মানের পার্থক্যও পৃথক পৃথক পরিবেশে ও ভিন্ন স্কুলে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

এই সমস্ত কারণে ইতিহাস পড়ানোর একটি সর্ব্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি, যেটি সব কালে, সব জায়গায়, সব পরিবেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে,—একটি প্রয়োগসিদ্ধ "ফরমুলা", বাঁধা ছক,—স্থির করা যায়না। আর এই জন্যে এই কথা অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ, আত্মবিশ্বাসী ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকই তাঁর স্কুলের স্থানকাল পাত্র, স্কুল-পরিবেশ, ছাত্রদের যোগ্যতা, প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে সব দিক ভেবে চিন্তে, সব দিক বজায় রেখে পদ্ধতি ঠিক করে নেবেন। বলাবাহুল্য যে তাঁর পেশাগত প্রস্তুতি ও থাকবে যথেষ্ট। ইতিহাসের শিক্ষকই ইতিহাস পড়ানোর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ইতিহাস শিক্ষকের সংখ্যা যতো ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতির সংখ্যাও ততো। একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে ইতিহাস শিক্ষক যা ইচ্ছে তাই করবেন। এর অর্থ যথাযথ অনুধাবন করতে হ'লে ইতিহাস-শিক্ষক সম্বন্ধে প্রযুক্ত উপরে উল্লেখিত বিশেষণগুলি ভালকরে পর্য্যালোচনা করতে হবে।

আমরা দেখেছি যে ইতিহাস পড়ানোর কোন বিশেষ একটি,—সব সময়ে, সব অবস্থায় প্রয়োগযোগ্য,—সুষ্ঠু পদ্ধতি ঠিক করে নেওয়া যায়না। ঠিক করা

যায়না তা সম্ভব নয় বলেই। তাই যদি হয় তাহ'লে ইতিহাস পঠন-পাঠনে অনুসরণ করবার জন্যে কি পদ্ধতি ঠিক করা হবে? সে কথা আমরা আলোচনা করবার আগে ইতিহাস পঠন-পাঠন কালে মনে রাখবার জন্যে কতকগুলি সাধারণ নীতির কথা বিবেচনা করে দেখবো। আর তার পর দেখবো পদ্ধতি।

ইতিহাস পঠনপাঠনের কতকগুলি মূল নীতি সাধারণভাবে ঠিক করে নেবার আগে আমাদের ভুললে চলবে না যে এই সাধারণ নীতিগুলিও আবার অনেকাংশে নির্ভর করে ইতিহাস এই বিষয়বস্তুটির প্রকৃতির উপর। ইতিহাস পড়ানোর বেলায় যেমন কতকগুলি অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় ইতিহাসের শিক্ষক মশায়কে (আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই সেগুলি দেখেছি) তেমনি এই বিষয়টির পঠন-পাঠনের সময়ে অনুসরণ করবার মত কতকগুলি সাধারণ নীতি, যেগুলি মনে রাখলে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন সার্থক হবার পথে কোনো বিশেষ বাধার সৃষ্টি হবে না,—ঠিক করে নেওয়াও চিন্তাসাপেক্ষ।

ইতিহাস স্কুলের বিদ্যার্থীদের পড়ানো বেশ দুরূহ। ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য কি তা আমরা দেখেছি, তার পাঠ্যক্রমও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু আদর্শ সামনে রেখে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম তৈরী করা এক জিনিস আর তাকে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের মধ্যে পড়িয়ে, সাবলিল ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত করে কাগজ-কলমে লেখা আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্পূর্ণ পৃথক। বাস্তবের নির্ম্মম আঘাত আছে এখানে প্রতিপদে। আদর্শের কল্পনায় যাকে রঙীন মনে হয় বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে সে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। ইতিহাস পড়ানোর বাস্তবতায় প্রথমেই চোখে পড়বে,—বিদ্যার্থীর দৈনন্দিন জীবন থেকে, তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, —ইতিহাসের অধীতব্য বিষয়বস্তুর বিরাট ব্যবধান। একের সাথে অন্যের কোনো সম্পর্ক নেই, একেবারে অনেক দূরের জিনিস। ঘটনার স্রোতের জীবনহীন পলির উপর মহাকালের চরণচিহ্ন আঁকা অতীত মৃত। সেখানে আজ আর ঘটনার স্রোত বহে না, সে উদ্বেল স্রোত আজ শুষ্ক। সেই অতীত থেকে সময়ের যে ধারা বহে এসেছে অনন্তের দিকে, সে চলেছে আজ বর্ত্তমানের মধ্যে দিয়ে। মৃত অতীতকে জীবন্ত করে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা অতি দুরূহ কাজ। বাস্তবের সাথে সম্পর্কহীন বলেই ইতিহাসের বিষয়বস্তু অনেক সময় কল্পনার জালে বোনা অস্পষ্ট বাক্য-জাল হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীর তাতে বিশেষ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য থাকে না। তাই ইতিহাস পাঠে মুখস্থ করাটা হয়ে উঠে একটা অনিবার্য্য ফল। ইতিহাস পাঠের চূড়ান্ত ফল অবশ্য অনেক সম্ভাবনাময়, কিন্তু গোড়ার দিকে এটি দুরধিগম্য। সেই জন্যেই নীরস। বাল্যের

বা কৈশোরের অপরিণত মানসে তার ছবি আঁকা কষ্টসাধ্য। আর শুধু বাল্য বা কৈশোর মনেই বা কেন অতিক্রান্ত কৈশোর মনেও সে উদ্দেশ্য পুষ্পিত হয় না। স্কুলের জীবনে ইতিহাস পড়ার সার্থকতা দাগ ফেলে না মনে। এর ফল আসে পরে। তাছাড়া যে সব বিদ্যার্থীর স্মৃতি একটু প্রখর তারা সহজেই ইতিহাসের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত তথ্যগুলি আয়ত্ত করে ফেলে, তাদের কাছে ইতিহাস পড়ানোর যে রমন্তিকতা (Romantic touch) তা আর থাকে না।

কিন্তু তা বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। এর মধ্যে থেকেই, এই সব বাধার ব্যূহ ভেদ করেই কতকগুলি সাধারণ এবং মূলনীতি আমাদের ঠিক করে নিতে হবে এবং এই নীতিগুলি শ্রেণী-কক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠন কালে মনে রাখতে হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ অবতারণা করবার আগে আমরা আরো একটি জিনিষ মনে রাখবো যে ইতিহাস পঠন-পাঠনে ইতিহাসের পাঠ্য বস্তুর নির্ব্বাচন-নির্দ্ধারণ ও সংস্থাপন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। কি কি পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সেগুলি সন্নিবেশিত হবেই বা কি করে, কোন শ্রেণীতে কোন্ কোন্ বিষয়বস্তুর সংযোজন করা হবে, এগুলির উপর ইতিহাস পড়ানো অনেকখানি নির্ভর করে। এগুলি আমরা পাঠ্যবিষয়বস্তুর নির্ব্বাচন ও বিন্যাস বলতে পারি। "ইতিহাসের পাঠ্যক্রম" এই অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচন বা বিন্যাস অপেক্ষা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষক ইতিহাস পড়াবেন তা আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনের উপর। বস্তুতঃ পদ্ধতি পড়ানোর অনেকখানি স্থান অধিকার করে বসে আছে। আমি কি পড়াবো সেটি যেমন আবশ্যকীয়, আমি কেমন করে পড়াবো সেটিও সমান আবশ্যকীয় ও সমভাবেই প্রণিধানযোগ্য।

পদ্ধতি এমন হবে যে সেটি ইতিহাস শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, মেজাজ, যোগ্যতা প্রভৃতির উপযুক্ত হবে। অর্থাৎ যাঁর যা শোভা পায় সে সম্বন্ধে তাঁকে সম্যক অবহিত থাকতে হবে। যাঁর যেটি ভাল আছে সেটিকে কাজে লাগাতে হবে। নিজের দৌড় ভাল ভাবে জেনে নিজের যা অক্ষমতা সেটিকে এড়িয়ে চলতে হবে। যাঁর আঁকায় হাত আছে তিনি নিশ্চয় সেটি কাজে লাগাবেন। যাঁর আঁকা ভালো আসে না তিনি যদি বোর্ডে কিছু স্কেচ্ করতে যান তাতে হয়তো এমন জিনিস আঁকা হতে পারে তাতে পরের কেন শিক্ষক মশায়ের নিজেরই হাসির উদ্রেক হতে পারে। এটা ঠিক নয়। এতে ছাত্রদের মনের উপর একটা অবাঞ্ছিত প্রভাব আসে।

ইতিহাস শিক্ষককে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। আর সব সময়েই যে কলা কৌশল তাঁর আয়ত্তে আছে সেটি অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে অধিকতর কার্য্যকরী ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যাদেরকে পড়াচ্ছি, তাদের শিক্ষার মান, তাদের প্রয়োজন, মনীষা, পরিবেশ, বয়েস, তাদের বুদ্ধির বিকাশ, এসবের দিকে ভাল করে দৃষ্টি রেখে, সব দিক বজায় করে, সদা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা বৈগুণ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াটা পদ্ধতির কলাকৌশলের একটি বড় অঙ্গ।

একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে আমাদের স্কুলগুলিতে ইতিহাস পড়ানোর সময় বক্তৃতা যতটা পদ্ধতি হিসেবে চালানো হয় আর কোন বিষয় পড়ানোর সময় ততটা হয় না। দিন নেই, ক্ষণ নেই, সময় নেই, অসময় নেই, শিক্ষার্থীদের ভাল লাগা নালাগার প্রশ্ন নেই, বিষয় বস্তুর প্রয়োজনেই হোক আর অপ্রয়োজনেই হোক বক্তৃতা, কেবল বক্তৃতা। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বক্তৃতাটা সব সময় স্কুলের ছেলেদের উপর ভাল কাজ করে না। বক্তৃতার মধ্যে থেকে বিষয়-বস্তু আহরণ করে তাকে আয়ত্ত করার মত বুদ্ধি তাদের পরিণত হয়নি। শুধু বক্তৃতা দিলে যে কোনো বিষয়ই পড়ানো যায় না অর্থাৎ পড়িয়ে শেখানো যায় না এটি অনেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন; এতে অবশ্য যেটি পাঠ্যক্রম সেটি শেষ করাই শুধু হয়। শুধু একটা পদ্ধতি নিয়ে থাকলে ইতিহাস পড়ানোয় অনেক অসুবিধে আছে। বিশেষ করে যাঁরা বিভিন্ন বয়েসের শিক্ষার্থীদের ইতিহাস পড়িয়ে থাকেন তাঁদের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে বক্তৃতা ছাড়া ইতিহাস পড়ানোর বিভিন্ন কলাকৌশল ও তাদের সার্থক প্রয়োগ ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হবে।

শিক্ষার ব্যাপারে সব থেকে বড়ো কথা হোলো কৌতূহল সৃষ্টি। কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারলেই অর্দ্ধেক কাজ সারা হয়ে গেল। আজকের মানব সভ্যতার যে বিস্ময়কর সৌধ এর মূলে আছে মানুষের কৌতূহল-প্রবৃত্তি, যা চরিতার্থ করবার জন্যে যুগে যুগে মানুষ অসম্ভবকে করেছে সম্ভব। কৌতূহল জাগলেই আসবে আগ্রহ। কোনো বিষয়বস্তু পড়াতে গেলে সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলা তো পদ্ধতির মূলকথা, আর সার্থক পঠন-পাঠনে সেটি একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য। বিষয় বস্তুর প্রতি আগ্রহ জাগাতে না পারলে, তিনি যতো বড় পণ্ডিতই হোন না, শিক্ষার্থীদের কিছুই পড়াতে পারবেন না। বিষয়ে আগ্রহ এলেই আসবে অভিনিবেশ। আগ্রহ এবং অভিনিবেশ তো একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। একটির অস্তিত্ব থাকলেই আর একটির অবস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ।

এখন কথা হোলো বিষয় বস্তুর প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা যাবে কি করে? আবার আগ্রহ জাগিয়ে তোলার সাথে সাথে যে অভিনিবেশ এলো বিষয়-বস্তুর চারদিক জুড়ে, তাকে জিইয়েই বা রাখা যাবে কি করে? আগ্রহ এবং অভিনিবেশ এমনি জিনিস যে সে মুহূর্তের মধ্যে বদল করে বিষয়বস্তু। এ যেন মেঘলাদিনের আলোছায়ার লুকোচুরী খেলা। এই আছে সে অভিনিবেশ বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে, এই নেই সেখানে; সে হারিয়ে গেছে অবাঙ্-মানসের রহস্যলোকে!

ইতিহাসের বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলার কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবনের জন্যে দেশ বিদেশের অভিজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষকদের চেষ্টার বিরাম নেই। অব্যাহত গতিতে চলছে নানা ধরনের গবেষণা, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা নিরন্তর এই নিয়ে। এ বিষয়ে তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে যে পাঠ্য-বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সঞ্চারের ব্যাপারে তাদের বয়েসের সীমা বিবেচনা করতে হবে। বিভিন্ন বয়েসের শিক্ষার্থীদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বন করার যুক্তি তাঁরা দিয়েছেন। সে যুক্তি মনোবিজ্ঞান-সম্মত। তাঁরা বলেন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মন গল্প পাগল, গল্পের ঘটনা পারম্পর্য্যের রসাস্বাদনে মশগুল্ তাদের মন ঘটনার স্রোতে ভেসে চলে কল্পনার ভেলায় চড়ে, তাই দিয়েই সে পাড়ি দেয় সাত সমুদ্দুর তের নদী। শিশুমন কল্পনায় ভরা। কল্পনা রমন্তিক (romantic)। সেই রমন্তিকতার রসে গল্প জমে। ইতিহাসের শিক্ষককে এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

কিশোর বা অতিক্রান্ত-কৈশোরের শিক্ষার্থীরা অবশ্য নিছক ঘটনার সংঘাতে যে গল্প জমে তার আমেজে মশ্‌গুল হয় না। তাদের মন কিছু কিছু কার্য্যকারণ খুঁজবে। আপাতদৃষ্টিতে তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে তাদের আগ্রহ জাগানো কঠিন বলে মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। একটু অনুসন্ধান করলেই উপায় খুঁজে বের করা যাবে! তাদের মনে থাকে অতীতের সম্বন্ধে একটা উন্মুখ কৌতূহল, অদম্য। তাদের বংশের অতীত, তাদের গ্রামের অতীত, তাদের জন্মভুমির অতীত, এ সবের উপরেই থাকে তাদের কৌতূহল। অতীত রহস্যময়। রহস্যের অবগুণ্ঠন সরিয়ে প্রকৃতকে জানবার যে এই স্পৃহা আর ঔৎসুক্য, একে কাজে লাগাতে হবে। এদের থেকেও যে শিক্ষার্থীরা বয়েসে বড়ো যাদের মধ্যে জেগেছে বিশ্লেষণী শক্তি, অনুসন্ধিৎসা, চিন্তাশীল-অনুশীলন-ক্ষমতা আর বাস্তবতা-বোধ তাদের বেলায় ইতিহাসের বিষয় বস্তুকে বাস্তবের সাথে সংযুক্ত করে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের মনে। বিশ্লেষণ করবার,

বিচার করবার, বর্ত্তমানের সাথে তুলনা করবার, অবকাশ থাকলে তাদের মনে বিষয়-বস্তুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করাটা খুব শক্ত হবে না।

বিষয়-বস্তুর প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলে সেই জাগ্রত আগ্রহকে জিইয়ে রাখাটা আর একটি সমস্যা। যে শিক্ষক বিদ্যার্থীর মনে আগ্রহ জাগিয়ে তোলবার কোনো সার্থক চেষ্টা করেন না এবং আগ্রহ জাগিয়ে তুলে তাকে জিইয়ে রাখতে পারেন না, সত্যি কথা বলতে কি তিনি শিক্ষকের কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হন। বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা আর তা জিইয়ে রাখা কিন্তু এক জিনিস নয়।

মানব মনের অগম্য তীরে যে খামখেয়ালী, সৃষ্টি ছাড়া, মানুষটি বাস করে তার অন্ত পাওয়া দায়। বস্তুতঃ শ্রেণীকক্ষে পড়াবার সময় কি করে শিক্ষক মশায় বুঝবেন (আমরা সাধারণতঃ যে পদ্ধতিতে পড়াই সেই কথা ভেবেই বলছি) যে শিক্ষার্থীদের বিষয়-বস্তুতে মনঃসংযোগ আছে, অভিনিবেশ আছে? চক্‌চকে চোখমুখ আর ঘাড় নাড়ার বহর দেখে বোঝা কষ্টকর খুব সেটা। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে এই যে বিদ্যার্থীদের পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাটা জাগ্রত আগ্রহকে জিইয়ে রাখার একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। শিক্ষার্থী যখনই নিষ্ক্রিয় হয়, যখনই তার শুধু শোনার পালা পড়ে, করার কিছু থাকে না, তখনই তার মনঃসংযোগ, অভিনিবেশ, দ্রুতগতিতে কর্পূরের মত উবে যায়। আর অভিনিবেশ কখন যে চলে গিয়েছে শিক্ষক মশায়ের তা জানতেও কষ্ট হয়, কিম্বা আদৌ তা তিনি জানতে পারেন না। শিক্ষকমশায় শ্রেণীকক্ষে পড়াচ্ছেন, তিনি একটানা বলে চলেছেন; বিদ্যার্থীদের শুধু শোনার পালা। তারা হয়তো ঘাড় নেড়ে, চোখমুখের ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ কচ্ছে তাদের ঔৎসুক্য, ভাললাগা, বুঝতে পারার সঙ্কেত; কিন্তু সেটা হতে পারে একান্ত বাহ্যিক। যখন সে ঘাড় নাড়ছে তখন হয়তো মন তার উধাও হয়েছে অন্যরাজ্যে, ইতিহাসের বিষয়বস্তু থেকে অনেক দূরে; সেখানে গিয়ে মহারাজ অশোকের ধর্ম্মপ্রচার কোনো দাগই ফেলতে পারছে না তার মনে। তাই পাঠে বিদ্যার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক এবং এর মাধ্যমেই আগ্রহকে এবং অভিনিবেশকে জিইয়ে রাখা যায়।

আবার পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিরঙ্কুশ সাফল্যে ভরে উঠে যদি তারা হাতে কলমে কাজ করতে পায়; পাঠ্য-বিষয়-বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলি চোখের সামনে চাক্ষুষ দেখতে পায়, তাদের হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পায়। এগুলির মাধ্যমে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে

একটি বাস্তব-বোধ জাগে, পাঠের বিষয়-বস্তুর সাথে তাদের সক্রিয় সংযুক্তি সংসাধিত হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে "অঙ্কের শিক্ষকের আছে ফরমূলা, কেমিস্ট্রির এসিড, বায়োলজির বোতলভরা নানা নিদর্শন, আর ভূগোলের মানচিত্র"। এগুলি উক্ত বিষয়গুলির পঠন-পাঠনে বিদ্যার্থীদের সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করতে বেশ কিছু সাহায্য করে, এবং শ্রেণীকক্ষে দৈনন্দিন পাঠদানে বা শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিদ্যার্থীদের সাথে পাঠ্যবিষয়-বস্তুগুলির ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধনে প্রচুর সম্ভাবনা এনে দেয়। কিন্তু ইতিহাসের বেলায়?

ইতিহাসের বেলায় অনুরূপ জিনিস না থাকলেও ইতিহাস শিক্ষকের এই ব্যাপারে অনেক করণীয় আছে, তাই দায়িত্বও আছে অনেক। একটু চিন্তা করলেই তিনি দেখতে পাবেন যে তাঁর সাহায্যার্থেও বহু জিনিস আছে যা দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীর মনে পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে বাস্তব বোধ জাগিয়ে তুলতে পারেন, পাঠ্যবিষয়-বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর সক্রিয় সংযোগ সাধন করতে পারেন। যে শিক্ষক ইতিহাসের সার্থক পাঠ দেবেন তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, যে অতীত সম্বন্ধে তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠ দিচ্ছেন সেই অতীতকে বিদ্যার্থীর মনের মণি-কোঠায় স্থাপন করতে হবে। যে শিক্ষার্থী একটু বড় হয়েছে, যার হয়েছে যুক্তির, অনুসন্ধিৎসার, বিকাশ তার মনে জ্বালাতে হবে সন্ধানী আলো। সেই আলোতে অতীতের আধ-আলো আধ-আঁধারের রহস্যাবগুণ্ঠন যাবে সরে। আর যে বিদ্যার্থীর মন কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে তেপান্তরের মাঠ পার হয়, কল্পনার পক্ষি-রাজরথে চড়িয়ে তাকে যে অতীত সম্বন্ধে পড়া হচ্ছে তার অন্দর-মহলে নিয়ে যেতে হবে। বস্তুতঃ ইতিহাস-পাঠে এই কল্পনাটুকুর সাহায্য নিতেই হবে,—তা সে যে ধরনের, যে বয়েসের বিদ্যার্থী হোক না কেন। বিদ্যার্থীর মনে এই ধারণা জাগিয়ে তুলতে হবে যে, যে অতীতের সম্বন্ধে সে পড়ছে সেখানে যেন সে হাজির হয়েছে। তখনকার যুগের দৈনন্দিন জীবনে যে ঘটনা মানুষের মনে দোলা লাগিয়েছে, যে রাজারা রাজ্য শাসন করেছে, যে কবি কাব্য সৃষ্টি করেছে, যে পটুয়া লীলায়িত তুলিকায় ছবি এঁকেছে, যে ভাস্কর গড়েছে অনবদ্য ভঙ্গিমার মূর্ত্তি, যে কৃষক মাটির বুক থেকে স্নেহধারা আহরণ করে দেশকে করেছে শস্যশ্যামলা,—এ সবই তার কাছে জীবন্ত, সে তাদেরি একজন।

বিদ্যার্থী যে অতীত সম্বন্ধে পড়ছে সেই অতীতের মধ্যে একাত্ম করে একান্ত করে তাকে স্থাপন করতে গেলে দৃষ্টি দিতে হবে শ্রেণী কক্ষের পরিবেশ রচনায়, অধীতব্য বিষয়বস্তুর ঘটনাগুলির সামগ্রিক বিন্যাসে। তাই পাঠ্য-বিষয়-বস্তুর সাথে সংহতি বজায় রেখে সংগ্রহ করতে হবে সেই কালে ব্যবহৃত মুদ্রা, সাজসজ্জা,

সমরোপকরণ, ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, তীর-ধনুক মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিচয়। বিদ্যার্থীদের নিয়ে যেতে হবে প্রাচীন স্থানগুলিতে যাদের ঐতিহ্য আছে, আছে ঐতিহাসিক স্মৃতি ; নিয়ে যেতে হবে জাদুঘরে, বা তথ্য সমৃদ্ধ সংগ্রহশালায়, পুরাণ মন্দির প্রাঙ্গনে, গির্জ্জায়, মসজিদে, দুর্গে, বন্দরে। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে জমাতে হবে তর্কের আসর, লিখতে হবে নাটক। অভিনয় কর্ত্তে হবে সেই নাটকের। স্ব-স্ব ডায়েরী লিখতে হবে, লিখতে হবে প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ। দুটি প্রত্যক্ষ-দর্শীর এক বিষয়ে বিবরণ থাকলে দুটি মিলিয়ে তাদের সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতা বিচার করতে হবে ; তুলনা করতে হবে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণগুলির। এমনি আরো কতো রয়েছে ব্যবস্থা যাদের সাহায্য দৈনন্দিন পাঠদান কালে ইতিহাস-শিক্ষক নিতে পারেন।

এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে শিক্ষার্থী ইতিহাস পাঠে রসের মূল উৎসের সন্ধান পাবে। তাদের মনে আসবে তৃপ্তি, হাতে আসবে কাজ করবার শক্তি ও প্রস্তুতি। ইতিহাস পড়াটা হবে প্রকৃত এবং বিদ্যার্থী-কেন্দ্রিক। শিক্ষক-কেন্দ্রিক ইতিহাস পাঠের তিক্ততা ও গতানুগতিকতা থেকে শিক্ষার্থী বাঁচবে, ইতিহাসের হবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ; সন তারিখ, অত্যন্ত আবশ্যকীয় অধ্যায় ও শিক্ষক মশায়ের দেওয়া "নোট" কিম্বা বাজারের "শর্টকার্ট" মুখস্থ করার নিরন্তর শুষ্ক নীরসতার থেকে অব্যাহতি পাবে বিদ্যার্থী। শিক্ষার্থী বাঁচবে, আর বাঁচবেন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের ঘনঘন হাই-উঠা আর পা-নাচানোর মধ্যে অবিরাম বক্ বক্ বকে যাওয়ার হাত থেকে।

শিক্ষার্থীর সক্রিয় অভিনিবেশ প্রবুদ্ধ করতে আর প্রবুদ্ধ অভিনিবেশ জিইয়ে রাখবার জন্যে শিক্ষার্থীর মনের চেতনে অবচেতনে দল বেঁধে, একজোটে, কাজ করবার যে স্পৃহা থাকে একান্ত প্রবৃত্তিগতভাবে, তা কাজে লাগানোর সম্বন্ধে বোধহয় দ্বিমত কোনো মহলেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কুশলী এবং অভিজ্ঞ ইতিহাস—শিক্ষকমশায়ের হাতে এতো রূপকথার রাজপুত্তুরের হাতে সোনার জিয়নকাঠি। এর স্পর্শে বন্দিনী রাজকন্যের মোহনিদ্রা টুটবেই। এতে শিক্ষার্থীর অভিনিবেশ সক্রিয় থাকবেই। এই দল বেঁধে কাজ করার সম্বন্ধে কোনো কোনো মহলে কিছু ভুল ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে, তাই এখানে একথা পরিষ্কার করে বলা দরকার যে এই দল বেঁধে কাজ করার অর্থ এই নয় যে সেখানে ব্যক্তিতাকে ডালি দিয়ে সমষ্টির বিপুল খরস্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দিতে হবে। সেখানে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা, অক্ষমতা, সফলতা, বিফলতা, আশা, আনন্দ প্রভৃতির পর্য্যাপ্ত অবকাশ থাকবে। ব্যক্তি নিয়েই তো সমষ্টি। ব্যক্তি না থাকলে সমষ্টি

আসবে কোথা থেকে? প্রত্যেক ব্যক্তির অবদান-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, ঐক্যে সমন্বিত সমষ্টিই তো প্রকৃত সমষ্টি। কোনো বিশেষ কাজের সামগ্রিক রূপায়ণে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যক্তির স্ব স্ব অবদান গ্রহণ করে তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে। নিপুণ মালাকার যেমন একটি একটি পুষ্পকে গ্রথিত করে মালিকার সমন্বিত সৌন্দর্যে,—সেখানে প্রতিটি ব্যষ্টি-পুষ্প স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে যেমন সুন্দর, তেমনি মালিকার সামগ্রিক সমন্বিত সৌন্দর্য্যও অভিনব। ইতিহাসের শিক্ষককে তাই শিক্ষার্থীদের দল বেঁধে, একজোটে কাজ করবার স্পৃহা জাগিয়ে তাদের যেমন সমষ্টিগতভাবে কাজ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, তেমনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, তার ব্যক্তিতা, আর নিজস্ব অভিব্যক্তি,—এসবের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া এতে সমবায়ের মাধ্যমে কাজ করবার পদ্ধতি বিদ্যার্থীরা শিখবে। সমাজে রেষারিষির স্থান নেই, সেখানে চাই সমবায়, প্রতিযোগিতার বদলে চাই সহযোগিতা। যে শিক্ষার্থীরা আগামী-কালের নাগরিক, আগামীকালের সমাজ যারা গড়বে, ছেলেবেলা থেকেই তারা এই সহযোগিতা শিখবে, অভ্যাস করবে।

আমাদের ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে এই দল বেঁধে একজোটে কাজ করবার জন্যে কি ধরনের কাজ দেওয়া যেতে পারে? "মডেল" তৈরী করা অনুরূপ একটি কাজ বলে পরিগণিত হতে পারে। কোনো বড়ো সহরের বা কোনো দুর্গের মডেল তৈরী দল বেঁধে করতে দিতে পারা যায়। বহু প্রাচীন কাল থেকে মানুষের যান বাহনের ক্রমবিবর্ত্তন, বা তার আবাসের, চাষবাসের, অস্ত্রশস্ত্রের ক্রম-বিবর্ত্তন মডেলের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। বিভিন্ন দেশের জ্ঞাতব্য তথ্যের তুলনামূলক উপস্থাপন "লেখ" প্রভৃতির সাহায্যে করতে দিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য যে যদি প্রয়োজন হয় একটি শ্রেণীর ছাত্রদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে তাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। কোনো নাটক অভিনয় করা। সম্ভব হলে শিক্ষকমশায়ের তত্ত্বাবধানে নাটক রচনা করা এবং তার সাজপোষাক, মঞ্চ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি নিজেরাই করে নাটকটি মঞ্চস্থ করা। তর্কের আসর করা এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আলোচনা করা; বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের নানা ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলি আমাদের দেশের সেই যুগের অনুরূপ সমস্যাসমূহের সাথে তুলনা করা। নানা ধরনের আলোচনা সভার আয়োজন করা এবং সুনিয়ন্ত্রিত ও দলবদ্ধভাবে সেই সব আলোচনায় যোগদান করা। এই সব ধরনের কাজ দল বেঁধে করার জন্যে দিতে পারা যায়।

পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা, অভিনিবেশ আনা আর পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করে তাকে জিইয়ে রাখা ছাড়াও আরও দু-একটি বিষয় আছে যেগুলি শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনকালে যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় মূলনীতি হিসেবে মনে রাখার প্রয়োজন হবে। শিক্ষার্থী বালকই হোক, কিশোরই হোক বা অতিক্রান্ত-কৈশোরই হোক ইতিহাস পাঠের সময় কিছু কল্পনার আশ্রয় নিতেই হবে। কিছুটা কল্পনা তো ইতিহাসের সার্থক পাঠে সঞ্জীবনী মন্ত্র, এর অভাবে ইতিহাস পাঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কল্পনার আশ্রয় নিয়ে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীরা যদি পাঠ্যবিষয় বস্তুর আধার স্বরূপ অতীতে নিজেদের একান্তভাবে না নিয়ে যেতে পারেন,—ঐ অতীতটুকুর সাথে একাত্মবোধ না করতে পারেন তবে ইতিহাস পাঠ ব্যর্থ হবে, ইতিহাসের যথাযথ ব্যঞ্জনা হবে সুদূরপরাহত। কিন্তু, কথায় বার্ত্তায়, আলাপ আলোচনায়, খেলায় ধূলায়, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে, আহারে বিহারে, জীবনের সামগ্রিক পরিবেশে ও সক্রিয়-অনুভূতিতে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে জীবন্ত বর্ত্তমান একান্ত প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সাথে। সেইটাই বাস্তব। সেই প্রতিমুহূর্ত্তের বাস্তব-বর্ত্তমান থেকে শিক্ষার্থীর মনকে ছিনিয়ে অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুধু দুরূহই নয় প্রায় অসম্ভব ব্যপার। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষককে তবু করতে হবে তা। তা নইলে ইতিহাস পাঠ হবে প্রাণহীন, নীরস, অসার।

ইতিহাসের শিক্ষক এই অসাধ্য সাধন করবেন কি করে সেইটাই দেখতে হবে। সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে ইতিহাস পড়ানোর সময় বিষয়-বস্তুটিকে সরস ও প্রাঞ্জল করে, নানা ধরনের “teaching aids” এর মাধ্যমে, একান্ত জীবন্ত করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। যে সময়কার ইতিহাস পড়া হচ্ছে সেই সময় সাধারণ লোক কিভাবে বসবাস করতো, কিভাবে তারা জীবিকা অর্জ্জন করতো,—মোট কথা সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার একটি নিখুঁত চিত্র বিদ্যার্থীদের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। এতে সমসাময়িক বিবরণী, পুরাণো মুদ্রা, পুরাণো পুঁথি, প্রাচীনকালের অলঙ্কার তৈজস-পত্র প্রভৃতি উপকরণের সাহায্য নিলে চিত্রটি আরও জীবন্ত হয়ে উঠে। এতে কল্পনার উদ্দীপন হয়। এছাড়া ইতিহাসের শিক্ষক আর একটি কাজ করতে পারেন। তিনি বর্ত্তমানের পটভূমিকায় অতীতের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। অতীতকে আনবেন বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে। বর্ত্তমানকে কেন্দ্র করে, বর্ত্তমানকে অবলম্বন করে, আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে সেই অতীতের দিকে যে অতীত পাঠ্য। জানা থেকে অজানা, নিকট থেকে দূর, পরিচিতের মাধ্যমে

পরিচয়,—এতো পড়ানোর গোড়ার কথা। অতীতকে গাঁথতে হবে বর্ত্তমানের সাথে। অতীত ও বর্ত্তমানের সব পরিচয় সূত্রগুলি অবান্তর হ'লেও শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য সূত্র কটি অতীত ও বর্ত্তমানের সম্পর্ক বিশ্লেষণে প্রাসঙ্গিক ভাবেই তার চোখের সামনে ধরে দেওয়া যেতে পারে। বর্ত্তমানের ও অতীতের সমধর্ম্মী ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখে, উভয় কালের অনুরূপ অবস্থার বিশ্লেষণে, অতীতের সাথে বর্ত্তমানের সহজ সংযোগ সাধন করা যায়। অতীত কালের মানুষ যে আমাদের মতই সুখদুঃখ, হাসিকান্নায়, আশা নিরাশায়, ভয় ভাবনায় দিন কাটাতো এটি সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর মনে উপলব্ধি হলে অতীতের সাথে তার একাত্মতা সহজ হয়।

উপরে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখিত এই কথাগুলি,—এগুলিকে মূলনীতি বা যে কোনো নামেই বিশেষিত করা যাক না কেন,—মনে থাকলে ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে আমরা যে কোনো পদ্ধতিই অবলম্বন করি না কেন, পঠন-পাঠনটি সাধারণভাবে সার্থক হয়ে উঠবে। এর পর পদ্ধতি সম্বন্ধে দুচার কথা আলোচনা করা যাক। কিন্তু পদ্ধতির শুরুতে এবং এই মূলনীতি প্রসঙ্গের উপসংহারে আমরা আর একটা কথা যোগ করতে চাই। সেটি ইতিহাস পড়ানোর মূলনীতির শেষ কথা আর পদ্ধতির গোড়ার কথা। সে কথাটি আর কিছুই নয় সেটি হচ্ছে "শিক্ষক"। শিক্ষক-মশায়ের ব্যক্তিত্ব সব মূলনীতির চূড়ান্ত কথা আর পদ্ধতির মূলকথা। যা কিছুই করুন, যতো আধুনিক পদ্ধতিই অনুসরণ করুন, যত রকমেরই teaching aids ব্যবহার করুন আপনার নিজের ব্যক্তিত্ব, আর অবদান ছাড়া কিছুই সার্থক হবে না। সব জিনিসের সাথে তাই আপনি নিজেকে যোগ করে নেবেন।

পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষক-নির্দিষ্ট এবং পরিকল্পিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া যার ফলে শ্রেণীকক্ষে পঠনপাঠনের মাধ্যমে কোনো বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা সহজ এবং সম্ভব হয়ে উঠে। পদ্ধতি তাই প্রায়ই "সফল পঠন-পাঠন" বা "পঠন-পাঠন থেকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভ" এই ব্যাপারটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্ক-যুক্ত। পদ্ধতি তাই পড়ানোর পদ্ধতি, পড়িয়ে শেখানোর পদ্ধতি। পদ্ধতি একটি নয়, অনেক। এটি যেহেতু একটি প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তাই এর কতকগুলি ধাপ বা স্তর আছে। এই ধাপ বা স্তরগুলি আবার কোনো একটি পদ্ধতির নিজস্ব নয় বা কেবলমাত্র একটি পদ্ধতির মধ্যেই এগুলি পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ একটি পদ্ধতির কতকগুলি ধাপ বা স্তর অন্য একটি পৃথক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হতে পারে অনায়াসেই। আর এই বিভিন্ন ধাপগুলির সুষ্ঠু বিন্যাস সাধন করে কার্য্যকরী করে তুলে প্রক্রিয়াটির সামগ্রিক প্রভাব শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে যাতে

করে সহায়ক হয়ে উঠে সেই ব্যবস্থাই শিক্ষকমশায় করে থাকেন। সার্থক পঠন-পাঠন তাই নির্ভর করে একদিকে যেমন সুষ্ঠু ও যথাযথ-পদ্ধতির প্রয়োগের উপর তেমনি সেটি সফল হয়ে উঠে পদ্ধতিটির যথাযথ ও সুষ্ঠু প্রয়োগে। তাই জ্ঞানগরিমার অহমিকা আর পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্যের সাথে যথাযথ পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। অনেক মহাপণ্ডিত তাই কুশলী শিক্ষক হতে পারেন না।

কোনো কোনো মহলে পদ্ধতির গুরুত্ব ও উপযোগিতা স্বীকার করা হয় না। সেখানে এই ধারণা পোষণ করা হয় যে পদ্ধতির কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। পদ্ধতির কাজ দেখতে পাওয়া যায় শিক্ষকের মাধ্যমে, এর প্রয়োগ দেখা যায় শিক্ষার্থীদের উপর তাদের জ্ঞানলাভে প্রকৃষ্টভাবে সাহায্য করবার জন্যে। তাই যদি হয় তাহলে পদ্ধতির পৃথক অস্তিত্ব থাকবে কোথা থেকে ? একথা আমরা অতি অবশ্য স্বীকার করবো যে ইতিহাস ছাড়া ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি হতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ইতিহাস হতে স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব পদ্ধতির নেই। ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি হচ্ছে ইতিহাস পড়ানোর বিশেষ একটি ভঙ্গি, বিশেষ একটি ধারা। তাই এটিকে আমরা নিরূপণ করতে পারি, বিশ্লেষণ করতে পারি আর উন্নতও করতে পারি।

আবার কোন কোন মহলে পদ্ধতির উপর এতো বেশী জোর দেওয়া হয়ে থাকে যে সেখানে বিষয়কে বাদ দিয়ে পদ্ধতিকেই সবকিছু বলে চালাতে চেষ্টা করা হয়। যাঁরা এইমত পোষণ করেন তাঁদের একজন বলেছেন যে সঙ্গীত না জেনেই তিনি সঙ্গীত-শিক্ষার্থীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছেন। এটি অবশ্য চরম মতবাদ। সঙ্গীত না জেনে সঙ্গীত শেখানো, ইতিহাস না জেনে ইতিহাস শেখানো, কেমন করে বাস্তবিক সম্ভব তা বুঝে উঠা কষ্টকর।

আসল সত্যটি অবশ্য দুটি চূড়ান্ত মতবাদের মাঝামাঝি। বিষয়-জ্ঞান ছাড়া পদ্ধতি বিশেষ কোনো কাজে আসে না, আবার পদ্ধতি ছাড়া শুধু বিষয়-জ্ঞান পঠন-পাঠনে সাফল্য আনতে পারে না। তাই বিষয়-জ্ঞানও থাকবে আর যথাযথ পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ ক্ষমতাও থাকবে ইতিহাস শিক্ষকের।

পদ্ধতির সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ ঘোরালো আর জমকালো না করে সেটা যথাসম্ভব সাদামাঠা কথার মধ্যে আর সংক্ষিপ্ত আকারে সীমাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টাই ভালো। অন্ততঃ সেটাই আমাদের প্রসঙ্গ হিসেবে যুক্তিযুক্ত। পঠন-পাঠন (teaching) এই কথাটির মধ্যে এমন একটি ধারণা আবৃত রয়েছে যার থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এর মাধ্যমে কতকগুলি বিষয়, ভাব,

অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সাঙ্গীকরণ করবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে ; এবং এই জন্যেই আর একটি জিনিস বেশ সহজ এবং সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে এই সাঙ্গীকরণের যে ব্যবস্থা তার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন অপ্রচ্ছন্নভাবে থাকে নির্দেশ, পথপ্রদর্শন। বস্তুতঃ স্কুলের অবস্থিতি, শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের আবশ্যকতা এসবই একান্তভাবে মিশে রয়েছে এই নির্দেশ, পথ প্রদর্শন বা পরিচালনার (Guidance এর) ধারণার সাথে। এখন কথা হচ্ছে যে এই নির্দেশ, পথ প্রদর্শন বা পরিচালনা, শিক্ষার্থীকে কি করে, কি কি উপায়ে, কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে ? এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই আছে পদ্ধতির মূলকথা। শিক্ষা-বিজ্ঞানের নানা অভিজ্ঞতার কথা ছেড়ে দিন। খুব সহজ কথা ধরুন। আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করুন। আপনি একটি ছোটো ছেলেকে বা মেয়েকে পড়াচ্ছেন। পড়াচ্ছেন কেন ? আপনি তাকে কিছু শেখাতে চান নিশ্চয়। আপনি তাকে কি করে শেখান ? তাকে পড়াতে বসে আপনি সাধারণতঃ কি বা কি কি করেন ? মনে মনে একটু বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবেন যে আপনার এই পড়ানো কাজটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। অর্থাৎ আপনি যা যা করে থাকেন সেগুলির পৃথক পৃথক ভাবে নাম করা যেতে পারে। ধরুন আপনার ছাত্র বা ছাত্রীকে পড়াতে গিয়ে আপনাকে (১) কথা বলতে হবে, যা পড়াচ্ছেন তা (২) পাঠ্যপুস্তক থেকে কখনো পড়তে হবে, কখনো বা (৩) লিখতে হবে, কখনো (৪) ছবি বা কোনো প্রতীক চিহ্ন এঁকে বা লিখে বিষয়টি তার কাছে সহজবোধ্য করতে চেষ্টা করবেন, কখনো বা (৫) হাত নাড়ছেন কি চোখ মুখের কিছু ভঙ্গি করছেন, (৬) কখনো কি রকম করে পড়তে হবে বা লিখতে হবে বা অঙ্ক কষতে হবে আপনি সেটি নিজে করে দেখিয়ে দিচ্ছেন, কখনো বা (৭) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কচ্ছেন ; আর এসব কাজগুলি মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর অধ্যয়নকে আপনি (৮) পরিচালনা (guide) কচ্ছেন।

এইগুলিই তো পঠন-পাঠন সার্থক করবার জন্যে অনুসৃত পদ্ধতিগুলির মূল-ভিত্তি। এইগুলিকে কেন্দ্র করেই তো আজকের এই নানা রকমের পদ্ধতিগুলি গড়ে উঠেছে। মানুষ যতো অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে, শিক্ষা বিজ্ঞানের যতো উন্নতি হয়েছে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার এই মূল ভিত্তিগুলিও পরিমার্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও সুসমন্বিত হয়েছে। একদিক থেকে বলা যায় যে নতুন বিশেষ কিছুই আবিষ্কৃত হয়নি পুরানো অভিজ্ঞতাগুলিই নতুন অভিজ্ঞতার সংযোজনে অধিকতর উপযোগী, কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সার্থক উপায় হিসেবে প্রয়োগ করা

হচ্ছে। আর এই সার্থক উপায়গুলি স্থির করা হচ্ছে বিরামহীন নানা গবেষণা, চিন্তা, অনুশীলন বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রয়োগ, মূল্যায়ন প্রভৃতির সূত্র ধরে। কাজে কাজেই এ পদ্ধতিগুলি যে আমাদের কাছে একেবারে না-জানা, জটিল বা দুর্বোধ্য এমন ধারণা করবার কোনো কারণ নেই। আপনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা দিয়ে যে ভাবে, যে ভঙ্গিতে, যে জিনিসের সাহায্য নিয়ে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন সফল করে তোলেন সেইটিই সফল পদ্ধতি। তবে সেটি প্রয়োগসিদ্ধ হওয়া চাই। আর এমনিভাবে যে পদ্ধতিটি আপনি কার্য্যকরী বলে প্রমাণ পেলেন তার মধ্যে অনুসৃত স্তরগুলির বা কাজগুলির বিশ্লেষণ করুন, বিন্যাস করুন দেখবেন সেটি একটি সুবিন্যস্ত পদ্ধতি। আজকাল আমরা যে সমস্ত জনপ্রিয় ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা শুনে থাকি সেগুলি তো সার্থক পঠন-পাঠনের ভিত্তি-গুলির সংমিশ্রণ-সমন্বয়-জাত সংস্কৃত রূপ। আর এই পদ্ধতিগুলি পাঠের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মনীষা ও মান, পাঠে ব্যবহৃত সাজসরঞ্জাম, শিক্ষকমশায়ের যোগ্যতা, সামাজিক পরিবেশ, বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচন, বিন্যাস ও তার প্রকৃতির উপর একান্ত-ভাবেই নির্ভরশীল। এগুলির প্রত্যেকটিই পদ্ধতির উপর অনস্বীকার্য্য প্রভাব বিস্তার করে যে কোনো পদ্ধতির বর্ত্তমান রূপটি চিত্রিত করেছে।

পদ্ধতির আলোচনা বিশ্লেষণাত্মক হওয়ার পক্ষে বাধা আছে। এ আলোচনার অধিকাংশই বর্ণনাত্মক। বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে পদ্ধতিগুলির শ্রেণী ভাগ করার প্রচেষ্টা নির্ভুল হয় না। কারণ যথাযথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কতকগুলি স্তর বা ক্রিয়া অনেক পদ্ধতির মধ্যেই বিদ্যমান! পদ্ধতিগুলির সাঙ্কর্য্য তাই অনস্বীকার্য্য। বস্তুতঃ পদ্ধতিগুলির পৃথক শ্রেণী বিভাগ সন্তোষ জনক ভাবে করা মুস্কিল। কেউ কেউ কতকগুলি সুসামঞ্জস এবং অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত ভিত্তির উপর নির্ভর করে নিম্নলিখিতভাবে পদ্ধতিগুলির ভাগ করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য এ বিভাগও নিখুঁত নয়।

পদ্ধতির শ্রেণী বিভাগ :—

(১) যে পদ্ধতিগুলি শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে,—যেমন, পাঠ্যপুস্তক-পদ্ধতি ; গ্রন্থাগার-পদ্ধতি ; বীক্ষণাগার-পদ্ধতি প্রভৃতি।

(২) সামাজিক পরিবেশের বাস্তবতা ভিত্তিক-পদ্ধতি,—যেমন, শিক্ষাভ্রমণ, "ক্যাম্প", নিদর্শন সংগ্রহ, মৌখিক বর্ণনা প্রভৃতি।

(৩) পাঠ্যক্রমান্তর্গত বিষয়-বস্তুগুলির বিন্যাস-ভিত্তিক,—যেমন, সময়ানুগ (chronolcgical) বিন্যাস, মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক বিন্যাস, topical, develop-

mental, অনুবন্ধ (correlation), integration, fusion, units প্রভৃতি।

(৪) শিক্ষকমশায়ের উদ্দেশ্য সাধনমূলক,—যথা, ব্যাখ্যামূলক, স্বাদনা (appreciation) drill, diagnostic, developmental প্রভৃতি।

(৫) শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য-সাধন ভিত্তিক,—যথা, সমস্যা (Problem), "প্রোজেক্ট" প্রভৃতি।

(৬) শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক ভিত্তিক,—যথা, assigned lesson, supervised study, freely chosen project প্রভৃতি।

(৭) শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ভিত্তিক,—যথা, individual activity, committee activity, class activity, co-operative activity প্রভৃতি।

(৮) পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণকে কেন্দ্র করে যে পদ্ধতিগুলি গড়ে উঠেছে, যথা, occasional participation by pupils, systematic participation, pupil planned activity (Problem, Project) ইত্যাদি।

(৯) পঠনপাঠনে চিন্তার স্বাধীনতার তারতম্যকে কেন্দ্র করে যে পদ্ধতি গড়ে উঠেছে, যথা, authoritarian, tentative conclusion, heuristic-apparent freedom but predetermined conclusion, experimental প্রভৃতি।

(১০) বিদ্যার্থীদের জ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ ও সংশোধন করাকে ভিত্তি করে যে পদ্ধতিগুলি গড়ে উঠেছে,—যেমন oral recitation, written reports written tests, প্রভৃতি।

(১১) ইন্দ্রিয় জ্ঞান ভিত্তিক,—যেমন, visual, auditory, motor.

পদ্ধতির এই শ্রেণী বিভাগ থেকে অতি সহজেই লক্ষ করা যাবে যে, যে কোনো পদ্ধতিই একান্তভাবে অন্য পদ্ধতির প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হতে পারে না। একটি অন্যটির সাথে সংশ্লিষ্ট। একটির কিছু কিছু কলা-কৌশল অন্যটির মধ্যেও গৃহীত। পদ্ধতির শ্রেণী বিভাগ নিখুঁত ভাবে করা দুরূহ।

এখন বিবেচ্য যে কি ধরনের পদ্ধতি ঠিক ভাল বলা চলে। এ বিবেচনা করতে হলে পদ্ধতির প্রকৃতির উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। কারণ একটি পদ্ধতির অনুসৃত কলাকৌশলের সামগ্রিক রূপটির বিচার করে অন্যটির সাথে

তুলনা করা চলে না। পদ্ধতিতে অনুসৃত কলাকৌশলগুলি স্থান, কাল, পাত্র, শিক্ষক মশায়ের যোগ্যতা অনুসারে আপেক্ষিক দোষগুণ ও ভালো মন্দ সংশ্লিষ্ট। তাই সেই দিকে আমাদের আলোচনার গতি না ফিরিয়ে ভালো পদ্ধতির প্রকৃতি বা লক্ষণ কি হবে তাই পর্য্যালোচনা করাই বোধ হয় বিধেয় হবে।

পদ্ধতিটি নিখুঁত নির্ভুল হবে। উদ্দেশ্য সাধনে যতখানি দরদ ও আন্তরিকতা থাকা উচিৎ তা থাকবে তার মধ্যে। এ কথার অর্থ এই যে শিক্ষকও শিক্ষার্থী আন্তরিকতার সাথে এটি অনুসরণ করবেন। পদ্ধতি হবে কলাকৌশলের সুষ্ঠুতায় সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী অথচ উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োগ-সিদ্ধ। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়ের সীমা-স্থান পরিস্ফুট থাকবে পদ্ধতির সর্ব্বস্তরে যাতে করে অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত বিষয়ের ভিড়ে পঠন-পাঠন ভারাক্রান্ত ও নীরস না হয়ে পড়ে। পদ্ধতি এমনি হবে যে পদ্ধতি যিনি প্রয়োগ করছেন তার সাথে সহজে পদ্ধতির যেন একাত্মতা গড়ে উঠে। এটি যেন কৃত্রিম না হয় কোন ক্রমেই, সহজ সাবলিল ভঙ্গিতে শিক্ষক মশায়ের অভিজ্ঞতা থেকে সেটি হবে স্বাভাবিক ভাবেই নিঃসৃত। পদ্ধতি হবে বাস্তবের সাথে সংশ্লিষ্ট। অবাস্তব হলে পদ্ধতি হবে বিফল। পদ্ধতির সম্বন্ধে শেষ কথা অনেকে বলে থাকেন যে এটি তো একটি নির্দ্দিষ্ট কাজ নয় যে এটীকে কোনো রকমে সম্পাদন করতে পারলেই অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এটি হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া (Process)। এটি বিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠে। ধাপে ধাপে গড়ে-উঠা এর ধীর-সঞ্চারী প্রভাব শিক্ষকও শিক্ষার্থীকে সমাচ্ছন্ন করে। দুর্দ্দাম জীবনী-শক্তির ক্রমিক বিকাশে এর রূপায়ণে ফুটে উঠে অভিনবত্ব। একে সহজে বর্ণনার গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না। এর ধীর-সঞ্চারী যুক্তি-সিদ্ধ প্রভাব উপলব্ধি করা যায় মাত্র।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে সাধারণতঃ যে পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করার রেওয়াজ আছে তাদের মধ্যে যেগুলি অধিক প্রচলিত সেগুলির সম্বন্ধে দু এক কথা আলোচনা করে আমরা এই প্রসঙ্গের শেষ করবো।

মৌখিক পদ্ধতি (Oral method)

শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই অধিকাংশ স্কুলে মৌখিক পাঠদান-পদ্ধতি অনেকখানি অংশ জুড়ে বসে আছে। মৌখিক পাঠদান বলতে বক্তৃতা বুঝায় না কিন্তু। বক্তৃতা প্রাথমিক স্কুলে তো নয়ই এমন কি মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যার্থীদের বেলায় ও চলে না। কারণ বক্তৃতায় বিদ্যার্থীরা নিষ্ক্রিয় থাকে। নিষ্ক্রিয় হলেই মন তাদের অতি সহজেই উধাও হয় অন্য

রাজ্যে শিক্ষক মশায় তা বুঝতেও পারেন না। স্কুলের ছাত্রদের মন অপরিণত। তাদের মনের কাঠামোয় বক্তৃতা খাপ খায় না। বক্তৃতা শুনে তা বিশ্লেষণ করে ভাগ করে সাজিয়ে, বক্তৃতার মধ্যে আবৃত তথ্যগুলিকে আহরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই অভিভাবক বলুন, স্কুলের পরিচালক বলুন, প্রধান শিক্ষক বলুন, কি আপনার ছাত্ররাই বলুন বক্তৃতা কেউ পছন্দ করে না। তাছাড়া কজন শিক্ষক যথাযথ বক্তৃতা দিতে পারেন? বক্তৃতা তৈরী করতে সময় লাগবে না? তথ্যের আহরণ সংকলন আছে, মনোজ্ঞ উপস্থাপন আছে। শিক্ষক মশায় সে রকম বক্তৃতা দিনে কটা তৈরী করতে পারেন? কিন্তু বক্তৃতা ছাড়া মৌখিক পাঠের রেওয়াজ শ্রেণীকক্ষে আছে। বিশেষ করে ইউরোপের স্কুল সমূহে। আমেরিকাতে কম। আমেরিকার অধিবাসীদের অভিমত যে ইউরোপের দেশ-গুলিতে অধিকতর নিকৃষ্ট ধরনের পাঠ্যপুস্তক আর শিক্ষক মশায়দের উৎকৃষ্ট ধরনের পেশাগত প্রস্তুতির মান শ্রেণী কক্ষে মৌখিক পদ্ধতির অবস্থিতির কারণ। নিছক বক্তৃতা ছাড়া মৌখিক পদ্ধতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও অনেকখানি। তাকে অস্বীকার করবার উপায়ও নেই। শিক্ষক মশায়কে শ্রেণী কক্ষে বলতে হয় বৈকি। কিন্তু বলার ধরন আছে। বলাটা হবে মনোজ্ঞ। একটানা, একঘেয়ে যেন না হয়ে উঠে সেটি। সেই জন্যে এই বলার সাথে অন্যান্য পদ্ধতির কিছু কিছু সম্ভব স্থলে সংমিশ্রিত করে, নানা রকমফের করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, একে অধিক-তর কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। মৌখিক পাঠের মধ্যে যদি বৈচিত্র্যের খোরাক কিছু না থাকে, না থাকে পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার ব্যবস্থা, যদি দিনের পরদিন একটানা বলাই চলে তাহলে সে হয় বক্তৃতা। তাতে শিক্ষার্থী সক্রিয় কেন কোনো অংশই গ্রহণ করে না। আর শিক্ষার্থী যদি পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে তাহলে সে পাঠ হয় ব্যর্থ, স্বাদহীন, বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দময়, একটানা বাক্যচ্ছটা। সে পরিস্থিতি অশুভই শুধু নয়, যন্ত্রণাদায়ক।

দশম একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের মনীষার বিকাশ, স্কুলে পাঠ্যপুস্তক, গ্রন্থাগার, ও অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জাম, শিক্ষক মশায়ের যোগ্যতা ও পেশাগত প্রস্তুতি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অন্যান্য সকল দিকের প্রতি লক্ষ রেখে তাদের পাঠদান কালে পৃথক ব্যবস্থা বা পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু নিম্ন শ্রেণী সমূহের বিদ্যার্থীদের জন্যে অপরাপর পদ্ধতির সাথে এই মৌখিক পদ্ধতি অনুসরণ করা চলতে পারে। মৌখিক পদ্ধতিকে ইংলণ্ডের শিক্ষকগণ সাধারণতঃ তিনটিভাগে ভাগ ক'রে থাকেন। যথা—(১) গল্পবলা, (২) প্রশ্নোত্তরের সাথে সাথে

বলা ও উপকরণাদি ব্যবহার করা, (৩) ছাত্রদের প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রস্তুতির সাথে সম্পর্ক রেখে ব্ল্যাক বোর্ডে সংক্ষিপ্তসার করা এবং বলা। এদের প্রত্যেকটির বিষয়ের পৃথক ভাবে কিছু আলোচনা করা লাভজনক হবে।

গল্পবলা : বলতে পারলে গল্প ইতিহাস পাঠে খুব ভাল। ইতিহাস পাঠে গল্প জমে। এমন কি দশম একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের কাছেও গল্পের একটি বিশেষ এবং বিস্ময়কর আবেদন আছে। যদিও সাধারণতঃ এই শ্রেণীর ছাত্রদের গল্পবলা আমরা পরিহার করে চলবো তবুও সুষ্ঠু ভাবে গল্প এদের উপযোগী করে বলতে পারলে এরা যে তার থেকে লাভবান হবেনা এমন নয়। এ বয়েসের শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের কার্য্য কারণের রহস্য সন্ধানে খানিকটা উন্মুখ, এবং মনীষার বিকাশে এদের মনের মণিকোঠায় তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানুষের প্রতিষ্ঠা প্রায় হয়ে এসেছে ; কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তথ্যের উপর ভর দিয়ে মনোজ্ঞ ভাবে গল্প বলতে পারলে সেটি বেশ ফলপ্রদ হয়। তবে এদের ইতিহাসের গল্পবলার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। গল্পের নেশায় মশগুল হয়ে যেন কোনো সময়ে না আসে অতিরঞ্জন বা তথ্যের বিকৃতি। সে রমক করে গল্পবলা শক্ত বৈকি।

ইতিহাস পাঠদানে গল্প বলা সাধারণতঃ শক্ত ; তা সে যে বয়েসের শিক্ষার্থী-দের কাছেই হোক না কেন! পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছেও কি গল্প বলা সহজ ? গল্প বলা সহজ তাঁদের পক্ষে যাঁরা ভাল গল্প বলতে পারেন। আমরা ইতিহাসের শিক্ষকেরা সবাই তো গল্প জমাতে পারি না জুত করে। যাঁদের গল্প বলা আসে না তাঁরা কি করে গল্প জমাবেন ? সেই জন্যে একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে যিনি যেটি ভাল পারেন তাঁকে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। যিনি ভাল গল্প বলতে পারেন তিনি গল্প বলবেন, যিনি ভাল আঁকতে পারেন• তিনি পঠনপাঠনে অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী আঁকার সাহায্য পুরোপুরি নেবেন, যিনি ভাল অভিনয় করতে পারেন তিনি পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে তার সাহায্য নিতে নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবেন।

বালক ও কিশোরদের কাছে গল্প খুব ভাল জমে। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত তো কোনো কথাই নেই। এরা তো গল্প পাগল। তাদের মনে কল্পনার ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। রাশ একটু আলগা করলেই হুহু করে তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে অতীতের স্বপন পুরীর মাঝে সে গিয়ে হাজির হবে। আর অভিজ্ঞ ও কুশলী শিক্ষকের পক্ষে তখন সোনার কাঠির ছোঁয়াচ দিয়ে নিদ্রিত ইতিহাস-রাজকন্যেকে জাগিয়ে তোলা কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না।

সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের মনে খানিকটা জিজ্ঞাসা জাগে। নিছক কল্পনার রঙে তাদের মনের দিগন্ত আর রঙীন থাকে না। সেখানে কিছুটা বিশ্লেষণের আগ্রহ, কিছুটা প্রকৃত তথ্য জানবার ইচ্ছা থাকে। কাজেই এখানে শিক্ষকমশায় যদি গল্পের আসর জমাতে চান তো তাঁকে গল্প বলার ভঙ্গি সেই মত ঠিক করে নিতে হবে। বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ সেই মত গল্পের মধ্যে করে নিতে হবে। কিছুটা তথ্য থাকবে সে গল্পে। তাদের মনের চাহিদা যাতে করে মেটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের মনে যেন এ ধারণা না আসে যে মাষ্টারমশায় "আষাঢ়ে গল্প" ফেঁদেছেন।

(২) প্রশ্নোত্তরের সাথে সাথে বলা....... ।

প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে মৌখিক পাঠ অবতারণা করার রীতিও আছে। গ্রীসের চিন্তানায়ক ঋষি সক্রেটিস যেভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হবার পন্থা অবলম্বন করতেন এ পদ্ধতিটি তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে অবলম্বিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুলে এবং অধিকাংশ শ্রেণীতেই এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় একটা কথা আমাদের নিশ্চয় মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে প্রশ্ন আমি যে বিষয়টি সম্বন্ধে করছি সে বিষয়টির সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের নিশ্চয় জানা আছে। যদি জানা না থাকে উত্তর তারা দেবে কি করে? ইতিহাস তো জ্ঞানাশ্রয়ী বিষয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের জানতে সাহায্য না করলে বিষয় বস্তুতে জ্ঞান তাদের আশ্‌মান্‌ থেকে আসবে না তো! কিন্তু তাহ'লে কি হয়,—অনেক সময় দেখা গেছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনে ছাত্রদের সাহায্য না করেই প্রশ্নের তোপ দেগে চলেন শিক্ষক মশায়। শিক্ষার্থীর নতুন পাঠ। বিষয় জানা নেই। অথচ প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলে দুম্‌, দুম্‌, দুম্‌। এটা ঠিক নয়। আর একটি কথা। প্রশ্ন যে শুধু শিক্ষকমশায়ই করবেন এমন নয়। ছাত্ররাও প্রশ্ন করবে।

যে প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের করা হবে সেগুলি সুনির্ব্বাচিত, সুগঠিত, স্পষ্ট, এবং অর্থপূর্ণ হওয়া দরকার। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষকমশায় এমন প্রশ্ন করলেন যেটির অর্থ নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়, তার উত্তর কি হবে সেটি তাঁর নিজের কাছেই বেশ পরিষ্কার নয়; উত্তর এলো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে; উত্তর হয়তো ঠিক হোলো না। শিক্ষকমশায় ঘাড় নাড়লেন। সে ঘাড় নাড়া একদিকে বেশ অর্থপূর্ণ। তার অর্থ হ্যাঁও হয় নাও হয়। আবার অন্য প্রশ্ন করলেন পূর্ব্ব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পেয়েই। এ অবস্থাও ভাল নয়।

(৩) মৌখিক পদ্ধতির তৃতীয়টির বিষয় কিছু আলোচনাকালে স্বতঃই একটি কথা মনে আসে। শিক্ষকমশায়ের ভূমিকা যেমন সেখানে সক্রিয় থাকবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তেমনি ছাত্রদেরও সক্রিয় করে তুলবেন। ইতিহাসের কোনো একটি বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করে শিক্ষকমশায় যখন পাঠ দেবেন তখন তিনি বলবেন, ব্যাখ্যা করবেন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের দিকে নজর রেখে; তাঁর লক্ষ্য থাকবে শিক্ষার্থীদের বিষয়-বস্তুর জ্ঞান পাকা বনেদে গেঁথে দেওয়ার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চলবে ব্লাকবোর্ডে সংক্ষিপ্ত সার। ছাত্ররা নোট বুকে এ সংক্ষিপ্ত সার টুকে নেবে। এতে তাদের কর্ম চাঞ্চল্য আসবে। শিক্ষক বিষয়-বস্তুর বর্ণনাকালে তথ্যের বিশ্লেষণের মাঝে মাঝে প্রশ্নও করবেন বিদ্যার্থীদের।

এটি অন্য দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণে কুশলী শিক্ষকের হাতে অভিনবত্বে অনুপম হয়ে উঠবার আশা রাখে। যে তিনটি মৌখিক পদ্ধতির সম্বন্ধে আলোচনা উপরে করা গেল, তাদের মধ্যে, "গল্প বলা" বাদে, একটি নিখুঁত পার্থক্যের গণ্ডি টানা যায় না। একটি আরেকটির উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। এগুলিকে একেবারে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করে, পৃথক কোনও একটির আশ্রয় নিয়ে পাঠদান করলে সে পাঠে বৈচিত্র্যের অভাব আসে। সাধারণভাবে আমরা একথা বলতে পারি যে পাঠদানের পদ্ধতিকে পৃথক পৃথক নামে অঙ্কিত করা যায় না। সেটা করলে নতুন উদ্ভাবনের পথ হবে চিরকালের জন্যে রুদ্ধ। আচার আইনের কঠোর রজ্জুতে শিক্ষকমশায়ের সৃজনী প্রতিভাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিলে পদ্ধতির ঘটবে অপঘাত মৃত্যু। শিক্ষকমশায় অবস্থা বুঝে পাঠদান সফল করবার জন্যে সংমিশ্রিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন এটাই বাঞ্ছনীয়। যেটা ভাল হয়, উপযুক্ত হয়, কার্য্যকরী হয় সেটা অনুসরণ করবার স্বাধীনতা তাঁর থাকবে বৈকি। পাঠদান যাতে নীরস, প্রাণহীন, স্বাদহীন, বর্ণগন্ধহীন না হয়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখার অবকাশ তাঁর না থাকলে অসুবিধে আছে ঢের।

যদি বক্তৃতায় পর্য্যবসিত না হয় তাহলে মৌখিক পদ্ধতির ভাণ্ডার থেকে কতকগুলি ভালো জিনিস আমরা পেতে পারি। মৌখিক পদ্ধতির মধ্যে পাঠে শিক্ষকমশায়ের ব্যক্তিতার সহৃদয় স্পর্শটি বেশ স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় ব্যক্তিতার সাথে ব্যক্তিতার সংযোগ। শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সংযোগ না ঘটলে শিক্ষা কাজটি সংসাধিত হবে কি করে? ব্যক্তিতার এই সংযোগে সান্নিধ্য প্রয়োজন। সে সান্নিধ্য নিবিড় হওয়া চাই। শিক্ষক ও ছাত্রের ভাবের আদান প্রদান, দেওয়া আর নেওয়া না হলে সান্নিধ্য নিবিড় হয় না। স্কুলগুলির ছাত্র সংখ্যা এবং

অপরাপর ব্যবস্থার কথা স্মরণ করে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে মৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমেই সে কাজটি হয়ে থাকে সব চেয়ে বেশী।

তা ছাড়া ইতিহাসের যে বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে সে সম্বন্ধে ছাত্রদের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে শিক্ষক বলবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন। আর তা না করলে ফলও ভালো হবে না। কিংবা কোনো এক বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা বা আন্দোলন যেটি সারা ইতিহাসের গতিকে দিয়েছে পাল্টে তার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে দাগ ফেলবার মতো কিছু বলা অনেক সময় যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে। ইতিহাসের পঠন-পাঠনের কোনো এক জীবন্ত মুহূর্তে কোনো এক জটিল সমস্যা উপস্থিত হয়েছে শিক্ষার্থীর সামনে দুরধিগম্য রহস্যের অবগুণ্ঠনে আবৃত হয়ে। শিক্ষকমশায়কে তাই তখন বলতে হবে, সে অবগুণ্ঠন অপসারিত করতে হবে।

পঠন-পাঠনে যে বিষয় বস্তুর উপস্থাপন করা হয়েছে, যে সমস্ত তথ্যের যুক্তি-বিচার বা বিবেচনার সোপান বেয়ে কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে সেগুলি তো শিক্ষার্থীর মনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো, অগোছালো হয়ে ছড়িয়ে থাকবে। সেগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে সংক্ষিপ্ত করে, মনোজ্ঞ করে না বলে দিলে শিক্ষার্থীর অপরিণত মনে সবই হিজিবিজি হয়ে যায় যথাযথ বিন্যাসের অভাবে। এতে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির কাজটিও ভাল হয়ে থাকে।

পাঠ্যপুস্তকে বা বিদ্যার্থীর উপযুক্ত করে লেখা সম-ধর্ম্মী পুস্তকে হয়তো পাঠ্য-বিষয় সংশ্লিষ্ট অনেক তথ্য থাকে না; শিক্ষকমশায় হয়তো সেগুলি নানা জায়গা থেকে আহরণ সঙ্কলন করেছেন। পঠনপাঠনের বিশেষ কোনো এক স্তরে ঐ তথ্যগুলির উপস্থাপনা হয়তো একান্তভাবে প্রয়োজন; মৌখিক পদ্ধতির অনুসরণে শিক্ষকমশায় তা অনায়াসেই করতে পারেন।

ছাপার অক্ষরে লেখা তো মরা। তার মধ্যে জীবনের উষ্ণতা নেই। কিন্তু বলা-কথা শোনার মধ্যে, আবেগ কম্পিত স্বরের উঠানামা, ভাব বিহ্বল চোখ মুখের অভিব্যক্তি, দৃপ্ত নাটকীয় ভঙ্গি,—এ সবের মধ্যে রঙ থাকে, সুর থাকে, আর থাকে প্রাণের প্রচুর্য্য। জীবন্ত লোকের মুখ থেকে কথা জীবন্ত, যন্ত্রে ছাপা, মৃত্যুর কালো কালিতে আঁকা—ছাপার আখরের মতো সে মৃত নয়।

মৌখিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিক্ষক পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীদের বেশী করে সাহায্য করতে পারেন এই জন্যে যে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মত বিষয়বস্তু তিনি উপস্থাপিত করতে পারেন, শিক্ষার্থীরা পাঠ কতোখানি অনুধাবন করতে পারছে সেটি বুঝে জটিল কোনো জিনিসকে সহজবোধ্য করবার জন্যে তিনি সেটির পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। কোনো তথ্যের সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে কোনো সন্দেহের

ছায়া পড়লে অনুরূপ তথ্যের উল্লেখে, বিশ্লেষণে, সম্প্রসারণে তিনি শিক্ষার্থীদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন। দরদী, দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষক বাক্যজাল বিন্যাস করে পাঠ্যবিষয়কে ইচ্ছে করে জটিল বা আবছা করেন এ রকম দৃষ্টান্ত খুব কম।

এই মৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শুনে শেখার অভিজ্ঞতা হয়। শুনে শেখার অভিজ্ঞতার মূল্য মানুষের জীবনে আছে। বিশেষ করে পরিণত বয়েসে এ অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে শিক্ষার্থীর জীবনে। তাই শিক্ষার্থীর এই বয়েস থেকে তার প্রস্তুতি বাঞ্ছনীয়। আজকাল শ্রেণীকক্ষে নানা ধরনের দর্শন-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য "teaching aids" ব্যবহারের প্রবণতা একটু বেশী। রেডিও, বক্তৃতা প্রভৃতির সঙ্গে মিলে এই মৌখিক পদ্ধতি একটা ভারসাম্য বজায় করতে পারবে। তাছাড়া এই পদ্ধতির অবলম্বনে সময় বাঁচানো যায় অনেক। অর্ক আলোচনায়, অনভিজ্ঞ ছাত্রদের কাঁচা জ্ঞানের ভিত্তিতে নানা দোষযুক্ত আলোচনা শুনে, অপটু প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে থেকে তথ্য সংগ্রহ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুদীর্ঘ সময় ক্ষেপের পরিবর্তে অভিজ্ঞ কুশলী শিক্ষকের বিবরণ এবং তা মনোজ্ঞ করে, নানা কৌশলে কার্য্যকরী করে, উপস্থাপন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

শ্রেণীকক্ষে কিছু এমন উন্নত মান ও মেধার শিক্ষার্থী থাকে যাদের কাছে শিক্ষকমশায়ের বলাটা অনেক প্রয়োজনীয় এবং প্রীতিপদ। মৌখিক পদ্ধতি তাই সেই ধরনের শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে থাকে।

কিন্তু শিক্ষকমশায়ের এই পদ্ধতি হবে সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত ; প্রস্তুতিতে পর্য্যাপ্ত তথ্যবহুল উপস্থাপনে যথাযথ, মনোজ্ঞভঙ্গিতে সমৃদ্ধ। আর যথেষ্ঠ সাবধানতা অবলম্বন না করলে এটি হয়ে দাঁড়াবে বক্তৃতামালা এবং বক্তৃতায় যে দোষ ত্রুটি ভারাক্রান্ত করে পাঠকে, জটিল ও দুর্গম করে জ্ঞানার্জ্জনের সমস্ত পথকে তা সবই শ্রেণীকক্ষে এসে পঠনপাঠনকে করে দেবে নিষ্ফল, নিরর্থক।

আমাদের দেশে উপরে বর্ণিত মৌখিক পদ্ধতিগুলি সংমিশ্রিত রূপে কিংবা মৌখিক পদ্ধতিকে অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতির কোনো কোনো অংশের সাথে সমন্বিত করে প্রয়োগ করলে সুফল আশা করা যেতে পারে। এ কাজটি অবশ্য ইতিহাস শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। তিনি তাঁর স্কুলের পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের মান এবং মনীষার বিকাশ অনুসারে, তাঁর নাগালে প্রাপ্ত Teaching aids অনুসারে এবং তাঁর নিজের যোগ্যতা অনুসারে পদ্ধতির চূড়ান্তরূপ নির্ধারণ করবেন। আর এই নির্ধারণে তাঁর অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাবেন।

তর্ক ও আলোচনা (Debate and Discussion) :—

শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীদের অবাধ, সহজ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ শিক্ষাবিজ্ঞানের পাতায় নীতি হিসেবে বহুদিন আগে থেকেই স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি কেবল নীতি হিসেবেই স্বীকৃত হয়নি, শ্রেণীকক্ষে এর প্রচলন যাতে হয় তার জন্মে চেষ্টাও হয়েছে অতীতে। আজ এটি কেবল চেষ্টা আর নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বাস্তব রূপায়ণে এটি সার্থক ভাবে মূর্ত্ত। বাস্তবে এর সার্থক রূপায়ণের অবশ্য কারণ আছে। নানা ধরনের চিন্তায় আর গবেষণায়, প্রয়োগে আর অনুসন্ধিৎসায় শিক্ষাবিজ্ঞান আজ বহু প্রয়োগসিদ্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ। শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শের আলোক বন্যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে দিচ্ছে, তাদের সম্পর্ককে করছে নিকট এবং সহজ। শিক্ষাপ্রক্রিয়ার গোপন কথাটি আমাদের গোচরে আসার পর থেকেই আমরা জেনেছি যে শিক্ষার্থী শেখে কথায় বার্ত্তায়, আলাপে আলোচনায়, জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসায়, ভাবের আদান প্রদানে।

শ্রেণীকক্ষে আলোচনা, পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে, তাই বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। আলোচনা তাই আজ আর বাজে নয়, কথাবার্ত্তা তাই আর আজ সময় নষ্ট হবার ভীতি জাগায় না। শিক্ষার্থীর কৌতুহলী মনের প্রশ্ন তাই আজ আর শিক্ষক মশায়ের চুপ করিয়ে দেবার তর্জ্জনী উত্তোলন করে না। শিক্ষার্থীদের প্রাসঙ্গিক কথাবার্ত্তা বা প্রশ্ন তাই আজ শ্রেণী কক্ষে আগত।

কিন্তু শ্রেণী কক্ষে পাঠ্যবিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা যাতে এলোমেলো অগোছালো না হয় তার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই পরিকল্পনা নেবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। এই পরিকল্পনার গোড়ার কথা প্রস্তুতি; শিক্ষকের এবং শিক্ষার্থীর। প্রস্তুতির আনুষঙ্গিক অঙ্গ হচ্ছে আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারণ এবং বিষয় অন্তর্গত তথ্যগুলির নির্ব্বাচন এবং বিন্যাস। বিষয় নির্দ্ধারণ এবং তথ্যগুলির বিন্যাস করবার পরই কি ভাবে আলোচনা চলবে সেটি মোটামুটি ঠিক করে নেবার আবশ্যকতা আছে। এই আলোচনা কখনো সাধারণ আলোচনা, কখনো তর্ক, কখনো "সিম্পোসিয়াম" প্রভৃতির আকার নিতে পারে।

আলোচনা যাতে সমধিক কার্য্যকরী হয় তার জন্যে পূর্ব্বাহ্নে পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামতে হবে। এই কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হলে এটিকে তিনটি স্তরে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে, যথা (১) প্রস্তুতি, (২) আলোচনা, ও (৩) আলোচনার মূল্যায়ন। আলোচনা যে ধরনের বা যে আকারেরই হোক না কেন এই স্তর ভাগে ভাল ফল পাবার আশা করা যায়।

প্রস্তুতি—প্রথমে প্রস্তুতির কথা ধরুন। যে "বিষয়" আলোচ্য সেটি সম্বন্ধে যথাসম্ভব মূল উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে হবে। আলোচ্য বিষয়টিকে মনে রেখে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলির অনুসন্ধান ও সঙ্কলন করতে হবে। শুধু মূল উপাদান নয় ঐ বিষয় সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক তথ্য যে সব পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতিতে পাওয়া যাবে সেগুলি সংগ্রহ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের এ সবগুলি পড়তে দিতে হবে। এই সব পড়বার সময় "তথ্য" এবং লেখকের "মত" (opinion) এ দুটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে নিতে হবে। প্রাসঙ্গিক অংশগুলি পড়তে হবে। পড়তে হবে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। লক্ষ্যহীন, এলোমেলো পড়া নিরর্থক। সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে পড়তে হবে। উপস্থাপিত যুক্তি তর্কগুলি বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে, মূল থেকে যদি তার পর্থক্য থাকে সেগুলি লক্ষ করতে হবে। সব রকমের যুক্তি বিচার করে নৈর্ব্যক্তিক উপসংহারে আসতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়া চলবে। নিজের ব্যক্তিগত মত বা সংস্কার বা পূর্ব্বসিদ্ধান্ত যেন নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্তে আসবার পথে বাধার সৃষ্টি না করে। খোলা মন নিয়ে পড়তে হবে। ধৈর্য্য সহকারে লেখকের বক্তব্য ও মন্তব্যগুলি অনুধাবন করতে হবে। লেখকের সাথে একমত না হলেও তাঁর বক্তব্য ভালকরে সহিষ্ণু মন নিয়ে জানতে হবে। সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে এই পড়ার থেকে কিছু না কিছু লাভ হবে। "আমি সব শিখে গেছি" এ ভাব থাকলে যা পড়বো তার থেকে কিছু গ্রহণ করা শক্ত হবে। নমনীয় মনোভাব নিয়ে পড়তে হবে। নির্ভুল যুক্তি যদি আমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বদলে দেয় তাতে ক্ষতি কি? যুক্তি শুদ্ধ সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে যদি আমার পূর্ব্ব মতকেই আঁকড়ে থাকি নিছক সংস্কার বশে, উদার দৃষ্টিভঙ্গি যদি না গড়ে তুলতে পারি, তাহলে মনে সঙ্কীর্ণতা আরো বেড়েযাবে, আর আমার সংস্কার এবং পূর্ব্ব সিদ্ধান্তগুলি আরও বেশী করে মনের বাতায়নকে করে দেবে দৃঢ়ভাবে অর্গলবদ্ধ, তাতে জ্ঞানের অসীম দিগন্তের সাতরঙা-আলোর দ্যুতি ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে প্রবেশ-পথ হারিয়ে ফেলবে। তাছাড়া এই ধরনের পড়া থেকে যাতে করে বেশী উপকার পাওয়া যায় তার জন্যে আহৃত তথ্যগুলিকে সুষ্ঠুভাবে, সুসংবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার সংক্ষিপ্তসার করতে হবে। এমনি নানাভাবে প্রস্তুতি হবে।

আলোচনা :—প্রস্তুতির পর হবে আলোচনা। এই আলোচনা যেখানে হবে সেখানে আলোচনার সময় প্রয়োজনে লাগবে সেই ধরনের সব জিনিস আগে থাকতে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। যদি সংশ্লিষ্ট ম্যাপচার্ট, চিত্র প্রভৃতির প্রয়োজন থাকে তাহলে সেগুলিও সেখানে উপযুক্ত স্থানে রাখা থাকবে।

আলোচনায় যেন আগে থেকে শিক্ষকমশায় কোন রকম বিধিনিষেধ আরোপ না করেন। আলোচনা যতদূর সম্ভব প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এবং নিজেদের স্বাধীন, যুক্তিপূর্ণ চিন্তার আদান প্রদানে যেন হয়। বলা বাহুল্য আলোচনা যথাযথ ভাবে পরিচালনার প্রয়োজন আছে। আলোচনায় যাতে সব শিক্ষার্থীই অংশগ্রহন করে সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে। আলোচনায় একটি সময়তালিকা অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। যে শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশগ্রহন করে, অর্থাৎ যারা একটু "বলিয়ে কইয়ে", তাদের কিছু সংযত করে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনেক সময় হবে, তা না হলে অন্য"শিক্ষার্থীরা আলোচনায় ঠিক মত অংশ গ্রহণ করবার অবকাশ বা সুযোগ পাবে না। আলোচনার সময় যা বলা হবে সেগুলি যেন, স্পষ্ট, সুসংবদ্ধ ভাবে, যুক্তির উপর নির্ভর করে বলা হয়। অস্পষ্ট বা এলোমেলো আলোচনা নিষ্ফল। আলোচনা যখন চলবে অখন অপরে যা বলবে তা মন দিয়ে শুনতে হবে। বলবার সময় আক্রমণাত্মক ভঙ্গি না থাকাই ভাল। বলার মধ্যে বিনয় যেন থাকে। "আমি যা জানি সেটাই ঠিক" এ মনোভাব খারাপ। বলার ভঙ্গি অশোভন যেন না হয়। অপরের মতকে শ্রদ্ধাকরতে শিখতে হবে। আলোচনায় অপরের যা দান তা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতে হবে। অপরকে নিজমতে দীক্ষিত করবার চেষ্টা সব সময়েই পরিহার করে চলতে হবে। আলোচনায় বেশী তথ্য উপস্থাপন করবো এই মনোভাব থাকাই বাঞ্ছনীয়। আলোচনার সময় মতের অমিল হলেও মনের অমিল যেন না হয়। আলোচনার সময় মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। রুক্ষ মেজাজ অবাঞ্ছনীয়।

মূল্যায়ন—আলোচনা থেকে কতটুক লাভ হয়েছে শিক্ষকমশায় তো আলোচনা চলবায় সময় দেখতে পাবেন। শিক্ষার্থীরা নিজের নিজের মন হাতড়ে দেখলে বুঝতে পারবে আলোচনার পর তাদের কিছু লাভ হয়েছে কিনা। তা ছাড়া আলোচনার সামগ্রিক মূল্যায়নের হদিস নেবার জন্যে আলোচিত বিষয় বস্তুর উপর কিছু লিখিত কাজ দিয়ে দেখতে পারেন।

এই পদ্ধতিটিতে অবশ্য নীচের শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বিশেষ কিছুই লাভবান হবে না। যাদের খানিকটা বিশ্লেষণী বিচার শক্তির উন্মেষ সাধন হয়েছে এটি তাদের পক্ষে প্রযোজ্য। আমাদের দেশের স্কুলের অষ্টম শ্রেণী থেকে এটির প্রয়োগ করতে পারা যায়। তর্ক বা আলোচনার 'ক্লাস' মাসে হয়তো দুটি করা সম্ভব হতে পারে। এটি সাধারণ ক্লাস থেকে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হবে নিশ্চয়। তাছাড়া এর প্রস্তুতির জন্যে ছাত্রদের সময় দরকার, স্কুল লাইব্রেরিতে বইএর দরকার। আমাদের স্কুলগুলির বর্তমান পরিবেশ ও অবস্থার কথা স্মরণ করে একথা বলতে হয় যে নানা কারণে

এই পদ্ধতি অনুসরণ করার অনেক অসুবিধে সেখানে আছে। তবে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আর বিশেষ কিছু অসুবিধে থাকবেনা।

এটি অনুসরণ করতে পারলে লাভ হবে অনেক। বিষয়বস্তুর জ্ঞান আহরণে, সূক্ষ্ম যুক্তি তর্কের বিশ্লেষণে, তথ্যের সমাহারে ও সঙ্কলনে, উপস্থাপনায় ও উপসংহারে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভিত্তি হবে পাকা এবং অনেক ক্ষেত্রে নিখুঁত। নিজের মনের ভাব ভাষায় সুসংহত ভাবে বলবার অভ্যাস কাল ক্রমে হয়ে উঠবে পরিণত। শ্রেণী কক্ষের গতানুগতিকতার অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীর মন খোলা বাতাসে সঞ্চরণ করবার অবকাশ পায় বলে তা হয়ে উঠে সুস্থ এবং সবল। আলোচনা যদি তর্কের রূপ নেয় তাহলে প্রতিপক্ষকে সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে কি করে পরাস্ত করা যায় তার শিক্ষা ও প্রস্তুতি এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ শিক্ষার মূল্য সমাজ জীবনে প্রচুর। তবে লক্ষ রাখতে হবে যে তর্ক যেন শিক্ষার্থীদের দলীয় বিবাদে পরিণত হয়ে স্কুলের পরিবেশ অভিশপ্ত না করে দেয়।

উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি (Source method) :—

বিষয়বস্তুর সাথে সাক্ষাৎ সংযোগ এবং তার বাস্তব অভিজ্ঞতা শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনে অত্যন্ত মূল্যবান। কল্পনা অপ্রাকৃত তাই সে অবাস্তব। সাক্ষাৎ সংযোগ বাস্তব তাই সে প্রকৃত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। যে কোনো জিনিসের সম্বন্ধে লাখো কথার মনোজ্ঞ বর্ণনার চেয়ে তার সাথে চাক্ষুষ পরিচয় যে বিষয়টির সম্বন্ধে ধারণা অধিকতর স্বচ্ছ করবে সে সম্বন্ধে আমাদের কারো মনে সন্দেহ থাকতে পারেনা। আর ঐ বিষয়টির সম্বন্ধে হাতে. কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা যে ঐ বিষয়টির সম্বন্ধে জানবার সবথেকে ফলপ্রসূ পন্থা এটা আমরা সকলেই স্বীকার করি। একটা উদাহরণ নিন। আপনার স্কুল শহর থেকে দূরে, গ্রামে। সেখানে হয়তো "বাস্কেট বল খেলার চলন নেই। আপনার স্কুলের ছাত্ররা "বাস্কেট বল" খেলা কোন দিন দেখেনি। আপনি "বাস্কেট বল" খেলা সম্বন্ধে হাজারো বক্তৃতা দিন। বক্তৃতা মনোজ্ঞ করুন। "বাস্কেট বল" খেলার সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা বেশ স্পষ্ট হয় কি? কিন্তু যদি আপনি একদিন "বাস্কেট বল" খেলা তাদের দেখান, তাতে আপনার মনোজ্ঞ বক্তৃতার থেকে অনেক কাজ হবে। আর আপনার ছাত্ররা যদি নিজেরা খেলায় যোগ দেয় তাহলে তো কথাই নেই। সে তো বাস্তব অভিজ্ঞতা।

শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের বেলাতেও অনুরূপ ভাবে বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব সংযোগ, আর হাতে কলমে সেটি করার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা লাভ

শিক্ষার্থীরা করে থাকে তার অবদান শিক্ষা প্রক্রিয়াতে প্রতুল। (ইতিহাস রচিত হয় তথ্যের উপর ভিত্তি করে। তথ্য সংগৃহীত হয় মূল উৎস থেকে। তথ্যের এই উৎস একাধিক হতে পারে। তথ্যের এই উৎসগুলি ইতিহাসের মূল-উপাদান।) মূল-উপাদান-আধৃত তথ্যগুলি বিন্যস্ত হয় ইতিহাসের রচনায়। ইতিহাসের প্রায় সব বিষয়বস্তুই শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবন থেকে অনেক দূরের, অতীতের ব্যাপার। তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সাথে তাদের বাস্তব জীবনের যোগ যেমন একদিক থেকে নেই বললেই চলে তেমনি অন্যদিক থেকে আবার ইতিহাসের তথ্য-সম্বলিত মূল উপাদানগুলিও বিরল এবং দুর্লভ। কিন্তু ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগ সাধন করবার জন্যে ইতিহাস পঠন-পাঠনে ইতিহাসের মূল উপাদানগুলি কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কারণ এতে পাঠ্যবস্তুর সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগ সাধন হয়, পাঠ জীবন্ত হয়, পাঠে বৈচিত্র্য আসে, পাঠ্যবস্তু হৃদয়ঙ্গম করা শিক্ষার্থীদের সহজ হয়। শ্রেণীকক্ষে এই মূল উপাদানগুলি কাজে লাগিয়ে পঠন-পাঠনের কাজটি সমাপন করাকেই সাধারণতঃ উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে।

এই উপাদান-ভিত্তিক পদ্ধতির একটু ইতিহাস আছে। গত শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে এই উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল। ইতিহাসের যে বিষয়বস্তুর পঠন-পাঠন শ্রেণীকক্ষে হবার কথা সেই বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে তথ্য সম্বলিত মূল উৎসগুলি শিক্ষার্থীর দৃষ্টিগোচর করা হোতো। শিক্ষার্থী এই মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেই সরাসরি নিজেই সেটির কাহিনী বা বিবরণ লিখতো। অপর্য্যাপ্ত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী এই সব মূল উৎস থেকে যে একটি স্কুলের ছাত্র মোটামুটি বিবরণ লিখিতে সক্ষম হবে না এবং এটা তাদের পক্ষে যে অত্যন্ত দুরূহ এটা সহজেই অনুমান করা যায়! তাই স্বাভাবিক কারণেই এই প্রথা ক্রমে অত্যন্ত গতানুগতিক, নীরস এবং অন্তঃসারশূন্য একটি যান্ত্রিক আবৃত্তির প্রাণহীন পর্য্যায়ে এসে হাজির হোলো। আর সেইজন্যেই বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদেই এর নব রূপায়ণ হয়। এই রূপায়ণে মূল উপাদানভিত্তিক পদ্ধতির সাবেক ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন এনে দেয়। নব রূপায়িত এই পদ্ধতিতে ইতিহাসের উপাদানগুলিকে নানাভাবে কাজে লাগিয়ে পঠন-পাঠন সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পদ্ধতিটির নব রূপায়ণের মূলে বিদ্যমান আরেকটি কারণও এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই নানাভাবে ও নানা ভঙ্গিতে ইতিহাসের নানা উপাদান সম্বলিত পুস্তক (Source

Book) প্রকাশিত হতে থাকে। উপাদান সম্ভারের প্রাচুর্য্য খুব সহজেই নাগালের মধ্যে আসায় এই উপাদানগুলি যে পঠনপাঠনে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে, বিশ্লেষণে, শিক্ষার্থীর সাথে সেটির বাস্তব সংযোগ স্থাপনে, আলোচনার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার, প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর দৃঢ় এবং নির্ভুল ভিত্তিস্থাপনে, সাবলিল ভঙ্গি অবলম্বনে, শ্রেণীকক্ষ প্রাণবন্যায় ভরিয়ে দিতে পারে এ প্রমাণ চাক্ষুষ মিলে গেল।

এখন কথা হচ্ছে যে শ্রেণীকক্ষে পঠনপাঠন সার্থক করতে হলে উপাদানগুলি কি ভাবে সাফল্যের সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে?

প্রথমতঃ, আলোচ্য বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে, সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করবার জন্যে উপাদানগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। ইতিহাস যে কল্পনাজাত কাহিনী নয় উপাদানের উপস্থাপনে ও সংযোগে এ বোধ শিক্ষার্থীর মনে সহজেই আসে। অতীত শিক্ষার্থীর কাছে বাস্তব নয়। অতীতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু তাই শিক্ষার্থীর কাছে বাস্তব বিবর্জিত বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। উপাদানগুলির সাক্ষাৎ সংযোগে বিষয়বস্তুটি তাই একদিকে যেমন জীবন্ত হয়ে উঠে অন্য দিক থেকে বিষয়বস্তুটির প্রতি একটি সহজ বাস্তব বোধ জন্মে। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের সময় আবশ্যকীয় উপাদানগুলির ব্যবহারে পাঠ্য বিষয়-বস্তুর উপস্থাপন বা আলোচনা সরস এবং সম্পূর্ণই শুধু হয় না, উপাদানের ব্যবহারে বিষয়-বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানের বনেদ পাকা হয়। উপাদানগুলির ব্যবহারে ইতিহাস পঠন-পাঠনে আর একটি বড় কাজ হয়,—ইতিহাস পাঠে একটি উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইতিহাস পাঠে এই সুষ্ঠু পরিবেশের প্রভাব অবর্ণনীয়। অতীতের কাহিনী আলোচনাকালে একটু কল্পনার আশ্রয় নিয়ে যেকালের কাহিনীর আলোচনা হচ্ছে, মনটি সেইকালে নিয়ে যেতে না পারলে ইতিহাস পাঠ জীবন্ত হয়ে উঠে না। তাই যে যুগের কথা শ্রেণীকক্ষে আলোচিত হচ্ছে সেই যুগের অনুরূপ বিষয়-বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে—কোথাও বা সে যুগের লোকের বেশভূষা, মেয়েদের ব্যবহৃত অলঙ্কার, কিংবা সেই যুগের যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র, কোন শিল্পীর রচিত শিল্পকর্মের নিদর্শন, সেই যুগে ব্যবহৃত যানবাহন বা প্রচলিত মুদ্রা প্রভৃতির সান্নিধ্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে ইতিহাস-পাঠ প্রাণময় হয়ে উঠে। এইসব নিদর্শনগুলির আসল সংগ্রহ করা অনেক সময়ই দুষ্কর। তাই প্রতীক-ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। কোথাও বা শিক্ষকমশায় কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে তার নিজের কথা শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনালেন। এমনি নানাভাবে ইতিহাসের উপাদানগুলি কাজে লাগিয়ে ইতিহাস পাঠের একটি অনুকূল আবহাওয়া তৈরী করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর একটি

সহজ ও বাস্তব সংযোগ সংসাধিত করা যেতে পারে। উপাদানগুলির ব্যবহারে পঠন পাঠনে আসে বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য প্রাণরসে ভরপুর। বৈচিত্র্যের অভাবে পঠন-পাঠন একটানা একঘেয়ে, শুষ্ক মামুলী গতানুগতিকতায় ডুবে যায়, আর সেই জন্যেই সেটি হয়ে উঠে অর্থহীন, বিস্বাদ। উপাদানগুলি যথাযথ কাজে লাগিয়ে পঠন-পাঠনে বৈচিত্র্য এনে সেটিকে প্রাণবন্ত ও সরস করে তোলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, যে উৎস থেকে ইতিহাসের তথ্য আহৃত হয়ে থাকে সেই উৎসগুলি (বিশেষভাবে, সমসাময়িক কোনো ঐতিহাসিকের লেখা কাহিনী, কোনো পর্য্যটকের বিবরণ, কারো আত্মকাহিনী, শিলালিপি বা তাম্রলিপির অনুবাদ প্রভৃতি, কোনো স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো দলিলপত্রাদি) ইতিহাস-পাঠের বিষয়-বস্তুর প্রসঙ্গ বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের পড়তে নির্দ্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এই নির্দ্দেশ দেবার পর নির্দ্দিষ্ট উপাদানগুলি যাতে শিক্ষার্থীর হাতে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পর একদিন ঐ নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপ্তির পর প্রতিটি শিক্ষার্থীর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা শ্রেণীকক্ষে বর্ণনা করতে বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর বর্ণনা শোনবার প্রারম্ভে উপাদানে আধৃত বিষয়, উপাদানের প্রকৃতি, শ্রেণীকক্ষে আলোচ্য বিষয়-বস্তুর সাথে তার সম্পর্ক, উপাদানটির প্রভাব, উপাদানে আধৃত তথ্যগুলির নির্ভরযোগ্যতা সমস্ত দিকগুলিই আলোচিত হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো একই বিষয়-বস্তুর সম্পর্কে একাধিক উপাদানে পরস্পর বিরোধী তথ্যও মিলবে। সে সব ক্ষেত্রে শিক্ষক মশায় তার কারণ নির্ণয় করে আসল তথ্যটি উদ্ধার করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন!

তৃতীয়তঃ, উৎসুক এবং যোগ্য শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের মূল তথ্য সম্বলিত উপাদানগুলি অধ্যয়ন করতে অনুপ্রেরণা দিয়ে শিক্ষকমশায় তাদের এই ধরনের পাঠে অধিকতর উৎসাহী করে তুলতে পারেন। যে সব শিক্ষার্থীরা প্রকৃত যোগ্য, উৎসুক ও আগ্রহশীল তাদের এই ধরনের পাঠে অধিকতর উৎসাহিত করা এবং তাদের এই পাঠ পরিচালনা করা ইতিহাস-শিক্ষকের একটি অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য। সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত এই পাঠে শিক্ষার্থীদের যে ইতিহাস পাঠে সাহায্যই করা হয় তা নয়, এতে শিক্ষার্থীর ইতিহাস পাঠে অনুরক্তি ও অনুসন্ধিৎসা ও জাগিয়ে তুলতে পারা যায়। এই ধরনের পাঠের মাধ্যমে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছাড়াও বিষয়সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি ব্যাপকভাবে এবং নির্ভুল ভাবে জানবার ইচ্ছাও শিক্ষার্থীর মনে জাগে। এ ছাড়া এই ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে পড়বার অভ্যাস ও যেমন হয় তেমনি ইতিহাস

সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরও সৃষ্টি হয়। ইতিহাস যে কল্পনাশ্রিত, খুশিমত বানানো কাহিনী মাত্র নয়,—এটি যে তথ্যের উপর, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এ ধারণা খুব সহজেই শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

চতুর্থতঃ, ইতিহাস পঠন পাঠনে কোন কোন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সমস্যা-সমাধানের এবং আসল সত্যে উপনীত হবার উপায় হিসেবে এই উপাদানগুলি ব্যবহৃত হতে পারে। ইতিহাসের মূল উপাদানের বিকার নেই। কিন্তু ইতিহাসের বিন্যাসে অনেক সময় লেখকের মনের রঙ্ এবং মতবাদের কারুকার্য্যের ছাপ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এটা হয় সাধারণতঃ মূল উপাদানে আধৃত তথ্যের পার্থক্য হেতু। ব্যাখ্যা নৈর্বক্তিক অনেক সময় হয় না। তাই ব্যাখ্যায় অনেক ক্ষেত্রে মত পার্থক্য ঘটে। এই মতপার্থক্যের আরও কারণ আছে। কোনো বিষয়বস্তুর মূল উপাদান একাধিক হতে পারে। একাধিক এই উপাদানে আধৃত তথ্যগুলি অনেক সময় পৃথক ও পরস্পর বিরোধীও হতে পারে। তখন কোন্ তথ্যটি সত্য বা অধিকতর নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে নানা প্রশ্ন, সন্দেহ ও সমস্যা জাগতে পারে। অনেক সময় আবার তথ্যগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বিকৃত করা হয়ে থাকে। তাই এই সব ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে, যুক্তি বিচারের নিক্তিতে ওজন করে যেটি সত্য সেটি বেছে নিয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এই সিদ্ধান্তে আসবার জন্যে প্রয়োজন হয় বিশ্লেষণী বিচার বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনের একটি নৈর্ব্যক্তিক কাঠামো। তা না হ'লে যুক্তি-শুদ্ধ নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়না।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ভারতবর্ষের মৌর্য্যদের কথাই ধরুন। পুরাণে আধৃত তথ্যানুযায়ী মৌর্য্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মুরানাম্নী এক শূদ্রাণী দাসীর পুত্র। আবার বৌদ্ধদের প্রাচীন গ্রন্থ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য ছিলেন পিপ্পলীবন নিবাসী "মোরীয়', নামধারী এক ক্ষত্রিয় বংশাবতাংশ। পৃথক পৃথক এই তথ্যের আহরণে শিক্ষার্থীর মনে স্বভাবতই প্রশ্ন-জাগবে কোনটি ঠিক? এই প্রশ্নের সমাধানে উপরোক্ত মূল উপাদান দুটির তথ্য শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে তথ্য দুটির বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হবে। প্রথমেই বিচার করে দেখতে হবে কোনটি বেশী নির্ভরযোগ্য। তার জন্যে দেখতে হবে উপাদান দুটির মধ্যে কোনটির রচনাকাল অধিকতর প্রাচীন অর্থাৎ তথ্যে উল্লেখিত কাহিনীর সময়ের কাছাকাছি কোনটি রচিত হয়েছিল। সেটি বিচার করতে গেলে পুরাণের রচনাকাল নির্ণয় করতে হবে এবং বৌদ্ধদের গ্রন্থখানির রচনাকাল ঠিক করে নিতে হবে। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা প্রায় স্থির

সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন যে বৌদ্ধগ্রন্থটি পুরাণের থেকে অনেক আগের রচনা এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য যখন রাজত্ব করছিল তখনকার নিকটবর্ত্তী সময়কার। আর পুরাণ রচিত হয়েছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজত্বকালের এবং বৌদ্ধগ্রন্থটি রচিত হবার অনেক পরে। পরে যে জিনিসের রচনা তাতে স্বাভাবিক কারণেই তথ্যের বিকৃতি আসা অসম্ভব নয়। আর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্রায় সমসাময়িক কালে এবং পুরাণ রচিত হবার অনেক আগে যে বৌদ্ধগ্রন্থটির রচনা তাতে তথ্যের বিকৃতির সম্ভাবনা কম। তাছাড়া গুপ্তযুগের কাছাকাছি কোন সময়ে রচিত এই পুরাণগুলি হিন্দুদের দ্বারা কৃত। মহারাজ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁর অচল নিষ্ঠা, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে তাঁর অদম্য উৎসাহ, অকাতর অর্থব্যয় প্রভৃতির জন্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক গোঁড়া সনাতন পন্থী পুরাণ-কারদের মনে মহারাজ অশোককে খেলো করে দেখবার এবং দেখাবার বাসনা থাকা অস্বাভাবিক নয়, এবং সেই জন্যেই তার পূর্ব্বপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নন্দ-রাজাদের দাসী, শূদ্রাণী মূরাকে কেন্দ্র করে গল্পফাঁদা উদ্দেশ্য মূলক হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। তাই সব দিক বিচার বিবেচনা করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যকে ক্ষত্রিয় বংশাবতাংস বলে স্বীকার করাটাই অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য।

এমনিতরো আরো উদাহরণ নিয়ে নানা বিরুদ্ধ ও পরস্পর বিরোধী তথ্য থেকে প্রকৃত সত্য সিদ্ধান্ত করা কি করে সম্ভব সে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তা করতে চেষ্টা করলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। এই প্রসঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নেতালা হয় যে স্কুলের ছাত্ররা এই বিচার বিশ্লেষণের চুলচেরা যুক্তি প্রয়োগ করে এমনি একটা যুক্তিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে কিনা। এ বিষয়ে নিখুঁত সাফল্য না এলেও শিক্ষার্থীদের নানা বিরুদ্ধ মতের মধ্যে থেকে যুক্তি তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি তথ্যভিত্তিক, নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্তে আসবার জন্যে যে শিক্ষা ও অভ্যাসের সূচনা এই ব্যবস্থায় হয়ে থাকে তা তো অস্বীকার করা যায়না।

মূল উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতির ভালো দিকও আছে আবার মন্দ দিকও আছে। আমরা ভাল দিকটা প্রথমে দেখবো। ইতিহাসের উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতিতে ইতিহাস পড়বার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি গড়েউঠে। যে ভঙ্গিতে পণ্ডিতেরা নানা উপাদান আশ্রয়ী তথ্য থেকে একটি গ্রহন যোগ্য সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়ে থাকেন সেই ভঙ্গি ও প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে। যে কোন বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন নিশ্চিৎ মূল্যবান তেমনি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ বিষয়বস্তুর সম্যক অবগতি আমাদের সম্ভব হয়েছে তার মূল্যও কম নয়।

অনেকে এই প্রক্রিয়াটিকে ও বিষয়বস্তুর তুল্য মূল্য দিয়ে থাকেন। এই উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি ইতিহাসের তথ্যের সাথে শিক্ষার্থীর সুদৃঢ় পরিচয় স্থাপন করে এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নানা ধরনের তথ্য থেকে যুক্তিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে আসবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও তার নির্ভুল ধারণা সংগঠন করে।

শিক্ষার্থীর সামনে মূল উপাদানগুলির উপস্থাপনে ইতিহাসের কাহিনী সম্বন্ধে অস্পষ্টতা এবং অলিকত্ব মুছে যায় এবং ইতিহাস যে অনুমান বা বানানো কথা নয় এ কথাটি স্পষ্ট করে, দৃঢ় করে শিক্ষার্থীর কাছে প্রমাণিত করে দেয় এই উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি। ইতিহাস যে তথ্যের উপর, সত্যের উপর, প্রমাণের উপর ভিত্তি করে রচিত এ বোধ শিক্ষার্থীর সহজ ভাবেই স্পষ্ট হয় এই পদ্ধতির মাধ্যমে। এ বোধ স্পষ্ট হতে শিক্ষার্থীর অসাধারণ মেধা বা প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। খুব সাধারণ মেধার শিক্ষার্থীর পক্ষেও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়-বস্তুর সাথে কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীর প্রভেদ খুব সহজেই প্রতিভাত হয়ে থাকে।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় যে সব বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ তার সাথে শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎ সংযোগ নেই, আর কোনোদিন তা হবার সম্ভাবনাও নেই। তাই ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে আধৃত বিষয়বস্তুগুলি শিক্ষার্থীর কাছে অপ্রত্যক্ষ থেকে যায়। অপ্রত্যক্ষের মধ্যে আছে অবাস্তবতা। উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক ভাবে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির উপস্থাপনে বিষয়-বস্তুগুলির সাথে শিক্ষার্থীর একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন করে, অধীত বা অধীতব্য বিষয়বস্তুগুলি সম্বন্ধে একটি বাস্তব বোধ জাগিয়ে তোলে। ইতিহাসের কাহিনী তখন আর অনুমানের অবগুণ্ঠনে কল্পনার রহস্য হয়ে দূরের জিনিস থাকেনা, প্রত্যক্ষ সংযোগে ভাস্বর এবং বাস্তব বোধে প্রাণময় ও শাশ্বত হয়ে উঠে। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে বন্দিনী কাহিনী অবাস্তবতার অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস পাঠ তখন শুধু জীবন্তই হয়না, সার্থকও হয়।

ইতিহাস পঠনপাঠনে উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ করবার, বিচার করবার, ক্ষমতার উদ্বোধন হয়। উপাদান আধৃত নানা তথ্যের —অনেক সময় পরস্পর বিরোধী তথ্যের,—বিশ্লেষণে, বিচারে, যুক্তিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অভ্যাসে, একটি নৈর্ব্যক্তিক মনের কাঠামো রচিত হয়। সংযম ও নিষ্ঠার সাথে সমালোচনা, সাধারণ অনুসন্ধিৎসার সাথে সত্যানুসন্ধানের ঐকান্তিকী ইচ্ছা সমন্বিত হয়ে এমন একটি সত্য তথ্যান্বেষী মন, এমন একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এই পদ্ধতির মাধ্যমে গড়ে উঠে যেটি আমাদের এই "প্রোপ্যাগাণ্ডার"

যুগে (যেখানে বহু মিথ্যার সাথে সামান্য সত্য মিশিয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রেই) একান্তভাবে আবশ্যকীয়।

উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতির মন্দ দিকও আছে। পাঠ্যপুস্তকে লিখিত ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এ পদ্ধতি অনেক সময়ই মনকে করে সন্দিগ্ধ। স্কুল-ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে সাধারণতঃ যে সেব তথ্য কাহিনী সন্নিবিষ্ট হবে সেগুলির সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সন্দেহ থাকলে অসুবিধে আছে। প্রতি পদক্ষেপে মুল উপাদানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বিচার বিশ্লেষণের অসুবিধে ঘটে। তাই পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সন্দেহহীন মনোভাব থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে।

উপাদান আশ্রিত তথ্যের গভীরে গিয়ে তার ব্যাখ্যার (interpretation) সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করে বিচার বিশ্লেষণ, নানা যুক্তির অবতারণা, বিভিন্ন ব্যাখ্যার পরীক্ষা ও সমালোচনা অনেক সময় নীরস পাণ্ডিত্য জাহির করা প্রানহীন প্রক্রিয়া বলে মনে হয় বিশেষকরে যারা সাধারণ ছাত্র তাদের অনেক সময় অসুবিধেও হয়ে থাকে।

অনেক সময় উপাদানগুলির অপব্যবহারে বা ভুল ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয়। এই পদ্ধতি নিখুঁত ভাবে প্রয়োগ করতে না পারলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হয়ে থাকে। অনেক সময় শিক্ষকমশায়ের আগ্রহের আতিশয্যে অধিকতর কম বয়েসের শিক্ষার্থীদের এই পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়ালে ফল উল্টো হয়। কম বয়েসের শিক্ষার্থীদের বেলায় অবশ্য শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্যে উপাদানগুলির সাহায্য নিতে পারা যায়। তবে একথাও ঠিক যে পদ্ধতি প্রয়োগ করবার জন্যে যে ক্ষতি হয়ে থাকে তার জন্যে প্রয়োগকারীই দায়ী। পদ্ধতিকে তার জন্যে দায়ী করা অর্থহীন। তবু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবার সময় যে ক্ষতি হতে পারে তার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যেই এই প্রসঙ্গে সেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

আর একটি কথা বলে আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহারে আসবো। সে কথাটি হচ্ছে যে উপাদানভিত্তিক পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে অনুসরণ করতে গেলে স্কুলে গ্রন্থাগারের ভাল ব্যবস্থা ও পর্য্যাপ্ত সুবিধে থাকা এবং বহু সংখ্যক ইতিহাসের উপাদান সম্বলিত পুস্তক একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে এগুলি বর্ত্তমানে অশানুরূপ নয়। আমরা আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে এগুলির সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা হবে।

"য়ুনিট" পদ্ধতি :—

শ্রেণীকক্ষে যে কোনো বিষয় পড়ানোর সময়েই আজ 'য়ুনিট' পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা উঠতে পারে। এই "য়ুনিট" পদ্ধতি বর্ত্তমান আকার লাভ করবার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। কোনো পদ্ধতি যেমন হঠাৎ আচমকা রাতা-রাতি গড়ে উঠতে পারে না তেমনি সেটি একেবারে আগেকার প্রচলিত পদ্ধতি-গুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক, এবং সম্পর্কলেশহীন অভিনবত্ব দাবী করতে পারেনা। "য়ুনিট" পদ্ধতি সম্বন্ধেও তাই অনেকে মনে করেন যে উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে মনীষী হার্ব্বাট বিঘোষিত "পঞ্চসোপান পদ্ধতির" মধ্যেই "য়ুনিটের" ধারণা নিহিত ছিল। হার্ব্বাট সাহেবের পর তাঁর পঞ্চসোপান পদ্ধতি কিছুকিছু সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত হয়েছে এবং সাথে সাথে পরোক্ষ ভাবে 'য়ুনিটের' ধারণাও ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে এসেছে বলে তাঁরা মনে করেন। ১৯২৬ সালে মরিসন সাহেবের য়ুনিট পদ্ধতি প্রকাশিত হয় (the practice of teaching in Secondary schools)। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ থেকে বিংশ শতকের প্রথম পাদ—এই সময়ের ব্যবধানে—এই য়ুনিটের ধারণারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। যাঁরা মনীষী হার্ব্বাটের "পঞ্চসোপান" পদ্ধতির মধ্যে য়ুনিটের পূর্ব্বাভাস দেখতে পান না তাঁরাও স্বীকার করবেন যে পঞ্চসোপান পদ্ধতির পরিবর্ত্তন পরিবর্ধনের সাথে সাথে পঠন-পাঠন পদ্ধতির উন্নতিসাধন করবার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা চলে এসেছে। একটু চোখমেলে তাকালেই সেটি খুব সহজেই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়। কেউ কেউ শুরু থেকেই দীর্ঘতর "topic" এর বিকাশ চেয়েছেন ; কেউ কেউ পর পর সংস্থাপিত সোপান গুলির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন ; কেউ বা তাদের মধ্যে দিয়ে "প্রোজেক্টের" কথা বলেছেন। আর মরিসন সাহেব ১৯২৬ সালে 'য়ুনিটের' কথা পঞ্চসোপানের মধ্যে দিয়েই, আমাদের শুনিয়েছেন। মরিসন সাহেব প্রবর্ত্তিত "য়ুনিট" পদ্ধতির পঞ্চসোপান হচ্ছে : Exploration (অনুসন্ধান,) Presentation (উপস্থাপন,) Assimilation (জ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তিস্থাপন) organisation (বিন্যাস সাধন) Recitation (অভিজ্ঞতা বর্ণনা)।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই "য়ুনিট" কি ? "য়ুনিটপদ্ধতিই" বা কি ? য়ুনিট

পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে প্রবেশলাভ করলই বা কি করে? উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ থেকে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন সফল করে তোলবার জন্যে যে সব কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে এবং যে সব পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে তাদের প্রয়োগে এবং অনুসরণে শ্রেণীকক্ষে প্রথম প্রথম প্রাণ সঞ্চার হলেও এবং শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলেও ক্রমে ক্রমে সেগুলি তাদের আগেকার নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলল। অনেকের কাছেই বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হোলো যে ঐ পদ্ধতিগুলির অধিকাংশই পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যসংগ্রহ এবং সেই সব তথ্যগুলি শিক্ষার্থীদের মনে বসিয়ে দেবার অসার প্রচেষ্টার সমাহার এবং গতানুগতিক সংস্কার আর অনমনীয় ফরম্যুলায় পর্য্যবসিত হয়ে পড়েছে। তারই প্রতিবাদে "য়ুনিট" পদ্ধতি আসে শিক্ষাপদ্ধতিতে আর "য়ুনিট" আসে শ্রেণীকক্ষে পঠনপাঠন সার্থক করে তোলবার একটি কৌশলরূপে। যে কোনো নতুন জিনিস আসে এমনি ভাবেই যুগের প্রয়োজনের তাগিদে। কোনো জিনিসই চিরকালের জন্যে উপযোগী নয়। অবক্ষয়ী কালের সঞ্চারের তালে তালে আসে পরিবর্ত্তন, আর পরিবর্ত্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি বজায় রাখবার জন্যে প্রয়োজন হয় সংস্কার সাধনের। শ্রেণীকক্ষে পঠনপাঠনের পদ্ধতির মধ্যেও তাই এই সংস্কার-সাধন চেষ্টা। পঠনপাঠনে 'য়ুনিট' পদ্ধতির অনুসরণে কোনো নির্ব্বাচিত পাঠ্য বিষয়-বস্তুর অনুধাবনের আবশ্যকীয় ফলের উপরই সমধিক দৃষ্টিপাত করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে কোন্ কোন্ তথ্য জানলাম সেই সেই তথ্যগুলির দিকে নয়,—যে যে তথ্যগুলি জেনে, পড়ে, কাজে লাগিয়ে যে উপসংহারে এসে উপস্থিত হলাম সেই উপসংহারের দিকেই। সিদ্ধান্তের প্রধান বিষয়গুলির দিকে এর লক্ষ্য বলেই এই পদ্ধতিতে খুঁটিনাটি তথ্যের ভারে শিক্ষার্থীর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে না। সেই দিক থেকে বিচার করে দেখলে স্বভাবতই আমাদের মনে হবে যে 'য়ুনিট' একটি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ধারণা। এই ধারণাটি আসবে কোনো বিষয় বা সমস্যার অধ্যয়নে বা সমাধানে। এই অধ্যয়ন বা সমাধান কার্য্য সম্পাদিত হয়ে থাকে কতকগুলি সুনির্ব্বাচিত তথ্যের বা কাজের উপস্থাপন করে, সেগুলিকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে। আর এগুলি জেনে শুনে, সম্পাদন করে নির্দ্দিষ্ট ধারণাটি আমরা পেয়ে থাকি আহৃত তথ্যতাবাস ও অভিজ্ঞতার সুবিন্যস্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। কিন্তু এটি তো হচ্ছে "থিওরীর" কথা। বাস্তবে আমরা দেখি যে "য়ুনিট" হচ্ছে এমন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পরপর বিন্যস্ত, সম্পর্কযুক্ত, ঐক্যবদ্ধ অভিজ্ঞতা বা কাজ (activity) যে গুলির মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীর উক্ত নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ হবে। বলা বাহুল্য যে এই "activity" গুলির মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত

আসবে সেটি প্রতিষ্ঠিত হবে ঐ "activity" গুলির মূল নীতির নির্দ্ধারণে, তাদের সামান্যীকরণে (generalisation), পরস্পর সম্পর্কের বিশ্লেষণে এবং সেগুলির মধ্যে থেকে সিদ্ধান্তকৃত একটি সন্দেহ হীন সুস্পষ্ট ধারণায়। একটি উদাহরণ নিন,—"যুদ্ধের মত্ততা থাকলেও পৃথিবীর মানুষ শান্তি চেয়েছে"। এটিকে যদি একটি "য়ুনিট" নেন তো দেখা যাবে যে কতকগুলি পরপর সংযুক্ত ঐক্যবদ্ধ, নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞতারাজির মাধ্যমে যে উপসংহারে আসা যাবে, সেই উপসংহারই হচ্ছে য়ুনিটটির মূল ধারণা। আর এই মূল ধারণাটিই শিক্ষার্থীর মনে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে উক্ত 'য়ুনিট'টির সার্থক পরিসমাপ্তিতে। এমনি তরো আরো দুএকটি 'য়ুনিটের' নাম ইতিহাস পঠনপাঠনের জন্যে করা যেতে পারে। যেমন, —"মানুষের পোষাক পরিচ্ছদ যে মানুষকে শুধু শীতাতপ থেকে রক্ষা করেছে তাই নয়, বিভিন্ন যুগে সেগুলি মানুষের শিল্পী মনের ও পরিচয় দিয়েছে"। "মানুষের গৃহনির্ম্মান পদ্ধতির মধ্যে মানুষের সমাজ প্রগতির সাক্ষ্য বিদ্যমান"। "মানুষের আমোদ প্রমোদ তার নিত্যকালের সঙ্গী"। "প্রধান প্রধান ধর্ম্মের মূল কথা সমাজ কল্যাণকামীর অন্তরের কথা" প্রভৃতি।

শ্রেণীকক্ষে পঠনপাঠনে 'য়ুনিট'গুলি শিক্ষার্থীর বয়েস, মনীষার বিকাশ এবং পরিবেশ প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় সাধারণতঃ "য়ুনিটের" বিস্তৃতিতে এবং গভীরতায় (breadth & intensity)। কোনো "য়ুনিট"। কোনো বিষয়ের অনেকটা নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলে স্বাভাবিক কারণেই সেটা হয়ে পড়বে অগভীর। তার ব্যাপ্তির আধিক্য ঘটবে। তাই শিক্ষার্থীর বয়োবৃদ্ধির এবং মনীষার বিকাশের সাথে সাথে "য়ুনিটের" ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি কমতে থাকবে, অর্থাৎ "য়ুনিট" আর নিজের মধ্যে বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি অন্তর্ভুক্ত করবে না। তখন তার গভীরতা বাড়তে থাকবে। তাই 'য়ুনিট' নির্ব্বাচন করবার সময় এইদিকে লক্ষ রাখতে হবে। "য়ুনিটটি" স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। য়ুনিটের একটি মূল সিদ্ধান্ত থাকবে। যেন য়ুনিটটি বেশী বড় না হয়। "জুনিয়র হাইস্কুলে" য়ুনিটটি অন্ততঃ দু'সপ্তাহের মধ্যে যেন শেষ হয়। আর "সিনিয়র হাইস্কুলে" বড়ো জোর চার সপ্তাহ চলতে পারে এর পঠনপাঠন। য়ুনিটের ভাবটি পরিপূর্ণ বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করাই ভাল, কারণ এতে একটি সম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশ করা যায়। আর এই সম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশ করবার যৌক্তিকতাও অনস্বীকার্য্য। যে যে বিষয়বস্তু ও তথ্যগুলি য়ুনিটটির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হবে,

মূল সিদ্ধান্তের উপর আলোক-সম্পাত করবার যোগ্যতা সে গুলির থাকবে অর্থাৎ বিষয়বস্তুগুলি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করলে সিদ্ধান্ত হয়ে উঠবে সহজ। সন্নিবিষ্ট তথ্যগুলি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার দিকেই লক্ষ্য থাকবে সমধিক। তার অর্থ এই যে এখানে বিষয়বস্তুও তথ্যগুলি অপ্রধান, সিদ্ধান্তই প্রধান। বিষয়বস্তু বা তথ্যতাবাসগুলি সিদ্ধান্তে আসবার উপায় মাত্র। নানা বিষয়বস্তু এবং তৎসম্পর্কিত তথ্যের ভিড়ে অসহায় শিক্ষার্থী যাতে সিদ্ধান্তে পৌছানর পথ হারিয়ে না ফেলে তার জন্যেই এই সতর্কতা।

"য়ুনিট" কি এবং এটি নির্বাচন করবার সময় কি কি বিষয় আমাদের লক্ষ রাখতে হবে এই আলোচনার পর একটি "য়ুনিট" কিভাবে বিন্যস্ত হবে সেই কথাই আমরা আলোচনা করবো। "য়ুনিটের" এই যথাযথ বিন্যাসকেই (Organisation) শিক্ষকমশায়ের পাঠপরিকল্পনা বলা যেতে পারে।

নির্ব্বাচন পর্ব সমাধা করে একটি য়ুনিটের বিন্যাস সাধন করতে গেলে,—

১। প্রথমে আমাদের "য়ুনিটের" বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্য (Theme) যেটি সেটি লিখতে হবে।

২। তারপর যেটি য়ুনিটের প্রধান ধারণা তার স্থান হবে (Major Concept).

৩। এরপর এই "য়ুনিটটির" দ্বারা কি উদ্দেশ্য সংসাধিত হবে সেগুলি দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্যগুলি (objectives) শিক্ষকমশায় স্থান, কাল, পাত্র, বিষয় প্রভৃতি বিচার করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারেন। যথা—

(ক) সাধারণ উদ্দেশ্য।

(খ) বিশেষ উদ্দেশ্য—প্রভৃতি।

৪। উদ্দেশ্য নির্ণীত হবার পর কিছু সমস্যা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। প্রসঙ্গ বজায় রেখে এই সমস্যার রূপ একাধিক হতে পারে।

৫। সমস্যা উপস্থাপিত হবার পর শিক্ষার্থীদের কাজের কথা থাকবে। শিক্ষকমশায় যে যে কাজের মধ্যে দিয়ে "য়ুনিট"টির পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাতে চান, য়ুনিটটি উপস্থাপনের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সেগুলির উল্লেখ থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে,—

(ক) "Guide sheet"এর প্রশ্নের উত্তর করা। (খ) য়ুনিট সম্পর্কে

চার্ট, ম্যাপ, ডায়াগ্রাম প্রভৃতি প্রস্তুত করা। (গ) কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বা মূল উপাদান থেকে আবশ্যকীয় তথ্য আহরণ করা। (ঘ) য়ুনিটটির কোনো এক বিশেষ স্তরে কোনো অত্যন্ত আবশ্যকীয় ধারণার উপর বর্তমান দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ মতামত লেখা প্রভৃতি। (ঙ) শ্রেণী-কক্ষে শিক্ষকমশায় দ্বারা পরিচালিত-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা। (চ) য়ুনিট সংশ্লিষ্ট এবং শিক্ষক মশায় নির্দ্দিষ্ট তথ্যগুলির আহরণ করা, স্বাধীনভাবে অনুধাবন করা, নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা—প্রভৃতি।

৬। শিক্ষার্থীদের কাজের পরই প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষকমশায়ের করণীয়-গুলি এই পরিকল্পনায় স্থান পাবে। শিক্ষক মশায়ের কাজ হবে নানা ধরনের। শিক্ষার্থীদের কাজ ও শিক্ষকমশায়ের করণীয়, য়ুনিটের রচনাকারীর দৃষ্টিভঙ্গির উপরই সাধারণভাবে নির্ভর করে। শিক্ষকমশায়ের কয়েকটি করণীয় বিষয়ের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে উল্লেখ করি।

(ক) Guide sheet ঠিক মত তৈরী করা এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দ্দেশ দেওয়া। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সুবিধে অসুবিধের দিকে দৃষ্টি রেখে Guide sheet রচিত হলে ফল যে ভালই হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। (খ) শ্রেণীকক্ষে য়ুনিট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা পরিচালনা করা। (গ) য়ুনিট সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর মূল উপাদানগুলি সংগ্রহ করা এবং শিক্ষার্থীদের কাছে সেগুলি উপস্থাপিত করা। (ঘ) শিক্ষার্থীদের কাজের তত্ত্বাবধান করা। (ঙ) শ্রেণী কক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের পড়তে উৎসাহিত করা এবং সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া। (চ) য়ুনিট সংশ্লিষ্ট তথ্য আহরণ করবার জন্যে বিশেষ Reference ঠিক করে দেওয়া। (ছ) শিক্ষার্থীদের কাজের অগ্রগতি এবং ফলাফল পরীক্ষা করা।

৭। শিক্ষক মশায়ের করণীয় কি কি তার উল্লেখের পর যে যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে য়ুনিটটির পর্যালোচনা হবে তার ক্রমিক উল্লেখ ও তৎসংশ্লিষ্ট "Reference" প্রভৃতির বিষয় আসবে। এগুলিরও নিম্নানুরূপ শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। যথা :—(ক) পাঠ্যপুস্তক, (খ) Additional Reference, (গ) অবিকৃত মূল উপাদান প্রভৃতি।

"য়ুনিটের" বিন্যাস (Organisation) সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করে আমরা দেখবো এই বিন্যস্ত য়ুনিটটি কিভাবে শ্রেণীকক্ষে পঠনপাঠনের কাজে লাগানো হয়ে থাকে,—অর্থাৎ য়ুনিট পদ্ধতি হাতে কলমে শ্রেণীকক্ষে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আমরা জানি যে এ-পদ্ধতিটির পাঁচটি ধাপ আছে। প্রথম

ধাপটি Exploration বা অনুসন্ধান। এই ধাপে য়ুনিট সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের কতটুকু জানা আছে সেটি শিক্ষক মশায় অনুসন্ধান করে জেনে নেবেন। আর সেটি জানতে পারলেই পঠনপাঠন কোথাথেকে, কিভাবে আরম্ভ করা-হবে সেটি শিক্ষকমশায় ঠিক করে নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মনটিও পাঠাভিমুখী হয়ে উঠবে। এই অনুসন্ধান কাজ করা যেতে পারে একটি বিশেষভাবে রচিত Test প্রয়োগ করে কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সুনির্ব্বাচিত ও যথাযথ প্রশ্নের মাধ্যমে। এই কাজটির জন্যে খুব একটা ব্যাপকভাবে এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্নকরার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র মূল 'য়ুনিট' সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার উপযোগী হবে এই প্রশ্নগুলি।

এই ধরনের অনুসন্ধানের পরই হবে য়ুনিটটির উপস্থাপন। শিক্ষকমশায় অল্পকথায় সুসংবদ্ধভাবে যথাসম্ভব মনোজ্ঞ করে য়ুনিটটির মূল ধারণার একটি সম্পূর্ণ এবং সুসংবদ্ধ মৌখিক বিবরণ দেবেন। বিবরণটি কোনক্রমেই আংশিক হবেনা বা খণ্ড খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তথ্যের সমষ্টিও হবেনা। এটি হবে ধারাবাহিক, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সম্পূর্ণ, যাতে করে য়ুনিটটি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের একটি মোটামুটি, সামগ্রিক ধারণা সহজ ও সম্ভব হয়। এই বিবরণ দেবার পরই য়ুনিটটির সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা হয়েছে সেটি দেখবার জন্যে একটি লিখিত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective test) নিতে হবে। পরীক্ষা বেশ ভালভাবে করতে হবে। খাতা পরীক্ষা করতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। যে সব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য্য হবে নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান আহরণ করতে, আবশ্যক হলে দুবার তিনবারও তাদের ঐ পরীক্ষাটি করতে হবে। য়ুনিটটির এই মোটামুটি জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই পরের স্তরগুলির কাজ চলবে, তাই য়ুনিট সম্পর্কে এই মূলধারণাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উপস্থাপনের পরই আসবে উপস্থাপন স্তরে লব্ধজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন (Assimilation)। উপস্থাপনে শিক্ষার্থী য়ুনিট সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করেছে তাকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে য়ুনিট সংশ্লিষ্ট তথ্যনিচয়ের আহরণ, অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা হয় এই স্তরে। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভিত্তি পাকা করবার জন্যে যে যে কাজ শিক্ষকমশায় আবশ্যকীয় বলে বিবেচনা করবেন সেইগুলি সবই করবার নির্দ্দেশ দেবেন তিনি। শুধু নির্দ্দেশই নয় কাজগুলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করবার ভারও তাঁর উপরে। "Study sheet" শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরিত হবে। এই sheet গুলিতে "উপস্থাপনে"

সংস্থাপিত বিষয়টির বিবরণ থাকবে। আর থাকবে সেই সম্পর্কে জানবার, পড়বার জন্যে—Reference, মূল উপাদানগুলির উল্লেখ ও "য়ুনিট" সংশ্লিষ্ট অংশগুলি পড়বার নির্দ্দেশ। য়ুনিটের সাথে সম্পর্ক যুক্ত কোনো "প্রোজেক্ট", সমস্যা (Problem) প্রভৃতিও থাকবে। শিক্ষার্থীর সাহায্যকল্পে তর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা, ছবি, মডেল,—যে কোনো রকমের Audiovisual aids,—বিষয়-বস্তুর সাথে বাস্তব সংযোগ সাধনের জন্যে যদি প্রয়োজন হয় শিক্ষাভ্রমণ, নাটক প্রভৃতির সাহায্য শিক্ষকমশায় নেবেন। বলাবাহুল্য যে সমগ্র 'য়ুনিট'-টির জন্যে যে সময় নির্ধারিত করা হয়েছে তার অধিকাংশই এইস্তরে ব্যয়িত হয়ে যায়। অভিজ্ঞ শিক্ষক এইস্তরে কিকি করণীয় Guide—sheet-এ পরপর যথাযথ ভাবে সাজিয়ে নেন। এই স্তরের শেষে বিষয়টি শিক্ষার্থী কতটুকু আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে তা দেখবার জন্যে আরও একটি test এর ব্যবস্থা আছে। এই পরীক্ষায় তথ্যের সঙ্কলন সমাহার অপেক্ষা তথ্যের সংকলন সমাহার লব্ধ জ্ঞানের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে।

এর পরের স্তরে হয় আহৃত জ্ঞানের বিন্যাসসাধন (Organisation) এর আগের স্তরে শিক্ষার্থী বহু তথ্যের সন্ধান পেয়েছে, ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছে, বহুতথ্য আহরণ করেছে। এখন প্রয়োজন য়ুনিটের মূল যে ধারণা (Theme) সেটিকে সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে নানা ধরনের তথ্য থেকে আহৃত—জ্ঞানের সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক বিন্যাস, য়ুনিট সংশ্লিষ্ট তথ্যের উপর ভিত্তি করে য়ুনিটের অন্তর্ভুক্ত মূল ধারণা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত, সু-বিন্যস্ত সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন। শিক্ষকমশায়ের নেতৃত্বেই এই কাজটি সমাধা হয়ে থাকে।

শেষের সোপানে থাকে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা (Recitation)। য়ুনিটটির পর্যালোচনা শুরু করে এই সোপানের পূর্ব্বস্তর পর্য্যন্ত যে জ্ঞান শিক্ষার্থী আহরণ করেছে য়ুনিটটির মূল ধারণার সাথে সঙ্গতি ও প্রসঙ্গ বজায় রেখে তার বর্ণনা দিতেহবে শ্রেণীকক্ষে। যদি প্রত্যেকের পক্ষে সময় অভাবে সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে য়ুনিটের যে কোন অংশ সংশ্লিষ্ট-বিষয় সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে বলতে হবে শিক্ষার্থীদের। এই বর্ণনা করার কাজে বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের স্পষ্টতা অস্পষ্টতা ধরা পড়ে, স্বচ্ছভাবে চিন্তা করার শক্তি বাড়ে, কোনো বিষয়বস্তুকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা হয়।

য়ুনিটের যেমন নানা ধরনের ধারণা (Theme) থাকতে পারে তেমনি য়ুনিট পদ্ধতির বিভিন্ন প্রয়োগ কৌশল বা প্রণালী থাকতে পারে। কাজে

কাজেই আমরা এখানে "য়ুনিট" পদ্ধতির খুব সংক্ষিপ্তভাবে যে আলোচনা করেছি এছাড়া ভিন্ন ধরনের প্রয়োগ পদ্ধতিও থাকতে পারে। তবে একথা বলা যায় যে য়ুনিট পদ্ধতির মূলনীতি, তার পঞ্চসোপানের উদ্দেশ্য এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতি মোটামুটি এই।

য়ুনিট পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সম্মত মূলনীতি-গুলি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। প্রথম সোপানে আয়োজন অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠাভিমুখী করবার যে ব্যবস্থা, তার মধ্যে Thorndike সাহেবের শিক্ষানীতিগুলির (Laws of learning) যে প্রথমনীতি (প্রস্তুতি (Readiness) সেটি হয়। য়ুনিটটির উপস্থাপন প্রসঙ্গে য়ুনিটটির সম্বন্ধে যে একটি সামগ্রিক ধারণা দেওয়া হয়, সেটি জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় করবার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। য়ুনিটটির একটি সামগ্রিক ধারণা শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করবার মধ্যে gestalt Psychology-র ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। তৃতীয় সোপানে অর্থাৎ জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় করবার স্তরে (assimilation) নানা ভাবে য়ুনিট সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলির অনুধাবন করবার প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে Thorndike সাহেবের শিক্ষানীতির আরেকটি নীতি, "অভ্যাস" (Exercise) আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আর এরপর য়ুনিটটির ধারণা যথাযথ হয়েছে কিনা, যেটি mastery test নিয়ে বোঝা যায়, পরীক্ষা করে দেখবার সময় Thorndike সাহেবের শিক্ষানীতির (Laws of learning এর) ফল বা "Effect" এর কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

য়ুনিট পদ্ধতির ভালোদিক এবং মন্দদিক আছে। সেই দুটি দিক আলোচনা করে আমরা য়ুনিট পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনার শেষ করবো।

য়ুনিট পদ্ধতির সুবিধে ঃ—

যে উপায়ে উদ্দেশ্য লাভ করা হয় সেই উপায়ের উপর জোর না দিয়ে উদ্দেশ্যের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয় য়ুনিট পদ্ধতিতে। বস্তুতঃ আহৃত তথ্যগুলি এখানে গৌণ। তথ্যগুলি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্তে আসা হয় মাত্র। সিদ্ধান্তই এখানে প্রধান। সিদ্ধান্ত প্রধান বলে তথ্য সঙ্কলন-সমাহারের পাণ্ডিত্যা-ভিমান, এখানে থাকেনা, খুঁটিনাটি তথ্য প্রমাণের বোঝা এনে শিক্ষার্থীর স্মৃতি ভারাক্রান্ত ও পীড়িত করেনা এটি—এবং মূল কথাও হারিয়ে যায়না এখানে।

এই পদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর উৎসাহ উদ্দীপনা ক্রমে ক্রমে আসে এবং শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে। একটি সম্পূর্ণ ধারণাকে নানা তথ্য যুক্তির

সাহায্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার, নানা ভাবে বিশ্লেষণ বিচার করে তার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আহরণ করবার মধ্যে যে আনন্দের এবং উৎসাহের সঙ্কেত আছে তা যে কোনো বিষয়ের পঠন-পাঠনেই বিশেষভাবে ফলপ্রসূ।

সমগ্র য়ুনিটটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় বলে শিক্ষার্থীরা কোন-রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেনা। শিক্ষার্থীদের কি করতে হবে, কি পড়তে হবে, কোন ধাপের পর কোন ধাপে পা দিয়ে তারা গন্তব্যে এগিয়ে যাবে এটি তাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে জানানো থাকে বলেই তারা কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচের বা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয় না।

য়ুনিট উপস্থাপন করার পর থেকে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি য়ুনিটের পঠন-পাঠনের পরিসমাপ্তি ঘটে তার প্রতিটি পদক্ষেপে শিক্ষার্থী থাকে নিঃসংশয়রূপে কর্ম্মচঞ্চল, অনেক সময় স্বয়ংক্রিয়। তাই এই পদ্ধতির মধ্যে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া এই পদ্ধতির অনুসরণে প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজ নিজ ক্ষমতা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী ফল লাভে সক্ষম হয়। আর সেই জন্যেই ভাল ছাত্রের এবং সাধারণ ছাত্রের—উভয়ের পক্ষেই ভাল ফল পাওয়া যায় এই পদ্ধতির অনুসরণে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য (Individual difference) তার উপর নজর দেবার সুযোগ এই পদ্ধতিতে আছে বলেই এটি মনোবিজ্ঞান সম্মত।

শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর বেশী জোর দিয়ে, তাদের বিশেষভাবে কর্ম্মচঞ্চল করে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকমশায়ের মৌখিক বর্ণনা দেবার কাজ অনেক কমিয়ে দেয় বলেই এ পদ্ধতিতে শিক্ষকমশায়ের করণীয় বা দায়িত্ব কিছু মাত্র কমেনা। তাঁর করণীয় প্রায় সবকিছুই, তবে অপ্রত্যক্ষভাবে। এতে শিক্ষকের দায়-দায়িত্ব বরঞ্চ আরো বেড়ে যায়। য়ুনিটের পরিকল্পনায়, এটিকে সার্থক করে তোলবার চিন্তায়, নানা তথ্যের সঙ্কলন করবার উপায় হিসেবে Reference-এর সংগ্রহে, সমস্যার উত্থাপন-সমাধানে, নানা ধরনের প্রশ্ন সম্বলিত Test রচনায়, তাঁর আসল কৃতিত্ব প্রদর্শন করবার অধিকতর সুযোগ তিনি পান। যোগ্যতানুযায়ী শিক্ষার্থীর অধিকতর মঙ্গল করতে তিনি পারেন।

নানাধরনের কাজ এই পদ্ধতির মধ্যে থাকে বলেই এর মধ্যে একঘেয়েমী আসেনা। গতানুগতিকতার বদলে বৈচিত্র্য এর প্রতিপদে মূর্ত্ত হয়ে উঠে এবং সেই জন্যেই পঠন-পাঠন কার্য্য কর্ম্মচঞ্চলই শুধু হয় না সেটি প্রাণচঞ্চলও হয়ে ডঠে।

এটি শ্রেণী কক্ষে প্রয়োগ করতে অসুবিধে হয় না। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর

ব্যক্তিগত সুবিধে অসুবিধে অনুসারে পৃথক উপায় অবলম্বন করবার অবকাশও আছে।

য়ুনিট পদ্ধতির অসুবিধে :—

এটি যে নিখুঁত এবং এর কিছুই ত্রুটি বিচ্যুতি নেই এমন কথা বলা যায় না। একথা অবশ্য কোনো পদ্ধতির সম্বন্ধেই বলা যায় না।

এই পদ্ধতি সবরকম বিষয়ের পঠন-পাঠনে প্রয়োগ করার অসুবিধে আছে। Guide sheet ব্যবহার করায় অনেক সময় এক ঘেয়েমী এবং গতানুগতিকতা এসে যায় এর মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রে এই 'য়ুনিট' ক্রমশঃ একটি ফরম্যুলায় পর্য্যবসিত হয়ে যেতে দেখা যায়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের স্বকীয় বিচারযুক্ত নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অবকাশ অল্প। "য়ুনিটের" উপস্থাপনের সময় শিক্ষক মশায় যে ধারণা এবং সিদ্ধান্ত ছাত্রদের সামনে উপস্থাপিত করেন সেইটিই তো "য়ুনিট"টির সিদ্ধান্ত, এবং সেটি পূর্ব্ব থেকেই স্থির-করা। সেখানে নতুনত্ব কোথা ? স্বাধীন চিন্তার অবকাশ সেথা নাই। "য়ুনিট"টির পঠন-পাঠনে যতো কিছু নতুন তথ্যের সংশ্লেষই হোক বা ভিন্নতর তথ্যের আহরণ ও বিন্যাসই হোক "য়ুনিট"এর Theme কে কেন্দ্র করেই সেগুলির রচনা ও বিন্যাস হবে। Organisation বা বিন্যাস সাধনের সোপানে শিক্ষক মশায়ের প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া আর বিন্যস্ত অন্য কি হবে শিক্ষার্থীদের আহৃত জ্ঞানের মাধ্যমে ? শিক্ষক মশায়ের মতের চাপে এবং "য়ুনিটের" মূল ভাবের (Theme-এর) ভারে শিক্ষার্থীদের স্বকীয় মতামত তলিয়ে যাবে অতল গভীরে। এমনিতরো নানা অসুবিধে আছে এই পদ্ধতিটির।

অসুবিধে থাকলেও এই অসুবিধেগুলি দূর করবার নানা উপায় ও আছে। আন্তরিক প্রচেষ্টায় কি না হয়। যে অসুবিধেগুলি দূর করা সম্ভব সেগুলি আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিশ্চয়ই দূর করা যায়। বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করবার বিশেষভাবে অসুবিধে আছে। আমাদের স্কুলগুলির লাইব্রেরীতে উপযুক্ত বই এবং উপযুক্ত-সংখ্যক বই-এর অভাব আছে। শিক্ষক মশায়দের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবার মত পেশাগত প্রস্তুতি ও কম। "য়ুনিট" রচনা করা, study sheet তৈরীকরা প্রভৃতি খুব সহজ কাজ নয়। এগুলি শিক্ষকমশায়ের দায়িত্ব আর কাজ, বিশেষ করে লেখার আর পরীক্ষা করার কাজ, অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

বিন্যাস সাধন করবে শিক্ষার্থীরা। আহৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সমাধানের বা উপসংহারের একটি খসড়া রচনা করবে শিক্ষার্থীরা। সেটি তারপর আলোচিত হবে শ্রেণী কক্ষে। শিক্ষার্থীরা সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে। সেই আলোচনা পরিচালনা করবেন শিক্ষকমশায়। অনেক সময় লিখিত "রিপোর্টের" আকারেও সিদ্ধান্তটি পড়া হয়ে থাকে শ্রেণীকক্ষে। এই সব "রিপোর্টের" সমালোচনা করবে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকমশায় পরিচালনা করবেন তাঁদের। প্রয়োজন হলে সিদ্ধান্তটির মধ্যে ভুল থাকলে তা দেখিয়ে দেবেন তিনি। যতক্ষণ না সিদ্ধান্তটি যুক্তিশুদ্ধ এবং গ্রহণ-যোগ্য হয় ততক্ষণ তথ্যের আহরণ, বিন্যাস এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে "রিপোর্ট" রচনা ও আলোচনা চলবে।

"প্রবলেম" বা সমস্যাসমাধান পদ্ধতির কতকগুলি ভালদিক সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইতিহাস পঠন-পাঠনের একটি বড় উদ্দেশ্য এই পদ্ধতির মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করবার অবকাশ পায়। শিক্ষার্থীর মনকে তত্ত্বান্বেষী ও তথ্যান্বেষী করে তার মনের নৈর্ব্যক্তিক কাঠামো রচনায় এর অবদান অনস্বীকার্য্য। বহু তথ্যের এবং অনেক সময় পরস্পর বিরোধী তথ্যের মধ্যেথেকে যুক্তি ও বিচারের দুর্গম পথ ধরে ঠিক ঠিক সত্যে উপনীত হতে এটি শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে, তাই ছাত্র অবস্থা থেকেই শিক্ষার্থীর মনটি "critical" হয়ে উঠবার সুযোগ লাভ করে। লক্ষ্যহীনভাবে কেবল ইতিহাসের কতকগুলি বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না আমাদের ইতিহাস পাঠ, এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে। উপরন্তু কোনো একটি লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে ধারাবাহিক চেষ্টার মধ্যে গতানুগতিকতাহীন বৈচিত্র্য ও যেমন থাকে তেমনি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যে যে উদ্যম তাও এখানে সুস্পষ্ট। যুক্তিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে শিক্ষার্থীর মনে তৃপ্তির সাথে সাফল্যের এবং সন্তুষ্টির সাথে আত্মবিশ্বাস জাগে। এই পদ্ধতির অনুসরণে শিক্ষার্থীর যা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। শিক্ষার্থী তার জানা জিনিসের সাহায্যেই না-জানা জিনিস জানে। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা কতকগুলি তথ্যের সংগ্রহে ভারাক্রান্ত করেনা তার স্মৃতিকে, পরন্তু তার অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে, সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক সংযোগে, সমস্যার সমাধান এনে দেয় যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। এই সিদ্ধান্তটি শিক্ষার্থীর নিজ অভিজ্ঞতার সাথে একান্ত ভাবে যুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া শিক্ষার্থীর মনীষার বিকাশের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে

এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সুবিধে অসুবিধের দিকে লক্ষ রেখে সব অবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে পারা যায় সমস্যাটিকে। সমস্যা নির্ব্বাচন করবার সময় এদিকে একটু লক্ষ রাখলেই সেটি সম্ভব হবে। এ পদ্ধতি শ্রেণী কক্ষে প্রয়োগ করতে অসুবিধে হয় না। যে সব শিক্ষকমশায় শিক্ষার্থীদের নিজেদের করবার জন্য সুদীর্ঘ কাজ (assignment) দেবার পক্ষপাতী তাঁরা এই পদ্ধতির মধ্যে তাঁদের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত দেখতে পাবেন। কাজ শিক্ষার্থীদের নিজেদের করতে হয় বলেই তাদের মধ্যে আত্ম-নির্ভরতা, দায়িত্ববোধ এবং আন্তরিকতা প্রভৃতি অতি সহজেই আসে। শিক্ষকের নির্ধারিত কাজ দেওয়া নেওয়ার পরিবর্ত্তে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহযোগিতায়একটি হৃদ্যতাপূর্ণ মধুর সম্পর্কের বিচিত্র পরিবেশ এই পদ্ধতিটি গড়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে।

ভালো দিক ছাড়া মন্দদিকও এই পদ্ধতিটির কিছু আছে। একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে এই পদ্ধতির অনুসরণে মননশীলতার উপরই জোর পড়ে বেশী। পদ্ধতিটি প্রধানতঃ মনীষা সংশ্লিষ্ট বলেই শিক্ষার্থীদের বাস্তব বা হাতে কলমে কাজের দিকে ঝোঁকটা একটু কম থাকে। মনন শীলতার এই প্রাধান্য থাকে বলেই তথ্যের সংকলনে, বিন্যাসে, উপস্থাপনে এবং উপসংহারে এমন একটি পাণ্ডিত্য অনুগামী পরিবেশ সৃষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে যেখানে কতকগুলি মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থী ছাড়া সাধারণ শিক্ষার্থীদের খুব একটা বিশেষ লাভ হয় না। যথাসময়ে শিক্ষকমশায় এদিকে দৃষ্টি না দিলে বা দিতে পারলে এই পদ্ধতি অনুসরণে ফল ভাল হয় না। অনেক সময় শ্রেণীর মান বা শিক্ষার্থীদের মনীষার বিকাশের গড়ের একটি মাপকাঠি ঠিক না করতে পারলে সমস্যা নির্ব্বাচন করবার সময় সমস্যাটি হয় কঠিন হয়ে পড়ে, নয়তো সহজ হয়ে যায়। সমস্যা কঠিন হলে অসুবিধে, সহজ হওয়া ও অবাঞ্ছনীয়। সমস্যার কাঠিন্য শিক্ষার্থীর মনে হতাশা, নিরুৎসাহ এবং ভগ্নোদ্যম এনে দেয়, আর লঘুতা আনে সহজ সাফল্য, বৃথা গর্ব্ব, মিথ্যা আত্মতুষ্টি। সমস্যা-সামাধানের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ইতিহাসের ধারাবাহিক জ্ঞান সব সময়ে যথোপযুক্ত আহরণ করা যায় না। সমস্যার সংখ্যার উপর তা নির্ভরশীল। তাই সুযোগও সেথা সীমিত। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে আধৃত সব ধরনের তথ্য এই পদ্ধতির প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের শিখতে সাহায্য করা সম্ভব হয়ে উঠেনা কারণ সব ধরনের সমস্যা নির্ব্বাচন করে তার সমাধান সব সময় বাস্তবে কার্যকারী করা যায় না তাই ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধ ভাবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে নির্ব্বাচিত ও বিন্যস্ত ঐতিহাসিক তথ্যগুলির সার্থক পঠন-পাঠনের দিকে লক্ষ রাখা এ পদ্ধতির পক্ষে সম্ভব নয়।

এই পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ কতকগুলি সমস্যার সম্পর্কযুক্ত-তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় মাত্র।

প্রোজেক্ট :—

প্রোজেক্ট সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা এখানে করবোনা। শ্রেণী-কক্ষে প্রোজেক্ট কিভাবে নেওয়া হয় এবং কিভাবে তাকে কাজে লাগাতে পারা যায় শুধু তার মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

প্রোজেক্ট বলতে সাধারণতঃ আমরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও সুসংবদ্ধ কাজ-কেই (activity) বুঝি। এ কাজ সম্পাদন করার মধ্যে দিয়ে কোনো জিনিস শেখা যাবে, কোনো অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করা যাবে, কোনো জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। শিক্ষার্থী নিজে হাতে এই ধরনের কাজ করবে আর এই কাজ করার মাধ্যমেই হবে তার শিক্ষা। কাজ করার মাধ্যমে এখানে শিক্ষা লাভ হয় বলেই এটি বাস্তব বর্জিত নয়। পুঁথির পাতায় যে সব কথা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান প্রভৃতি লেখা থাকে সেগুলিকে পড়লেই তাদের সাথে বাস্তব সংযোগ শিক্ষার্থীর হয় না। কিন্তু সেগুলি হাতে নাতে করে, তার ফলাফল লক্ষ করে, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সেগুলি নিজেরাই সংযুক্ত করে যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থী লাভ করে থাকে শিক্ষা বিজ্ঞানে তার মূল্য অনেক।

প্রোজেক্ট নানা জিনিসের এবং নানা ধরনের হতে পারে। কোনো জিনিষ লেখার, আঁকার, তৈরি করার, সংগ্রহ করার, নাটক রচনা ও অভিনয় করার, কোনো ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানে ভ্রমণে যাবার এমনি নানা বিষয় সম্পর্কে প্রোজেক্ট নেওয়া যেতে পারে। বিষয়বস্তু ও কর্ম্মপন্থার প্রকারভেদে প্রোজেক্ট যেমন বহুধরনের হতে পারে তেমনি বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে প্রোজেক্ট সংশ্লিষ্ট কাজের (Activity) স্থায়িত্ব বা মেয়াদ ও কমবেশী হতে পারে।

প্রোজেক্ট নির্ব্বাচন করাটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই নির্ব্বাচনের উপরই প্রোজেক্টের সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করে অনেকখানি। প্রোজেক্ট নির্ব্বাচন করাটা অবশ্য নির্ভর করে স্থান কাল পাত্রের উপর। প্রোজেক্টকে কাজে পরিণত করবার সুবিধে অসুবিধে, শিক্ষার্থীদের মনীষার মান, স্কুলের পরিবেশ এবং আরও আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলি এই প্রোজেক্টের উপর সমধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে সেগুলি সবই প্রোজেক্ট নির্ব্বাচন করবার সময় বিবেচনা করতে হবে। নির্ব্বাচন করার কাজটা শিক্ষার্থীরা নিজেরা করলেই সব থেকে ভাল হয়। শিক্ষকমশায়কে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যে

শিক্ষার্থীরা ঠিক, যথাযথ প্রোজেক্টটি নির্ব্বাচিত করতে সক্ষম হবে। শিক্ষকমশায় শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রোজেক্টটি নির্ব্বাচন করিয়ে নেবেন। শিক্ষকমশায় অপ্রত্যক্ষভাবে প্রোজেক্টের সব স্তরেই থাকবেন। তিনি ছাড়া প্রোজেক্ট হবে কি করে?

শুরু থেকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রোজেক্টকে আমরা কয়েকটি ধাপের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হতে দেখি। যথা, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়ন বা সিদ্ধান্তের বিচার। এই নানা স্তরের মধ্যে প্রোজেক্ট বহুভাবে ব্যাপক এবং তাকে বহুস্তরে বহুমুখী কর্ম্মতৎপরতায় বিশ্লেষিত করা যেতে পারে। কিন্তু প্রোজেক্ট সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা করে নেবার জন্যে এর কয়েকটি স্তরের (যেগুলিকে প্রধান স্তর বলা যেতে পারে) সম্বন্ধে জানা থাকলে সুবিধে হবে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই চোখে পড়বে প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অনেক ধরনের হতে পারে। অনেক ধরনের উদ্দেশ্য থেকে স্থির উদ্দেশ্য বেছে নিতে হবে। উদ্দেশ্য স্থির করার পর কি করে সেটি সম্পাদন করা যায় সে সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা ঠিক করে নিতে হবে। পরিকল্পনাটি যথাসম্ভব নিখুঁত ও বাস্তবানুগ হওয়ার প্রয়োজন আছে। পরিকল্পনার পর কার্য্যসম্পাদন, পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ। কাজ শুরু করে অবস্থা বুঝে যদি পরিকল্পনার মধ্যে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটা করতে হবে, অনেক সময় সেটা বাঞ্ছনীয়। তবে পরিবর্ত্তন করবার কারণটি বা কারণগুলি যথাযথ ভাবে বুঝে নিয়ে লিপিবদ্ধ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। সব শেষের স্তরে প্রোজেক্টটির মূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন স্তরে শিক্ষার্থীদের পূর্ব্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে যতটুকু নতুন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হয়েছে তা নির্দ্ধারণ করতে হবে। প্রোজেক্টের বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের ঔৎসুক্য, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন ও নির্ণয় করতে হবে। দৈহিক কাজের সাথে প্রজেক্টটি সংশ্লিষ্ট থাকলে সেই কাজের কুশলতা কিছু বেড়েছে কিনা সেটাও খুঁজে বের করতে হবে। বলা বাহুল্য যে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সবই শিক্ষার্থীদের দ্বারা করাবার চেষ্টা করতে হবে।

ইতিহাস পঠন-পাঠনের "টিচিং এইড"।

(১)

"টিচিং এইড" এর সাধারণ ধারণা।

ইতিহাস পঠন-পাঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট "Teaching aids" গুলির বিষয় আলোচনা করবার আগে "Teaching aids" সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করে নিলে ইতিহাস পড়ানোর সাথে সংশ্লিষ্ট "Teaching aids" গুলির সম্বন্ধে ধারণা সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাই প্রথমে সেই চেষ্টাই করা যাক। এ সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের "Teaching aids" সম্বন্ধে যাতে একটি মোটামুটি ধারণা হয়, সেই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান পুস্তকের লেখক কর্তৃক পৃথক ভাবে লিখিত "Teaching aids" নামক প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে আশাকরি এতে "Teaching aids" সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা হবে।

"Teaching aids" এর বাংলা তরজমা কি করবেন? তরজমা যাই করুন না কেন, "Teaching aids" বলতে শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠন সফল করবার জন্মে যে সব সাহায্য আমরা নিয়ে থাকি সেগুলিকে বোঝায়। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন চলে পাঠ্যক্রমকে কেন্দ্রকরে। পাঠ্যক্রমে থাকে কতকগুলি "বিষয়" যেমন,—ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতি। এগুলি মানুষের বহু-যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। এগুলিকে সুবিধামত নামকরণ করে এক একটি বিষয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। বিভিন্ন "বিষয়ে"-সাজানো, মানুষের এই অভিজ্ঞতাগুলি বিদ্যার্থীদের বয়েসের অনুপাতে "ক্রমে" বিন্যস্ত এবং সুসংবদ্ধ। পঠন-পাঠনের মাধ্যমে পাঠ্যক্রমে সাজানো, মানুষের অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে; অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে এগুলিকে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সাথে যোগ করে দেবার চষ্টা করা হয়। একাজ করেন স্কুলে শিক্ষক-মশায়রা।

কাজটি যে দুরূহ তাতে সন্দেহ নেই। দুরূহ এই জন্মে যে মানুষের বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করতে হয় তাঁদের। যে শিক্ষার শুরু মায়ের স্নেহ হাতের দেলা খেয়ে, আর শেষ যার শেষ নিশ্বাসে,—শিক্ষাই যেখানে জীবন,—শিক্ষার সেই মূল ধারার সাথে আবার মিশিয়ে দিতে হয় শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাপ্রবাহকে।

তাছাড়া একাজে অনেক বিমূর্ত্ত চিন্তা, বিমূর্ত্ত ভাব এসে হাজির হয়। স্থান ও কালের ব্যবধান অনেক সময় বাধার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তোলে। উপস্থাপিত বিষয় বস্তু হয়ত কোথাও অপ্রাকৃত, কোথাও বাস্তবের সাথে সম্পর্কহীন। কোথাও হয়তো শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর করতে হয় বেশী। এছাড়া আবার পাঠ্য-বিষয়ে শিক্ষার্থীর মনঃসংযোগ আনা আছে। সেও দুরূহ। কারণ মনঃসংযোগ তো এই আছে এই নেই—আলোছায়ার লুকোচুরি। এমনিতরো মনোবিজ্ঞানের নানা সমস্যা আর প্রশ্নও জড়িয়ে আছে একাজের সাথে।

এইকাজ বাস্তবে রূপায়িত করবার তরে নানা রকমের "পদ্ধতি" ছাড়াও নানা কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। পঠন পাঠনকে সহজবোধ্য, প্রাণবন্ত আর ফলপ্রসূ করবার জন্যে যে সাহায্য নিয়ে থাকি সেটাই "Teaching aid"। এই ব্যাপকঅর্থে শিক্ষকমশায় যখন বলেন, ভাষার প্রতীক ব্যবহার করেন, তখন সেটাও "Teaching aid" হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা বহু প্রকারের "Teaching aid" ব্যবহার করে থাকি। প্রথমে ব্ল্যাকবোর্ডের কথাই ধরুন না। এটি শ্রেণীকক্ষের একটি অতি পুরাতন "Teaching aid"। কালে কালে কতোনা হালফ্যাসানের "Teaching aid" উদ্ভাবিত হয়েছে,....হচ্ছে....কি তাদের জলুস! কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ডের আসন আজও তাদের কেউই দখল করতে পারেনি। মানচিত্র এঁকে, স্কেচ্ করে, চিত্র, চার্ট, ডায়াগ্রাম এঁকে, দিনের পাঠের সারমর্ম্ম লিখে, কতো রকমেই না শিক্ষকমশায় ব্ল্যাকবোর্ড থেকে সাহায্য নিতে পারেন। এক টুকরো খড়ি দিয়ে, কুশলী শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডের সাহায্যে তো ভেল্কি লাগিয়ে দিতে পারেন। ব্ল্যাকবোর্ডের সবথেকে বড়ো সুবিধে এইযে যখন যেটি দরকার তখন সেটি এতে করা যায়। আর শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে সেগুলি করাহয় বলে ব্ল্যাকবোর্ডের কাজের প্রতিছত্রে থাকে জীবন। তবে ব্ল্যাক-বোর্ডের সাহায্য নেবার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ যেন বেশী করা না হয়। ব্ল্যাকবোর্ডে যা উপস্থাপিত করা হবে তা যেন স্পষ্ট আর সহজবোধ্য হয়। শ্রেণীকক্ষের সব সারির শিক্ষার্থীরা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, বুঝতে পারে।

পাঠ্যপুস্তকও ব্ল্যাকবোর্ডেরই মত বহুদিন থেকে প্রচলিত আর একটি "aid"। ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়া যেমন শ্রেণীকক্ষের কল্পনা করতেই পারা যায়না, তেমনি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের ধারণাই করা যায়না।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের প্রকৃতি ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবার ধরন নিয়ে দুএকটি প্রশ্ন আছে। পাঠ্যপুস্তক খুব অল্পকরে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের কাঠামোটুকু দেবে না তার বিশদভাবে আলোচনা করবে? শিক্ষকমশায় পাঠ পরিকল্পনায় হুবহু পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করবেন, না নিজের পদ্ধতি পরিকল্পনা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নিজে সাজিয়ে নেবেন? এইসব প্রশ্ন নিয়ে মতভেদ আছে; তবে সাধারণ ভাবে একথা বলা যায় যে যেখানে শিক্ষক-মশায়ের বিষয়বস্তুর উপর দখল আছে এবং পেশাগত প্রস্তুতি ও আছে প্রচুর,—তাঁরা, সংক্ষিপ্তসার যে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া থাকবে, সেই ধরনের পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবেন। নানা পুস্তক থেকে আহরণ-সংকলন করে শিক্ষার্থীর সামনে আহৃত তথ্যগুলি হাজির করবেন। তাঁরা পাঠ্যপুস্তকের উপর বেশীনির্ভর না করে নিজেদের উপর নির্ভর করবেন। সেখানে শিক্ষক মশায়ের স্বাধীনতা থাকবে অনেক বেশী। পাঠ্যপুস্তকের ধরাবাঁধা সূচীপত্র দিয়ে তাঁদের সৃজনী প্রতিভাকে সীমিত করা হবে না। আর যেখানে অন্যরকম অবস্থা, ব্যবস্থাও সেখানে ভিন্ন রকমের। তবে অবস্থা যেমনই হোকনা কেন, একটার বেশী পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করলে ফল পাওয়া যায় বেশী।

শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনে এমন অনেক চিন্তা ও ধারণা থাকে যেগুলি বিমূর্ত্ত এমন অনেক জিনিস থাকে যেগুলি জটিল, দুর্ব্বোধ্য। বাস্তবে তাদের রূপায়ণ বাস্তবিকই দুষ্কর। তাই রেখায় আর সংখ্যায়, রঙে আর বিন্যাসে, প্রতীকের মাধ্যম নেবার রেওয়াজ। মানচিত্র, গ্রাফ, চার্ট, ডায়াগ্রাম, ফরম্যুলা প্রভৃতি এই ধরনের প্রতীক। এগুলির সাহায্যে ধারণা পরিষ্কার হয়, জটিল সহজ হয়। এরা বিমূর্ত্তকে মূর্ত্ত করে, শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করে। অল্পস্থানে অল্পসময়ে বহুজিনিস উপস্থাপিত করবার সুযোগ এরা দেয়।

মানচিত্রই নিন না আগে। ইতিহাস কি ভূগোল পড়াচ্ছেন। মানচিত্র না হ'লে চলে? স্থানের এবং কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে এক নিমিষে দূরের এবং অতীতের সাথে নিকট সম্পর্ক এনে দেয় মানচিত্র বিমূর্ত্তকে মূর্ত্তকরে....। এশিয়ার ভূপ্রকৃতি কেমন? কি রাজা অশোকের রাজধানী কতদূর বিস্তৃত ছিল? এসব কথা মুখে বলে বোঝানোর চেয়ে মানচিত্রের সাহায্য নিলে লাখোগুন কার্য্যকরী হবে। পাঠ জীবন্ত হয়ে উঠবে। যেসব প্রতীক চিহ্নগুলি মানচিত্রে ব্যবহার করা হয় সেগুলি অবশ্য পূর্ব্বাহ্ণেই বিদ্যার্থীদের জানা দরকার। মানচিত্রের আবার প্রকার ভেদ আছে। গ্লোব, রিলিফ ও ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট

মানচিত্র আবার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যখন যেটি দরকার শিক্ষক মশায় সেটি ব্যবহার করে থাকেন।

দুর্ব্বোধ্যকে বোধ্য করার উদ্ভাবিত যে কৌশলগুলি তার মধ্যে লেখ (graph) অভিনবত্বের দাবী রাখে। সারা অঙ্গে নানা সঙ্কেত তার। নানা বৈশিষ্ট্য-চিহ্নে অসাধারণ বাঙময় সে। লেখ বহুতথ্যের সংখ্যাগত তুলনা করে। একের সাথে অন্যের সম্পর্ক সংযুক্ত করে, বিশ্লেষণ করে, মূল্যায়ন করে। স্মৃতির মণি কোঠায় অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে প্রতিষ্ঠিত করে দুর্ব্বোধ্যকে। বিভিন্ন প্রকৃতি বিশেষ আকৃতি ও উদ্দেশ্য অনুসারে লেখকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন রেখা-লেখা, চিত্রলেখ, স্তম্ভলেখ, Diagram, claassification chart ইত্যাদি। এদের আকৃতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করলাম না।

এর পর চিত্র। রঙে ও রেখায় মনের ভাব প্রকাশ করবার অপূর্ব্ব মাধ্যম চিত্র। চিত্র বাস্তবের মত জীবন্ত নয়, কিন্তু জীবন্ত করে তোলে শ্রেণীকক্ষের পাঠকে। পাঠ্য বিষয়ের কোন মহৎ ব্যক্তি, কি বিখ্যাত বস্তু কি কোন দৃশ্য যাদের আপনি বাস্তব রূপে শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে আনতে পারছেন না, চিত্রের সাহায্যে তাদের শ্রেণী কক্ষে আনতে পারেন। ব্ল্যাক বোর্ডের স্কেচে, কার্টুনের ব্যবহারে, ফটোগ্রাফের ও পোষ্টারের আনুকূল্যে,—কতোভাবেই না কুশলী শিক্ষক চিত্রের সাহায্যে পঠন-পাঠন প্রাণবন্ত করে তোলেন। তাছাড়া চিত্রের একটি রমন্তিক (romantic) আবেদন আছে। সে সহজেই হৃদয়-গ্রাহী হয়। চিত্র যদি Projected হয় তো আরো ভাল। আর যদি সবাক চলচ্চিত্র হয় তাহ'লে তো কথাই নেই। তা দিয়ে তো প্রায় বাস্তবকে এনে হাজির করা যায়। শুষ্ক পাঠও ভরে ওঠে কানায় কানায় অপূর্ব্ব প্রাণ-বন্যায়। চলচ্চিত্র ব্যয়-বহুল। বর্ত্তমানে এর বহুল প্রচলন আমাদের দেশে সম্ভব নয়। চিত্রের সাহায্য নেবার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে চিত্র যেন ভাল হয়। বেশী চিত্র যেন না হয়। পড়া ছেড়ে ছবি দেখার নেশা যেন শিক্ষার্থীদের পেয়ে না বসে। যে সব দেশে চলচ্চিত্র শ্রেণী কক্ষে "aid" হিসেবে চালু হয়েছে সেখানে কোথাও কোথাও সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে,—শিক্ষক মশায় যেন mechanic ও Projector operator হয়ে না পড়েন।"

দর্শন-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য aid ছাড়াও কতকগুলি শ্রবণ-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য aid-এর চলনও শ্রেণীকক্ষে আছে। তাদের মধ্যে ফোনোগ্রাফ, রেডিও, টেপরেকর্ডার প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ফোনোগ্রাফ ও টেপরেকর্ডারের সাহায্যে বহু স্মরণীয়

ঘটনার জীবন্ত বর্ণনা ধরে রেখে দেওয়া যেতে পারে। কোনো অবিস্মরণীয় ঘটনার বা দৃশ্যের নাট্যরূপ ও এর মধ্যে করা যায় এবং পাঠপরিচালনার প্রাসঙ্গিক অঙ্গ হিসেবে সেগুলি শিক্ষার্থীদের শোনালে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রেডিওর সাহায্যে কোনো মনোজ্ঞ বর্ণনা, নাট্যরূপ, কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির বা বিশেষজ্ঞের নিজমুখে বলা-কথা শিক্ষার্থীদের শোনাতে পারা যায়। এতে পঠন-পাঠন প্রাণময় হয়। বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।

টেলিভিসন এক যোগে দর্শন ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য aid। এটি খুবই ব্যয় সাপেক্ষ।

এবার "মডেলে" আসুন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্কপ্রভৃতি সব "বিষয়ের" শ্রেণীকক্ষেই মডেল অপরিহার্য। পাঠ্য-বিষয় বস্তুকে বাস্তবের সাথে সংযুক্ত করতে মডেলের অবদান অনস্বীকার্য্য। মডেল আসলের নকল। নকল যতো অবিকল হবে ততো সে জীবন্ত হবে। শ্রেণী কক্ষে শুধু মডেল দেখানোই নয়, তৈরী করার ও প্রোজেক্ট নেওয়া যেতে পারে। মডেল তৈরী করা আর পাঠ পরিচালনায় মডেলের সাহায্য নেওয়া দুটিই কর্ত্তব্য। অন্ততঃ বারো তেরো বছর বয়েসের শিক্ষার্থীদের পক্ষে মডেল তৈরী করাটা সম্ভাবনাময়। একাজে শেখার সাথে সৃষ্টি করার অজস্র আনন্দে শিক্ষার্থী অভিষিক্ত হয়।

মডেল ছাড়া পাঠ্য-বিষয় বস্তুকে বাস্তবের সাথে সংযুক্ত করার মানসে আমরা আরও কতকগুলি জিনিসের সাহায্য নিয়ে থাকি। সেগুলিও নিঃসন্দেহে "Teaching aids"-এর তালিকায় উঠবে। সেগুলি হোলো শিক্ষাভ্রমণ, বিজ্ঞান ক্লাসের নানা experiment. নাটকাভিনয় প্রভৃতি। পঠন-পাঠনে বৈচিত্র্য চাই। চার দেয়ালের ঐ ক্ষুদ্রগণ্ডি এক ঘেয়েমিতে হাঁফিয়ে উঠে। তাই কুশলী শিক্ষক নানা ধরনের পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের aids এর ব্যবহারে পঠন-পাঠনে আনেন বৈচিত্র্য আনেন বৈশিষ্ট্য, নতুনত্ব, প্রাণ। কিন্তু কারণে অকারণে শুধুই বৈচিত্র্য সৃষ্টির নেশা, সেটা ক্ষতিকর। বৈচিত্র্য সৃষ্টি সবসময়েই প্রাসঙ্গিক হবে। বাস্তবের সাথে পাঠ্যবিষয়ের সংযোগ স্থাপন করবে। তবেই তা সার্থক হবে। ভূগোলে পড়ালেন পর্ব্বত বা জলপ্রপাত। শুধু চিত্রে আর মানচিত্রেই যদি সে জ্ঞান সীমিত থাকে তবে সে পড়া ব্যর্থ হবে। নিয়ে যাবেন না শিক্ষার্থীদের পাহাড় দেখাতে? জলপ্রপাত দেখাতে? ইতিহাস কি সমাজবিদ্যার (social studies) পাতায় লেখা কোল, ভীল, সাঁওতালদের কথা। নিয়ে যাবেন না তাদের একদিন সাঁওতাল পল্লীতে,— যেখানে মাদলের তালে তালে আর বাঁশের বাঁশীর সুরে তারা নাচে, গান গায়?

ইতিহাস পড়ানোর প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের একদিনও জাতুঘরে নিয়ে যাবেননা? অতীত যে সেখানে জীবন্ত হয়ে আছে। বিজ্ঞানের ক্লাসে পড়ালেন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, কি, অক্সিজেন-শূন্য বায়ুতে জীবের শ্বাস রুদ্ধহয়ে যায়; দেখাবেন না সে সব কেমন করে হয়? এসব না করলে আপনার পাঠ-পরিচালনা নিরর্থক হবে। এই সবের জন্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, শ্রেণীকক্ষে experiment, প্রভৃতির সাহায্য দরকার। ভ্রমণের যেখানে উপায় নেই সেখানে অন্য ব্যবস্থা। যেমন আফ্রিকার অধিবাসীদের কথা পড়াচ্ছেন। আফ্রিকা ভ্রমণ সম্ভব নয়। অগত্যা সেখানে চিত্র। চলচ্চিত্র হলে অনেকটা জীবন্ত হবে।

নাটক অভিনয়ে থাকে নাটকের এবং নাটকীয় মুহূর্ত্তের দৃপ্ত আবেদন। নাটকের মধ্যেকার ঘটনার সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ অনুভব করেন যাঁরা নাটক অভিনয় করেন আর যাঁরা নাটক দেখেন। উভয় পক্ষই। পাঠ্য-বিষয়কে কেন্দ্রকরে লেখা নাটকের অভিনয় তাই স্থান আর কালের ব্যবধান মুছে দিয়ে বাস্তবের সাথে শিক্ষার্থীদের অপূর্ব্ব যোগ স্থাপন করে দেয়। ইতিহাস পাঠে নাটক অভিনয় একটি একান্ত আবশ্যকীয় "teaching aid"

শেষকথা এই যে আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে এগুলি সবই "teaching aids"। তাই পঠন-পাঠনে এদের আধিক্য বা প্রাধান্য থাকবে না। এদের ব্যবহার প্রাসঙ্গিক হবে। শিক্ষক মশায় প্রয়োজন মত "এদের" ব্যবহার করবেন "সাহায্য" হিসেবে। "এরা" যেন শিক্ষকমশায়কে সাহায্য হিসেবে ব্যবহার না করে।

বোর্ডে যাই লিখি বা কাজ করি তা যেন শ্রেণী-কক্ষের সব বিদ্যার্থীর বোধগম্য হয়। তা যেন সকলেই দেখতে পায়। ব্ল্যাক বোর্ড যথা স্থানে রাখার দরকার। ব্ল্যাক বোর্ড ভাল এবং বড় হওয়া দরকার। মনে রাখা দরকার যে একচিলতে তক্তাকে কালি মাখিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলেই সেটা ব্ল্যাক বোর্ড হয়ে যায় না। ব্ল্যাক বোর্ডে কাজ খুব বেশী করা কোনো ক্রমেই ঠিক নয়—(Not to be over done.)

পাঠ্যপুস্তক ঃ—

ইতিহাস পঠন-পাঠনে পাঠ্যপুস্তক ও ব্ল্যাক বোর্ডের মতই বহুপ্রচলিত ও বহুদিন থেকে প্রচলিত একটি অতি আবশ্যকীয় "teaching aid"। এটি একান্তভাবেই আমাদের কাছে এতো সাধারণ হয়ে গেছে যে এটিকেও একটি "teaching aid" হিসেবে ভাবতেই যেন কেমন লাগে। শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনের সাথে এটি কখন আমাদের অজ্ঞাতে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে গেছে। এটি যে ইতিহাস পঠন-পাঠনের একটি "aid" হিসেবে পরিগণিত হয় বা হ'তে পারে সে কথা চিন্তাই আমরা অনেক সময় করিনি। যে সমস্ত উপকরণ আমরা শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করে থাকি শিক্ষার্থীর শিক্ষা যথাযথ, সুবিন্যস্ত ও সুসংহত করবার জন্যে, পাঠ্যপুস্তক তাদের মধ্যে অন্যতম। শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে সুসংবদ্ধ করে পাকা বোনেদের উপর খাড়া করবার জন্যে এর সাহায্য অপরিহার্য্য।

সেই জন্যে স্কুলে ইতিহাস পঠন-পাঠনে পাঠ্যপুস্তকের একটি অতি আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু একটি কথা আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পাঠ্যপুস্তক বা ব্ল্যাকবোর্ড কিংবা অন্যান্য যে সব শিক্ষোপকরণ বা aids আমরা পঠন-পাঠনে কজে লাগাই তাদের গুরুত্ব বা ভূমিকা শিক্ষকমশায়ের থেকে বেশী নয়। শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠন তো guidance এবং সেখানে শিক্ষক মশায়ই সব। তিনিই গোড়ার কথা, তিনিই শেষ কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে শিক্ষক মশায় পাঠ্যপুস্তকের উপর কতখানি নির্ভর করবেন? কতখানি সাহায্য তিনি নেবেন পাঠ্যপুস্তকের?

এসব প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে এমন একটি জিনিসের উপর যেটি দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রভৃতি বৃহত্তর ও ব্যাপকতর প্রশ্নগুলির সাথে অতি অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত। কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা হয়তো এমন যে শিক্ষকমশায়ের শিক্ষা ও পেশাগত প্রস্তুতি যথাযথ নয়। বিষয়বস্তুর জ্ঞান তাঁর সীমিত। অর্থের অভাবে নানারকমের শিক্ষোপকরণ ও সরঞ্জাম স্কুলে কেনা হয়তো অসম্ভব। স্কুলে হয়তো উপযুক্ত

গ্রন্থাগার নেই, কি থাকলেও ইতিহাসের উপযুক্ত বই নেই। এমন কি ইতিহাসের একাধিক পাঠ্যপুস্তকও নেই। স্কুলের কাছাকাছি কোথাও গ্রন্থাগার নেই। থাকলেও সেখানে ইতিহাসের রেফারেন্স বা অনুরূপ পুস্তকের বদলে আছে উপন্যাস ও রোমাঞ্চ কাহিনী। এখানে ইতিহাসের শিক্ষককে এবং শিক্ষার্থীকে পাঠ্য পুস্তকের উপর নির্ভর করতেই হবে। এ ছাড়া গতি কি!

আবার অন্য দিকে এমনও হতে পারে যে, দেশে স্কুলের ইতিহাস শিক্ষকদের শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত। তাঁদের পেশাগত প্রস্তুতিও পর্য্যাপ্ত। দেশের স্বচ্ছল আর্থিক অবস্থার দৌলতে স্কুলে স্কুলে আছে নানা ধরনের আধুনিক শিক্ষোপকরণ ও সরঞ্জামের প্রাচুর্য্য। স্কুলে সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার আর তাতে ইতিহাসের নানাধরনের ও মানের পুস্তকের সমাবেশ; নানা পদ্ধতিতে বিন্যস্ত-পাঠ্যক্রম সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক, আর তা দেশ বিদেশ থেকে আমদানীকৃত। এ আর এক অবস্থা।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের উপর ইতিহাস-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কতোখানি নির্ভর করবে সেটি স্থিরীকৃত হবে তাই উপরোক্ত দুই চূড়ান্ত অবস্থার তারতম্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে। ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে কি কি বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচন হবে এবং কি করে হবে, কি করে সেই বিষয়বস্তুগুলি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে বিন্যস্ত হবে সে আলোচনা আমরা "স্কুলে ইতিহাস-পাঠ্যক্রম" এই অধ্যায়ে করেছি। এখানে সে আলোচনা পুনরুল্লেখ হবে মাত্র। তবে ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকটি কেমন হবে সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা আলোচনা এই প্রসঙ্গে অবান্তর হবে না।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে যে সব তথ্য থাকবে সেগুলি নির্ভুল হবে। লেখার ভঙ্গি হবে মনোরম। প্রকাশ হবে সুষ্ঠু। বিন্যাস যুক্তিযুক্ত ও মনোবিজ্ঞান সম্মত। পাঠ্যপুস্তকের রচনাকালে শিক্ষার্থীর বয়েস ও মনীষার বিকাশ বিচার করা হবে। পাঠ্য পুস্তক যেন তাদের বোধ্য হয়। তথ্যের সংকলন সঞ্চয়ন হবে উপযুক্ত, যথাযথ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ; অথচ নিছক পাণ্ডিত্য জাহির করবার কোনো প্রয়াস থাকবেনা এখানে। সিদ্ধান্তগুলি হবে যুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং উচ্চ গবেষণার ক্ষেত্রে স্বীকৃত; সেগুলি কোনমতেই এক-দেশদর্শী হবে না। লেখার ধরনে থাকবে ইতিহাসের সার্ব্বজনীন আবেদন। এখানে ধর্ম্মান্ধতার বা উগ্র জাতীয়তার নাম গন্ধ থাকবে না। আন্তর্জাতিক বোধ থাকবে পাঠ্যপুস্তকের পাতায় পাতায় ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে। ইতিহাসের

বিকৃতি থাকবে না। সত্য থেকে ভ্রষ্ট হবে না। ছাপার ভুল থাকবে না। ছাপা হবে ঝকঝকে। ছাপার অক্ষর খুব ছোট হবে না। বাঁধাই হবে আকর্ষণীয়। মোট কথা ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকটি হবে মনোজ্ঞ, যাতে করে এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মন আকর্ষণ করতে পারে।

ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে বিষয় বস্তুর বিন্যাসের প্রকৃতি হিসাবে (Chronological, developmental ও patch) যেমন পাঠ্য-পুস্তককে ভাগ করাহয় তেমনি পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে বিষয় বস্তুর সংযোজন সংস্থাপনের আধিক্য ও অনাধিক্য অনুযায়ী আবার কোথাও কোথাও পাঠ্য-পুস্তককে ভাগ করা হয়ে থাকে। এই ভাগ তিন শ্রেণীর। যে পুস্তকে কেবল মাত্র ইতিহাসের ঘটনাগুলির পাঠ্যক্রমানুগ একটি কাঠামো মাত্র অতি সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশ করা হয় সেটি এক শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক। জার্ম্মানীতে এই শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তককে বলা হয় Leit faden, ফ্রান্সে বলা হয় Precis। পাঠ্য-পুস্তকের আবার আর একটি শ্রেণী আছে। এই শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকে পাঠ্য ক্রমান্তর্গত বিষয় বস্তুর কাঠামোটি কিছু বেশী তথ্যের সংযোজনায় সমৃদ্ধ থাকে। তথ্যের এই সমৃদ্ধি ছাড়া তথ্যগুলির উপস্থাপন পরস্পর সংবদ্ধ ও অর্থযুক্ত থাকে বলে পূর্ব্বোল্লেখিত পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা অধিকতর তথ্য সম্ভারের প্রাচুর্য্য ও প্রকট হয় এই ধরনের পাঠ্যপুস্তকে। এসব সত্তেও এই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে শিক্ষকমশায়ের আদর্শ পরিকল্পনা ও সুবিধানুযায়ী পঠন-পাঠনে তথ্যের বিন্যাস সাধন করবার যথেষ্ট সুযোগ ও অবকাশ থাকে। এরকম পাঠ্যপুস্তককে ফ্রেঞ্চ শব্দ "manuels" দিয়ে বিশেষিত করা যেতে পারে। এছাড়া আর একপ্রকারের পাঠ্যপুস্তক আছে। সেগুলি তথ্য সম্ভারের প্রাচুর্য্যে ব্যাপক ও সমৃদ্ধ। তথ্য-বাহুল এই পুস্তকগুলি প্রতিটি ঘটনার তথ্যসমাহারে পূর্ণ। এগুলি যথার্থভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানে শিক্ষকমশায়ের পঠন-পাঠন কালে স্বকীয় ও পৃথকভাবে বিষয় বিন্যাসের বিশেষ কোনো সুযোগ থাকেনা। ফরাসী ভাষায় "cours" এই শব্দটি দিয়ে এই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তককে নামাঙ্কিত করা হয়ে থাকে।

যে আলোচনা করা গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের দেশের বর্ত্তমান পরিবেশে, স্কুলগুলির অবস্থানুযায়ী, শিক্ষকমশায়দের শিক্ষার মান, তাঁদের বিষয়-বস্তুর জ্ঞান ও পেশাগত প্রস্তুতি প্রভৃতি সামগ্রিক ভাবে বিচার বিবেচনা করে শিক্ষক মশায়রা ও শিক্ষার্থীরা ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের উপর কতোখানি নির্ভর করবে এবং কি ধরনের পাঠ্য-পুস্তক আমাদের স্কুলগুলিতে প্রবর্ত্তন করা হবে —তার একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া খুব শক্ত হবে না।

এখন কথা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার করবো। এ প্রশ্নটিও বিতর্কমূলক। নানা মতভেদ আছে এই প্রশ্নের উত্তরে। কোনো কোনো মহলে এই ধারণা পোষণ করা হয় যে ইতিহাসের শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যে বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে পাঠের অবতারণা ও আলোচনা করেছেন পাঠ্যপুস্তকের কাজ সেটিকে সুবিন্যস্ত করে পাকা ভিত্তিতে দৃঢ় করে দেওয়া। ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তকে যে তথ্যের ও বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ সেগুলিকে শুধু মুখস্থ না করে পাঠ্য-পুস্তকটিকে ইতিহাসের তথ্যরাজির "ভাঁড়ার ঘর" বলে মনে করতে হবে—এই ধারণা যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের মতে ইতিহাসের শিক্ষকমশায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থকর্ত্তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ কোনোক্রমেই করবেন না। তিনি পাঠ্যপুস্তকে বিন্যস্ত তথ্যরাজিকে, বা অনুসৃত 'ক্রম'কে মূল বা ভিত্তি হিসেবে গ্রহন না করে, সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করবেন। আবার এই মতের ঠিক বিরুদ্ধ মতও পোষণ করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো মহল ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তককেই মূল হিসেবে গ্রহণ করে পাঠদানের পক্ষে মত দেন। শিক্ষকের আহৃত তথ্যগুলি হবে সেখানে সাহায্যকারী।

এই বিতর্কমূলক এবং পরস্পর-বিরোধী মতের মূল নিহিত রয়েছে কিন্তু গভীরে। যাঁরা পঠন-পাঠন ব্যাপারে ইতিহাস শিক্ষককে দিতে চান অবাধ স্বাধীনতা, যাঁদের মতে যতো ইতিহাসের শিক্ষক ততো রকমের ইতিহাসের পদ্ধতি, তাঁরা বলেন পাঠ্যপুস্তকের "ক্রমে" এবং "সূচীতে" ইতিহাস-শিক্ষকের প্রতিভাকে সীমিত করে দিলে ইতিহাস পঠনপাঠনের কোনো বৈচিত্র্য থাকবে না ; বিষয়বস্তুর উপস্থাপন-পদ্ধতির শুভাশুভ সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষার ও তেমন অবকাশ থাকবে না। এঁরা চান ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে বা শ্রেণীকক্ষে পাঠ-বিন্যাসে, তথ্যের সঙ্কলন সংযোজনে শিক্ষকের অবাধ স্বাধীনতা। আর যাঁরা বিরুদ্ধমত পোষণ করেন তাঁরা ইতিহাস শিক্ষককে বেপরোয়া স্বাধীনতা না দিয়ে একটা ক্রম, একটা পন্থা, পাঠ্য বিষয়বস্তুর একটা মোটামুটী ধারণা এবং তা উপস্থাপন করবার একটা নিয়ম এবং ধারা অনুসরণ করার পক্ষপাতী। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে মূলতঃ দুটী ; প্রথমতঃ—এই পেশায় শিক্ষকের স্বকীয়তা কতোখানি স্বীকার করে নেওয়া হবে, দ্বিতীয়তঃ কতোখানি কেন্দ্রীয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুগুলি উপস্থাপন করবার নির্দ্ধারিত ক্রম ও পদ্ধতি হিসেবে আসবে তাকে অনুসরণ করবার আহ্বান জানিয়ে। এই মত-পার্থক্যের মূলে আছে আদর্শগত পার্থক্য।

মতের পার্থক্য যাই থাকুক না কেন একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে

পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকমশায়ের তত্ত্বাবধান (guidance) ছাড়া ব্যবহৃত হলে বিশেষ ফল হয় না। "হেথা থেকে হেথা পর্য্যন্ত....বাড়ীতে পড়ে আসবে"....এই ধরনের কথাগুলির মধ্যে দিয়ে ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক কাজে লাগাবার পদ্ধতির যে ব্যঞ্জনা সেটা খুব আশাব্যঞ্জক নয়। কিংবা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক মশায়ের কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয়...."আচ্ছা তুমি বোসো,...অসীম, তুমি পড়ো তারপর...., আচ্ছা বোসো, বিমল, তুমি পড়ো তারপর"....এমনি 'তারপর', 'তারপর' সেটাও খুব একটা ভালো ব্যাপার মোটেই নয়। এরকম ভাবে পাঠ্যপুস্তককে শ্রেণীকক্ষে কাজে লাগাবার পন্থা আজ আর নেই। শিক্ষকমশায়ের যোগ্য তত্ত্বাবধান ও উপদেশ নির্দ্দেশ ছাড়া শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক থেকে ঠিকমত আবশ্যকীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না। একটি ঘটনার সাথে অন্য ঘটনার পরস্পর কার্য্য-কারণ সম্পর্ক তার পক্ষে ঠিক করা সম্ভব নয়। শিক্ষক মশায়ের উপদেশে ও নির্দ্দেশে, পাঠদানের পর পাঠ্যপুস্তকে আধৃত তথ্যগুলির দ্বারা শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠনে আলোচিত বিষয়গুলির সম্পর্কে ধারণা আরও সহজ ও দৃঢ় করবার ব্যবস্থা হ'লে ভালো ফল পাওয়া যায়। উপরের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের সূচী (Index) থেকে গবেষণা ও "রেফারেন্স" এর শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। শ্রেণীতে পাঠদানের পর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষার্থী 'নোট' নেওয়া অভ্যাস করতে পারবে। অবশ্য এই "নোটে" বিষয়বস্তুর বিন্যাস কেবল মাত্র পাঠ্য-পুস্তকের অনুগামী না হয়ে বিষয়বস্তুর এবং তথ্যের নির্ব্বাচনে ও পুনর্বিন্যাসে শিক্ষার্থীর স্বকীয় চিন্তা ও অনুধ্যানের ছাপ থাকবে। শিক্ষকমশায় প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকে আধৃত বিষয়বস্তু পড়ে তার উত্তর লিখতে বলতে পারেন। পাঠ্যপুস্তকে সংযোজিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে শিক্ষার্থী ম্যাপ, চার্ট, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, সময়রেখা প্রভৃতি তৈরী করতে পারে; আবার ম্যাপ, চার্ট, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, সময়রেখা প্রভৃতি থেকে বিষয়বস্তুর বিন্যাস সাধন করতে পারে। এমনি নানাভাবে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারে প্রতিপদেই শিক্ষকমশায়ের উপদেশ নির্দ্দেশ চাই। ইতিহাস পঠন-পাঠনে বৈচিত্র্য চাই। তা না হলে ইতিহাস পাঠ একঘেয়ে, নীরস, নিরানন্দময় হয়ে উঠে শ্রেণীকক্ষের পঠনপাঠনকে স্বাদহীন, বর্ণহীন করে দেয়। তাই এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা প্রণিধান যোগ্য। যেখানে অর্থের অনটন, যেখানে আবশ্যকীয় শিক্ষোপকরণ ও সরঞ্জাম প্রভৃতির অভাব সেখানে শিক্ষক আর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকই ইতিহাস পড়ার ও শেখার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। সে সব ক্ষেত্রে ইতিহাসের শিক্ষককে যথেষ্ট সাবধানতা

অবলম্বন করতে হবে। ইতিহাস সম্বন্ধে বা ইতিহাসের তথ্য আহরণ সম্বন্ধে যেন শিক্ষার্থীর মনে কোনো সঙ্কীর্ণ মনোভাব এসে না পড়ে। শিক্ষার্থী যেন মনে করবার অবকাশ না পায় যে একমাত্র ইতিহাসের শিক্ষক ও একখানি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই ইতিহাস পাঠের গতিবিধি সীমাবদ্ধ আছে। ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধানের, বা পাঠের যে বিস্তৃত ক্ষেত্র সেই দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে হবে। অনেক সময় একই শ্রেণীর জন্যে বিভিন্ন ধরনের চার পাঁচখানি পাঠ্যপুস্তক আবশ্যক মত শিক্ষার্থীদের নাড়াচাড়া করতে দিলেও সুফল পাওয়া যায়।

ইতিহাসপাঠে মানচিত্র, লেখ, ডায়াগ্রাম, চার্ট, সময়রেখা প্রভৃতি কতকগুলি দর্শন-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীক :—

ইতিহাস পঠন-পাঠনের সাথে এমন অনেক চিন্তা, ভাব, ধারণা সংশ্লিষ্ট থাকে যেগুলি একান্তভাবেই বিমূর্ত্ত। বাস্তবে তার রূপায়ণ বাস্তবিকই দুষ্কর। তাই রেখায় আর সংখ্যায়, রঙে ও বিন্যাসে প্রতীকের মাধ্যমে তাদের ধারণা সুপরিস্ফুট করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ইতিহাস পাঠে ম্যাপ, চার্ট, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, সময়রেখা প্রভৃতি অনুরূপ প্রতীক। এদের সাহায্যেই বিমূর্ত্তকে মূর্ত্ত করবার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য যে তারা প্রতীক মাত্র এবং এদের মাধ্যমে বিমূর্ত্তকে মূর্ত্ত করবার চেষ্টা করা হয়। বিমূর্ত্ত মূর্ত্ত হয় অপ্রত্যক্ষ ভাবে। প্রত্যক্ষ সেখানে মূর্ত্ত নয়।

এই প্রতীকগুলির উদ্ভাবনে ইতিহাস-শিক্ষক মশায়দের সুবিধে হয়েছে অনেক। এই প্রতীকগুলির ব্যবহারে পাঠদান হয়ে উঠে জীবন্ত। বিমূর্ত্তকে বাস্তবে মূর্ত্ত করে শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে দেয় তারা। কালের ও স্থানের ব্যবধান ঘুচিয়ে বর্ত্তমানে উপস্থাপিত করে অতীতকে, নৈকট্য সংস্থাপিত করে দূরের সাথে। অল্প সময়ে, অল্পস্থানে, বহু জিনিস উপস্থাপিত করবার সুযোগ তারা দেয়। জটিল জিনিসকে সরল করে। দুষ্করকে করে সুকর, সহজ। তারা মূক নয়, মুখর। অবিশ্বাস্য ভাবে ফলপ্রসূ তাদের ভাষা।

মানচিত্র।—

ইতিহাসপাঠে মানচিত্র না হলে চলে না। কালের খতিয়ানে ঘটনার যে সব আখরগুলি ভিড় করে রয়েছে সেগুলিতো শূণ্যে ঘটেনি। সেগুলি ঘটেছে কোনো স্থানে। ঘটনাগুলি যেমন কোনো স্থানে ঘটেছে তেমনি ঘটনাগুলির তো আবার সময় আছে, ক্ষণ আছে। স্থান আর সময়কে তাই ইতিহাসের দুটি চোখ বলা হয়ে থাকে। সময় আর স্থানের সাথে শিক্ষার্থীর ধারণার

সংযোগ স্থাপন করতে না পারলে ইতিহাস পাঠ তার কাছে নিরর্থক হয়। মানচিত্রের সাহায্যে স্থানের সাথে শিক্ষার্থীর পরিচিতি ঘটে। স্থানের সাথে সংযোগ স্থাপন করবার সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রতীক এই মানচিত্র। তাই মানচিত্র ছাড়া ইতিহাসের পঠন-পাঠন কল্পনা করাও যায়না।

মানচিত্রের প্রকার ভেদ আছে। গ্লোব, রিলিফ-মানচিত্র ও "ফ্ল্যাট"-মানচিত্র। "ফ্ল্যাট"-মানচিত্র আবার আরও কয়েকটি ভাগে ভাগকরা যেতে পারে—যথা, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি। ইতিহাসের শ্রেণী কক্ষে যখন যেটি দরকার সেইমত সেই ধরনের মানচিত্র আমরা ব্যবহার করে থাকি। নানা ধরনের মানচিত্রের মধ্যে "ঐতিহাসিক মানচিত্র (historical atlas) কথাটিও চালু আছে। ঐতিহাসিক মানাচত্র বলতে অতীতের ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ের স্থানের ধারণাসূচক প্রতীককেই বোঝায়। সেটি কোনো একটি দেশের বা দেশের সমষ্টির বা পৃথীবীরও হতে পারে।

মানচিত্রের যে যে জিনিসগুলি আমরা শিক্ষার্থীর মনে বিশেষভাবে ছাপ দিতে চাই, নানা কৌশলে সে কাজ করবার ব্যবস্থা আছে। যে স্কুলে বৈদ্যুতিক আলো আছে সেখানে মানচিত্রের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত করতে পারি; যেখানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই সেখানে চোখে পড়ে এমনি রংদিয়ে মানচিত্রের ঐ অংশগুলি রাঙিয়ে দিতে পারি। অনেক সময় এ ধরনের উদ্ভাবন বেশ কার্য্যকরী হয়।

মানচিত্র যখন ব্যবহার করা হবে তখন স্মরণ রাখতে হবে যে মানচিত্রের ভাষা শিক্ষার্থীর কাছে বোধগম্য হয় যেন। মানচিত্রের দিগনির্ণয় প্রণালী, মানচিত্রে ব্যবহৃত সাগর, পর্ব্বত, নদী অরণ্যের এবং অনুরূপ বস্তুগুলির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্নগুলি শিক্ষার্থীর গোচরে আনতে হবে। হাজার হাজার মাইল পরিব্যাপ্ত একটি দেশকে বা মহাদেশকে একটুখানি কাগজের ফালিতে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে এখানে, তাই মানচিত্রে ব্যবহৃত স্কেল ও তার ব্যবহার, এবং ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করার প্রয়োজন আছে। যে মানচিত্র শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত হবে তা যেন বেশ বড়ো হয় এবং শ্রেণীকক্ষের শেষের সারির শিক্ষার্থীর কাছেও যেন মানচিত্রের সব কিছু স্পষ্ট হয় সেদিকে লক্ষ রাখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রেণী কক্ষে টাঙানো মানচিত্রের সাথে মিলিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ মানচিত্রও দেখবে। শিক্ষক মশায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'out line map'-এ দিনের পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলি

বসাতে বলবেন শিক্ষার্থীদের। লক্ষ রাখতে হবে যে একটি মানচিত্রে বহু জিনিসের সমাবেশ করা যেন না হয়।

লেখ : (Graph)

নিজের প্রয়োজন মেটাতে মানুষ অসাধ্য সাধন করে আসছে। ইতিহাসের শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবার জন্যেও অনেক রকমের কৌশল ও পন্থার উদ্ভাবন হয়েছে মানুষের সৃজনী প্রতিভার দৌলতে। সাধারণ ভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দুর্বোধ্যকে বোধ্য করবার যেসব কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলির সফল প্রয়োগও স্কুলের শ্রেণীকক্ষে প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। লেখ একটি অনুরূপ উদ্ভাবন। সারা অঙ্গে নানা সঙ্কেতে, আভাসে ইঙ্গিতে, নানা বৈশিষ্ট্য চিহ্নে অসাধারণ ভাবে বাঙ্ময় সে। তার ভাষা অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় মুখর। বহু তথ্যের সংখ্যাগত তুলনায়, একের সাথে অন্যের সম্পর্ক সংস্থাপনে, বিশ্লেষণে, মূল্যায়নে লেখ আমাদের যে সাহায্য করে থাকে তা অনন্যসাধারণ। যেগুলি সর্ব্বোতোভাবে বিমূর্ত্ত, সেগুলিকে রেখায়, সংখ্যায়, নানা সঙ্কেতে আমাদের চোখের সামনে প্রতীকের মাধ্যমে সহজ ও স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করে। আর এই উপস্থাপনের ফলে বিমূর্ত্ত মূর্ত্ত হয়ে উঠে, জটিল হয়ে উঠে সহজ। এতে ধারণা হয় সুস্পষ্ট। লেখ স্মৃতির মণিকোঠায় অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় দুর্বোধ্যকে।

বিভিন্ন প্রকৃতি, বিশেষ আকৃতি ও উদ্দেশ্য অনুসারে লেখকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা :—রেখা লেখ (Line graph), চিত্র-লেখ (Pictorial graph), স্তম্ভ-লেখ (Histogram), 'ডায়াগ্রাম', প্রভৃতি। ইতিহাস পঠন-পাঠনে বহুল প্রচলিত কয়েকটি লেখ সম্বন্ধে মোটামুটি দু-এক কথা আলোচনা করা যাক।

রেখা-লেখ (Line graph) : —যে কোনও ধরনের বিমূর্ত্ত ধারণাকে নানা সঙ্কেতে চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে উপস্থাপিত করা যেতে পারে এই রেখা-লেখ অবলম্বনে। এ রেখা অবশ্য আড়াআড়ি ভাবেও টানা যায় আবার লম্বালম্বি ভাবেও টানা যায়। ইতিহাস পঠন-পাঠনে এরূপ লেখ অবলম্বনে সাধারণতঃ বিদ্যার্থীর মনে সময়ের ধারণা স্পষ্ট করে দেবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ইতিহাসের ঘটনা যেমন শূন্যে ঘটেনি, কোনো স্থানে ঘটে, তেমনি সে কোনো বিশেষ সময়ে ঘটে। আবার সময়কে আমরা দেখছি স্রোতের মত যেন। সে স্রোত স্থাণু মোটেই নয়। নিত্য গতিশীল। অনাদি কাল থেকে সে বহে এসেছে, বহে চলেছে। তাই কালের বুকে যে ঘটনারাশি

সেগুলি ক্রমিক। এই ক্রমিক ঘটনারাশির সংযোজনে ও বিশ্লেষণে সময়ের ধারণা অপরিহার্য্য। কিন্তু সময়ের ধারণা বিমূর্ত্ত। তাই এই রৈখিক প্রতীকের মাধ্যমে সময়ের ধারণা দেবার প্রচেষ্টা। ইতিহাস পঠন-পাঠনে সময়ের ধারণা দেয় বলে এই রেখাকে "সময় রেখা" বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু এতো কেতাবের কথা, "থিওরি"। শ্রেণী কক্ষে বাস্তব ক্ষেত্রে, হাতে কলমে সময় রেখার সাহায্যে আমরা শিক্ষার্থীর মনে কেমন করে সময়ের ধারণা দেবো? সেই প্রশ্নেরই আলোচনা করা যাক্। সময়ের ধারণার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে "পূর্ব্ব" ও "পর" এই দুটি কথার মাধ্যমে যে ভাব আমরা ব্যক্ত করতে চাই সেটি। একটি ঘটনা কতো "পূর্ব্বে" বা কতো "পরে" ঘটেছিল? এ প্রশ্ন দুটির সবটুকু জুড়ে রয়েছে সময়ের ধারণা। এই প্রশ্ন দুটির উত্তর খুঁজতে হলেই আর একটি প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। সেটি হচ্ছে, কোন্ ঘটনার কতো পূর্ব্বে বা কতো পরে? এটি জানা না থাকলে যেমন আগেকার প্রশ্ন দুটির কোনো অর্থই হয় না তেমনি তাদের উত্তর খুঁজতে যাওয়াও পণ্ডশ্রম মাত্র। এই অনাদি অনন্ত কালস্রোতে এমন কোনো একটা চিহ্ন আবিষ্কার করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে আমরা পূর্ব্বাপর ঘটনার আপেক্ষিক পারম্পর্য্য অনুধাবন করবো। আমাদের এই "আজ",—"বর্ত্তমান",—এমনি একটি প্রয়োজনপুষ্ট চিহ্ন। কোন ঘটনার প্রাচীনত্বের কথা বললেই সেটি "আজ" থেকে কতো প্রাচীন তা ধারণা করা সহজ হয়। বর্ত্তমানকে সময় স্রোতে একটি চিহ্ন ধরে যেমন বর্ত্তমান থেকে কতো আগে কোনো ঘটনা ঘটেছিল তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে আবার তেমনি আমাদের জ্ঞানের সীমার গণ্ডির মধ্যে আসে অতীতের এমনি এক যুগান্তকারী ঘটনাকে অনুরূপ চিহ্ন ধরে সময়ের ধারণা করবারও উপায় বা পন্থা আছে। বর্ত্তমান দুনিয়ায় খৃষ্টাব্দটি সময় গনণায় একটি প্রায় সর্ব্বজনস্বীকৃত অনুরূপ উপায়। যীশুর কালকে অতীত যুগের একটি চিহ্ন ধরে সময় গণনার পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করি। যীশুর সময়ের আগে খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ আর পরে খ্রীষ্টাব্দ। কালস্রোতে যীশুখ্রীষ্টের সময় আর আমাদের বর্ত্তমান এই দুটি থাকলে আর হাবুডুবু খেতে হবে না। ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ বলতে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে ঐটি যীশুখ্রীষ্টের সময় থেকে ৬৪৭ বছর পরে আর আমাদের সময় থেকে ১৩১৫ বছর আগে। শ্রেণী-কক্ষে শিক্ষক মশায় সময় রেখার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মনে সময়ের ধারণা দেবার সময় মনে রাখবেন যে সময়ের ধারণা দিতে হবে বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে।

ইতিহাসের ঘটনাবলী ক্রমিক বলেই "ক্রোনোলজি" বা সময়ের 'ক্রম' অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই জন্ম সাধারণতঃ "Progressive time line" ব্যবহার করাই যুক্তি সঙ্গত। Progressive time line হচ্ছে সেই "time line" যাতে ঘটনার সময়ক্রম ঠিক ঠিক অনুসরণ করা হয়। এতে সুবিধে হয় এই যে শিক্ষার্থীদের সময়ের ধারণা কোনো প্রকারে বাধা পায় না, বা ঘটনার উল্টা পাল্টা সাজানোর জন্তে সময় সম্বন্ধে ভুল হয় না। কাল যে ধারায় বহে এসেছে ঘটনাগুলিও সেই ধারাকে, সেই ক্রমকে, ঠিক ঠিক অনুসরণ করে এই ব্যবস্থায়।

কিন্তু শুধু Progressive time line-এ সময়ের ক্রমকে অনুসরণ করা হয় বলেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময়ের ধারণার মধ্যে বর্ত্তমান বা বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষি থাকে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুপস্থিত। যেমন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ বলতে যে ঐ বছরে সজ্ঘটিত কাহিনীটি যীশুখ্রীষ্টের সময় থেকে ১৭৫৭ বছর পরের এ ধারণা প্রত্যক্ষ ভাবে স্পষ্ট। কিন্তু সময় রেখা যদি ঐ তারিখ পর্য্যন্ত এসে থেমে যায় তাহলে বর্ত্তমানের সাথে পারম্পর্য্য সেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে "Regressive time line" ও ব্যবহার করতে হবে। "Regressive time line"-এ বর্ত্তমান থেকে ক্রমে ক্রমে অতীতের দিকে এগিয়ে যাবার বিধি আছে। শ্রেণী কক্ষে আমরা উভয়বিধ ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে পারি। আর তাতেই শিক্ষার্থীর সময়ের ধারণা ভালো হয়। Regressive time lineটি মনোবিজ্ঞান সম্মত। কারণ এর সাহায্যে বিদ্যার্থী অতি সহজেই সময়ের ধারণা করতে পারে বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে। বর্ত্তমান তো তার কাছে জীবন্ত, চাক্ষুষ, জানা। বর্ত্তমান থেকে অতীতে এক পা দুপা করে এগিয়ে যাওয়া তো জানা থেকে অজানায় এগিয়ে যাওয়া। সেইজন্তে Progressive এবং Regressive উভয় ধরনের সময় রেখাই আমরা ব্যবহার করবো। Regressive time line দিয়ে ইতিহাসের ঘটনার বর্ত্তমানের সাথে সংযোগ সাধন করবো আর Progressive time line-এর সাহায্যে কালস্রোতের ধারা বেয়ে ঘটনার ক্রম অনুসরণ করে চলবো।

সময়ের ধারণা দেওয়ার সাথে সাথে সময় রেখা ইতিহাস শিক্ষকের এবং বিদ্যার্থীদের আর একটি সাহায্য করে। সময় রেখাটিকে মোটামুটি ভাবে ঘটনাবলীর খুব চমৎকার সংক্ষিপ্তসার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ সংক্ষিপ্তসার কেবল বই-এর বা খাতার পাতায় লেখা সংক্ষিপ্তসার নয়, এ

একেবারে চোখের সামনে "লেখ" হয়ে তার রেখার, সংখ্যার আর আখরের প্রতীক নিয়ে হাজির। চোখের সামনে এক নজরে ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের ঘটনাবলীর সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত, ক্রমিক ও মূর্ত্ত সংস্থাপন। এতে "Revision" এর কাজও বেশ ভাল হয়। এছাড়া একই সময়ে সঙ্ঘটিত বিভিন্নদেশে বা একই-দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তাদের একটি তুলনামূলক "লেখ" চোখের সামনে উপস্থাপিত করতে পারা যায় সময় রেখার সাহায্যে। আর তাতে বিদ্যার্থীদের তুলনামূলক ইতিহাস পাঠে খুব সাহায্য হয়। বিশেষ করে আজ আমরা যখন বিশ্ব ইতিহাস আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং ইতিহাস পাঠের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য যখন আন্তর্জাতিক বোধ শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে তোলা তখন এই ধরনের লেখ যে বিশেষ ফলপ্রসূ হবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

তাছাড়া লেখটির দুটি অক্ষ নিয়ে কোনো জিনিসের ক্রমবিকাশ দেখাতে পারি, অতীতের কোনো রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস উপস্থাপিত করতে পারি। এতে তো পরিচিত "লেখ" এসে আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয়ের কাছে বিষয়-বস্তুটিকে অতি নিপুণভাবে উপস্থাপিত করবে। এও তো এক প্রকারের সময় রেখা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। কথাটি হচ্ছে যে কোনো কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষক এই সময় রেখার উপকারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্দেহ পোষন করে থাকেন। তবে একথাও ঠিক যে ইতিহাসের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বেশী সংখ্যকই এই সময়রেখার উপকারিতা স্বীকার করে নেন। যাঁরা সময়রেখার উপযোগিতার উপর দৃঢ় আস্থা রাখেন তাঁরা সকলেই বলেন যে এই সময় রেখা বিভিন্ন রকমের প্রতীক সম্বলিত করে বিভিন্ন ভাবে যদি বিদ্যার্থীরা নিজেরাই শিক্ষক মশায়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করে তবে তার উপকারিতা হাজারগুণ বেড়ে যায়।

সময়রেখা ব্যবহার করবার সময় কতকগুলি কথা ইতিহাসের শিক্ষক মশায়কে মনে রাখতে হবে। সময় রেখার উপর যেন ঘটনার বা তারিখের বেশী ভিড় না হয়। তারিখগুলি হবে "mile stone"; "yard stone" যেন না হয়। ঘটনার ভিড় হলেই তারিখের সংখ্যায় আর ঘটনার নামের আখরের দৌলতে কিংবা যে প্রতীকই আমরা ব্যবহার করিনা কেন তার সংখ্যাধিক্যে সেটি হিজিবিজি, অস্পষ্ট, হয়ে যায়। বিদ্যার্থীর মন তাতে আশানুরূপভাবে আকৃষ্ট হয় না। যে প্রতীকই আমরা ব্যবহার করিনা কেন তার অর্থ যেন বিদ্যার্থীর

কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সময় রেখাটি যতগুলি ভাগে ভাগ করা হবে, সেগুলি যেন সমান হয়, যেন আনুপাতিক হয়। অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের অংশটি যেন কুড়ি বছরের অংশের সঙ্গে সমান না হয়, এবং এই দুটি ভাগের দৈর্ঘ্যের আনুপাতিক তারতম্য যতটুকু থাকা উচিত ততটুকু যেন থাকে। সময় রেখার মধ্যে যে সব সাল তারিখ বা ঘটনার সমাবেশ করা হবে সেগুলি যেন নির্ভুল হয়। সময় রেখাটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। সময়ের ক্রম যেন ঠিক ঠিক অনুসরণ করা হয়।

চিত্রলেখ ঃ—শ্রেণীকক্ষে বিদ্যার্থীরা যে জিনিস চাক্ষুষ পর্য্যবেক্ষণ করতে পারে না সেটি তাদের সামনে সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা শুধু বলার চেয়ে কোনো প্রতীকের সাহায্যে ভালভাবে সম্পাদিত হয় একথা আমরা জানি। আর বলা এবং তার সাথে সাথে দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন প্রতীকের সাহায্য নেওয়া তো আরো ভালো। ভালো এই জন্যে যে এই প্রক্রিয়াতে বিদ্যার্থীদের দুটি ইন্দ্রিয়, শ্রবনেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়, একই সঙ্গে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে যে সব প্রতীকের সাহায্য আমরা নিয়ে থাকি তার মধ্যে চিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিকতর ফলপ্রসূ। এর কারণ চিত্র অন্য অধিকাংশ প্রতীকের চেয়ে শিক্ষার্থীর মন ও মনঃসংযোগ সহজে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য প্রতীক চিহ্নের মত এখানে প্রতীক চিহ্নগুলির অর্থ বিদ্যার্থীদের কাছে ভেঙে বলার প্রয়োজন হয় না। চিত্র নিজেই অতি সহজে সে কাজটা করে।

তাই চিত্র-লেখ ব্যবহারে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন খুব ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। চিত্র-লেখ হচ্ছে এমন একশ্রেণীর "লেখ" যার মধ্যে চিত্রকে প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চিত্রের যে বিশেষ আবেদন শিক্ষার্থীর কাছে আছে তার প্রভাবে অতি সহজেই বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা চিত্র-লেখ দিতে পারে। চিত্রের প্রতীক ব্যবহার করা হয় বলেই এ ধরনের লেখ স্বয়ংসম্পূর্ণ, এটিকে ব্যাখ্যা করবার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয় না। তবে চিত্র-লেখ প্রস্তুত করবার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে যে চিত্রগুলি আমরা প্রতীক হিসেবে লেখটির মধ্যে ব্যবহার করবো সেগুলি যথাযথ ও বিষয়ানুযায়ী যেন হয়। চিত্রগুলি যেন সুন্দর হয়। যে বিষয়বস্তুর প্রতীক হিসেবে চিত্র ব্যবহার করা হচ্ছে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন যেন চিত্রটির বা চিত্রগুলির পক্ষে কষ্ট সাধ্য না হয়।

"ডায়াগ্রাম" ঃ—চিত্রলেখ ছাড়া ডায়াগ্রামের সাহায্য ও ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকমশায় নানাভাবে নিয়ে থাকেন। "ডায়াগ্রাম" বহুভাবে বহু রকমের

ঐতিহাসিক তথ্য অতি নিপুণ ও আকর্ষনীয় ভাবে উপস্থাপিত করতে পারে। "ডায়াগ্রামে" যে সকল প্রতীক ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা বহু প্রকারের হতে পারে। প্রতীক বহু প্রকারের হতে পারে বলেই প্রতীকটি ঠিক ঠিক বাছাই করা সম্ভব হয়। আর প্রতীক ঠিক ঠিক বাছাই হলেই "ডায়াগ্রাম"টি হয় হৃদয়গ্রাহী এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। খুব সহজেই শিক্ষার্থীর দৃষ্টি এবং মন এদিকে আকৃষ্ট করে বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে সহজে ধারণা দেওয়ার ক্ষমতা "ডায়াগ্রামের" বেশী। "ডায়াগ্রামটিকে সুন্দর ও মনোরম করবার অবকাশ যেমন যথেষ্ট আছে তেমনি এটী যথাযথ ভাবে তৈরী হলে এর সৌন্দর্য্যের আবেদন ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। খুব অল্প স্থান দখল করে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে বহু তথ্য এবং বহুপ্রকারের তথ্য খুব সহজ ভাবে উপস্থাপিত করবার ক্ষমতা এর অতুলনীয়। উপস্থাপিত তথ্য বা ঘটনা বা বিষয়বস্তুগুলি পরস্পর পরস্পরের সাথে যে সম্পর্কে সম্পর্কিত সেগুলি পরিষ্কার করে তুলে ধরতে "ডায়াগ্রামের" শক্তি অসাধারণ।

"ডায়াগ্রামের" সাহায্য যখন কোনো শিক্ষকমশায় শ্রেণীকক্ষে নেবেন তখন তিনি লক্ষ রাখবেন যে "ডায়াগ্রামটি" যেন নির্ভুল হয়। কোনো সামান্য অংশের সামান্যতম ভুল বা অশুদ্ধি এর সবই নষ্ট করে দিতে পারে। "ডায়াগ্রামের" একটি সামগ্রিক রূপ আছে, নিখুঁত ভাবে তৈরী হলে সে রূপ অনবদ্য। তাই দৃষ্টি রাখতে হবে এই সামগ্রিক রূপের সামান্যতম অঙ্গহানিও যেন না ঘটে। "ডায়াগ্রামে" ব্যবহৃত প্রতীকের অর্থ বিদ্যার্থীর কাছে যেন অতি সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রতীক যেন কোনমতেই দুর্ব্বোধ্য না হয়। প্রতীকগুলিকে যেন ব্যাখ্যা করে দেবার প্রয়োজন না পড়ে। যে প্রতীকগুলি ব্যবহার করবার জন্যে বাছাই করা হবে, সেগুলির যেন বিশেষ আবেদন থাকে, সেগুলি যেন 'জবড়জং' না হয়। ডায়াগ্রাম ব্যবহার করার, বা "handle" করার যেন বিশেষ অসুবিধে না হয়। "ডায়াগ্রামটি" আঁকা যদি বিশেষ আয়াসসাধ্য হয় বা সেটি আঁকতে নিপুণ কলাশৈলীর প্রয়োজন হয়, তাহলে অধিকাংশ ইতিহাস শিক্ষকের পক্ষে সেটি শ্রেণীকক্ষে আঁকা সম্ভব হবে না। ব্যবহৃত প্রতীকগুলির সাথে বিদ্যার্থীদের যেন সম্যক পরিচিতি থাকে। প্রতীক পরিচিতিতে যদি অনেক সময় চলে যায় তো প্রতীকের মাধ্যমে ইতিহাসের যে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হচ্ছে তার সাথে পরিচয় কি করে হবে?

চার্ট :—বিভিন্নধরনের লেখ ছাড়া ইতিহাস পঠন-পাঠনে চার্ট ব্যবহারের রীতি অনেক দিন থেকেই প্রচলিত আছে। নানা তথ্যের ও ঘটনার ভিড়

লেগে আছে ইতিহাসের পাতায়। ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নানা বিবর্তনের সূত্র ধরে বর্তমানের ক্রমপরিণতি। ইতিহাস পঠন-পাঠন তাই কিছুটা জটিল। নানা তথ্য এবং নানা রকমের তথ্য উপস্থাপিত হয় ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে। ইতিহাসের শিক্ষকমশায় কোনো শ্রেণীর (৭ম কি ৮ম শ্রেণীর) পাঠটীকা রচনা করেছেন দৈনন্দিন পাঠদানের জন্যে। ইতিহাসের যে বিষয়বস্তু তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন সেটি হয়তো যথা নিয়মে পাঠ 'যুনিটে' ভাগও করেছেন যথাযথ ভাবে। এই পাঠটীকা রচনা করে তিনি দেখবেন যে তার মধ্যে রয়েছে নানা তথ্য ও ঘটনা। সেগুলি আবার বিভিন্ন প্রকারের। সেগুলি যদি তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে নেন তাহলে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সুবিধে হয়। এই ভাগ করার পরও ঘটনাগুলির কার্য্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে। সেখানে 'চার্টের' সাহায্য বহু উপকারে আসে। "চার্টের" সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ভাগ করে যেমন অতি সহজে বিদ্যার্থীদের চোখের সামনে দেখানো যায় এবং ঘটনাগুলির ও তথ্যের কার্য্য-কারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ সহজ হয় তেমনি বিদ্যার্থীরাও একনজরে এই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ও সম্পর্ক-বিশ্লেষিত ঘটনা ও তথ্যগুলি দেখে অতি সহজেই সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

তাছাড়া কোনো বংশের লোকদের পরস্পর সম্পর্ক দেখাতে কোনো যুগান্তকারী ঘটনার কারণ ও ফলাফল প্রভৃতি অল্প পরিসরে নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করতে "চার্টের" প্রয়োজন হয়। কোনো জিনিসের বৃদ্ধি ও পরিণতি আগাগোড়া এক নজরে চোখের সামনে অতি সহজেই উপস্থাপিত করা যায় "চার্টের" সাহায্যে।

যে সব বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর প্রতীক-সম্বলিত-উপস্থাপন-রীতি মানচিত্র ও লেখ এই দুইটি নামে চিহ্নিত করে আলোচনা করা হয়েছে তারা কিন্তু সবই "চার্ট" এই নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সেটি অবশ্য হয় "চার্টের" অর্থ খুব ব্যাপকভাবে নিলে। তাই এখানে যে "চার্টের" কথা আমরা আলোচনা করছি সেটিকে বিশ্লেষণী চার্ট (Classification chart) এই নামে বিশেষিত করা যেতে পারে। এই বিশ্লেষণী 'চার্ট'কে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। "Table chart, Geneological chart, এবং Flow chait."। এই তিন রকমের চার্টের বিবরণ যে কোনো "audio-visual aids"-এর বই-এ দেখে নেওয়া ভাল। এ প্রসঙ্গ আর এখানে না আনাই যুক্তিযুক্ত।

চিত্র :—চিত্র বাস্তব নয়, বাস্তবধর্ম্মী। রঙে ও রেখায় মনের ভাব প্রকাশ করবার অপূর্ব্ব মাধ্যম এই চিত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাথরের বুকে আর মাটির গায়ে আঁচড় কাটাতে এর শুরু, আর পরিণতি বর্ত্তমানে রঙ-রেখার লীলায়িত তুলিকায়, ছেনী হাতুড়ির অনুপম মূর্ছনায়। শুরু হতে বর্ত্তমান অবধি মহাকালের এই প্রবাহের বিচিত্র বাঁকে বাঁকে ভাবপ্রকাশের মাধ্যম কতো না পাল্টেছে! পাথর মাটি, কাগজ ক্যানভাস কতো না ভাব-প্রকাশের আধার আবিষ্কৃত হয়েছে!

চিত্র যদিও বাস্তবের মত জীবন্ত নয়, কিন্তু জীবন্ত করে তুলে ইতিহাসকে, ইতিহাসের পঠন-পাঠনকে। তাই ইতিহাস পঠন-পাঠনে চিত্র একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট উপকরণ। এর সাহায্যে সুদূর অতীতের যে সব জিনিস বিদ্যার্থী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, সেই সব জিনিস বিদ্যার্থীর চোখের সামনে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। ইতিহাস পাঠে যে ধারণাগুলি বিমূর্ত্ত থাকে সেগুলিকে মূর্ত্ত করে তোলার প্রচেষ্টা করা হয় এর মাধ্যমে।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে পোট্রেট জাতীয় ছবিই আমাদের স্কুলগুলিতে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পোট্রেট রাজারাজড়ার বা বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সফলভাবে উপস্থাপিত করতে পারে। কিন্তু বিখ্যাত ব্যক্তি বা রাজারাজড়া ছাড়াও ইতিহাসের আরো অনেক কিছু আছে যা চিত্রের সাহায্যে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। বিশেষকরে ইতিহাস-পাঠ যদি "Developmental approach" অনুসরণ করে তাহলে চিত্রের ভূমিকা সেখানে অতুলনীয়। এ ছাড়া মানুষের ইতিহাসের উপাদান, মানুষের ক্রম-বিবর্ত্তন, পৃথিবীর বিভিন্নদেশের সভ্যতার তুলনামূলক উপস্থাপন প্রভৃতি চিত্রের সাহায্যে সার্থক ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন কোনো বিশেষ দেশের রাজা ও শাসকদের কথা তাদের শাসন কালের ক্রমানুসারে চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপিত করা যেতে পারে, তেমনি একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজা বা শাসকদের শাসনকালের তুলনামূলক প্রতিফলন হতে পারে এর সাহায্যে। খণ্ডছিন্ন জার্ম্মানী যে মহানায়কদের প্রতিভায় এবং প্রচেষ্টায় একসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল তাদের অবদান যেমন তাদের প্রত্যেকের চিত্রের সাহায্যে সহজবোধ্য করে পাঠে প্রাণসঞ্চার করা যেতে পারে, তেমনি ইতালীর স্বাধীনতালাভের কথাও চিত্রের সাহায্যে জীবন্ত করে তোলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাসের বেলায় সেই একই কথা প্রযোজ্য।

অনুরূপভাবে মানুষের সামাজিক ইতিহাসের ধাপে ধাপে যে ক্রমিক অগ্রগতির সূচনা চিহ্নিত হয়ে আছে,—আগুনের আবিষ্কার ও তার ব্যবহার, গৃহ, সাজপোষাক, আহার, বস্ত্র, অস্ত্র, অলঙ্কারাদি, তৈজসপত্র, লেখার কৌশলের উদ্ভাবন তার আখরের নানা বিবর্তন প্রভৃতির ধারাবাহিক কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের চোখের সামনে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের কথাই নয় ইতিহাসের যে কোনো দিকই ধরা যাকনা কেন, ধর্মের কথা, শিক্ষা সংস্কৃতির কথা, অর্থ-নৈতিক ইতিহাসের কথা,—সব ক্ষেত্রেই চিত্রের বিশেষ আকর্ষণ ও অবদান আছে। উদ্যমশীল ও প্রতিভাশালী ইতিহাস-শিক্ষকের হাতে চিত্র অপরূপ ভঙ্গিতে শ্রেণীকক্ষে বাঙ্ময় হয়ে উঠে।

ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত চিত্রের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। চিত্রকে সেখানে আমরা প্রথমেই অতি সাধারণ দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি—**Projected ও unprojected."** । এছাড়া পোট্রেট, ড্রইং পেন্টিং প্রভৃতি। নানা কৌশলে **flanelograph** পদ্ধতির সাহায্যে, **stereograph** এর ব্যবহারে, ইতিহাস শিক্ষকের প্রতিভা ও সৃজনী শক্তিতে, উদ্ভাবনী চিন্তায়, ব্ল্যাকবোর্ডে "স্কেচে," কার্টুনের ব্যবহারে, ফটোগ্রাফ পোষ্টারের আনুকূল্যে ইতিহাস পাঠে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে এই চিত্র।

শ্রেণীকক্ষে চিত্র ব্যবহার করবার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখবার আবশ্যকতা আছে। চিত্র যেন একেবারে ক্ষুদ্রাকৃতি না হয়। চিত্র যেন সুনির্ব্বাচিত হয়। নির্ব্বাচন যেন যথাযথ, উদ্দেশ্যমূলক ও অর্থবোধক হয়। শিক্ষকমশায় যে চিত্র বোর্ডে আঁকবেন না, সে চিত্র অন্ততঃ যেন ভাল হয়। ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত হবে সেগুলি সাধারণতঃ বেশীর ভাগই দৃশ্যের। এই দৃশ্যগুলির একটি বিশেষ আবেদন থাকে যদি তা কর্মচাঞ্চল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। ভারত ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতমা নায়িকা ঝাঁসীর রাণীর ধ্যানস্তব্ধ চিত্র অপেক্ষা, তাঁর ঘোড়ায়-চড়া তলোয়ার হাতে রণরঙ্গিণী চিত্র অধিকতর উপযোগী। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা যদি চিত্র নাড়াচাড়া করবার সুযোগ পায় তো তাতে ফল ভাল হয়। এতে ইতিহাস পাঠে খানিকটা বাস্তব রোধ আসে, চিত্রের খুঁটিনাটিগুলি শিক্ষার্থীরা দেখতে পায়, শিক্ষার্থীদের কৌতূহল মেটে। অবশ্য এতে চিত্র নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ও আছে। চিত্র কমদামী হবে। চিত্রটি নির্ভরযোগ্য হবে। রেখায় আর রঙে ইতিহাসের যে দৃশ্যটি ধরে রাখা হয়েছে তার মধ্যে

যেন ইতিহাসের সত্য থাকে। কল্পনার রমন্তিক (romantic)) সৃষ্টি হলে তাতে ইতিহাস পাঠের কাজে সাহায্য হবেনা। চিত্রটি শিক্ষার্থীদের বয়সানুপাতে, তাদের মণীষার বিকাশের তারতম্য অনুসারে, তাদের কাছে যথাযথ, হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য হওয়া চাই। চিত্রের আধিক্যে "পড়া ছেড়ে ছবিদেখার" নেশা যেন বিদ্যার্থীদের না পেয়ে বসে।

এই প্রসঙ্গে projected picture সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। যদিও আজ বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতে উদ্ভাবিত হয়েছে নানা যন্ত্রপাতি এবং তার ফলে পর্দার উপর সুনির্ব্বাচিত চিত্রের প্রতিফলনে শ্রেণী কক্ষকে প্রাণচঞ্চল করে তোলা যায়, তবুও ইংলণ্ডের অভিজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষকগণ এটির প্রাধান্য দিতে খুব বেশী উৎসাহী ও উৎসুক নন। তাঁদের মতে এগুলির বহুল প্রচলনে ও প্রবর্ত্তনে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে দেওয়া নেওয়ার টানা পোড়েনে যে শিক্ষার নির্মিতি তা ব্যাহত হয়। তাই তাঁরা সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন—"শিক্ষক মশায় যেন শ্রেণী কক্ষে mechanic ও projector operator এ পর্য্যবসিত না হন"। আমেরিকায় কিন্তু motion picture-এর সাহায্য ব্যাপকভাবে নেবার আগ্রহ দেখা যায়।

আগেকার যুগের নানা রকমের প্রোজেক্টর ছাড়াও আজকাল বহু উন্নত ধরনের Projector উদ্ভাবিত হয়েছে। motion picture শ্রেণী কক্ষে আজ আর অপরিচিত নয়। আমাদের দেশে অবশ্য এর প্রচলন নেই বললেই হয়। Motion Picture নিঃসংশয় ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর কাছে অতীত জীবন্ত হয়ে উঠে। দুরধিগম্য অতীতের বিস্মৃতির কিনারায় যে ঘটনাগুলির প্রায় বিলুপ্তি এসেছিল সেগুলিকে নানা কৌশলে বর্ত্তমানে জীয়ন কাঠির ছোঁয়ায় বাঁচিয়ে তোলা যায় এই motion picture-এর সাহায্যে। শিক্ষাক্ষেত্রে নানা কারণে এর অবদান অসীম। তবে বিদ্যার্থীদের আনন্দ বর্ধনের জন্যে বা একঘেয়েমী কাটানোর জন্যে মজা দেখবার বা দেখাবার মন নিয়ে এর ব্যবহার হলে শিক্ষার তাৎপর্যগত মূল্য এর কিছুই থাকেনা।

শ্রবণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য "aid" :—

শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর সময় শিক্ষক মশায় দৃষ্টি রাখেন যাতে করে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীর একাধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। তাই বলার সাথে নানাভাবে ম্যাপ, চার্ট, লেখ, চিত্র প্রভৃতির উপস্থাপন এবং নানা রকমের সাহায্য গ্রহণ। শ্রেণী কক্ষে বলার কাজটি সাধারণতঃ শিক্ষক মশায়ের। আলোচনা

বা প্রশ্ন-উত্তর যখন চলে তখন যে শিক্ষার্থীদের গলা শ্রেণী কক্ষে শোনা যায়না এমন নয়। শিক্ষক মশায় এবং শিক্ষার্থীদের বলা ছাড়াও শ্রেণীকক্ষে তৃতীয় পক্ষের গলাও শোনা যায়।

রেডিওর উদ্ভাবনে এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে চলছে। কোনো বিশেষ বিষয়ে বিখ্যাত এক পণ্ডিত হয়তো কিছু বলছেন, তাঁর বক্তব্য শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় রেডিওর সাহায্যে। রেডিওতে ছোটো ছোটো ঐতিহাসিক নাটক বা দৃশ্যনাট্য ও হতে পারে। এতে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন ব্যক্তির গলার স্বরের পার্থক্যে, আবেগভরা কণ্ঠে, তাদের কথোপকথনের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে, নানা কৌশলের সাহায্যে কোনো এক বিশেষ দৃশ্যের পটভূমিকা রচনার চাতুর্য্যে নাটক বা নাটিকার মাধ্যমে পরিবেশিত বিষয় বস্তুটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে বিদ্যার্থীদের কাছে। রেডিও শ্রেণী-কক্ষের পাঠে বৈচিত্র্য আনে। শিক্ষক মশায়ও অপরিচিত কণ্ঠের স্বর তাঁর ছাত্রছাত্রীর উপর কি প্রভাব বিস্তার করে তা দেখতে পারেন। কোনো আধুনিক কালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কোনো একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন মুহূর্ত্তে কিছু বলছেন সেটিও রেডিওর মারফৎ শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

আজকাল আমাদের দেশে আকাশবাণী কল্‌কাতা কেন্দ্রের উদ্যোগে বিদ্যার্থীদের জন্যে আসরের মাধ্যমে শুধু ইতিহাস নয় স্কুলপাঠ্য অন্যান্য বিষয়গুলির পরিবেশন করবার ব্যবস্থা তাঁদের অনুষ্ঠান সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বহু অভিজ্ঞ শিক্ষক মনোজ্ঞ করে বিষয় বস্তুটি বিদ্যার্থীদের অনুধাবনের জন্যে উপস্থাপিত করে থাকেন। কখনো বা কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছোট্ট একটি নাটিকার সাহায্যে বিষয় বস্তু উপস্থাপিত হয়ে থাকে। এতে বিদ্যার্থীদের কাছে বিষয় বস্তুটি হৃদয়গ্রাহী হয়। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। যাতে করে এই অনুষ্ঠানসূচীকে স্কুলের সময়সূচীর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় সময়ও সেইজন্যে করা হয়েছে ২॥০ টা থেকে ৩টা। তবে এতে প্রধান অসুবিধে, বিদ্যালয়ের সময়সূচীর সাথে রেডিওর অনুষ্ঠান সূচীর মিল করে নেওয়া। তাছাড়া স্কুলে যা পড়া হচ্ছে তার সাথে রেডিও অনুষ্ঠান সূচীতে যে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার সমতা রক্ষা করা। আন্তরিক চেষ্টায় যে এ সমস্যা দূর হবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

আমদের দেশের স্কুলগুলিতে টেলিভিসনের বহুল প্রচার ভবিষ্যতের জিনিস। দিল্লীতে পরীক্ষামূলকভাবে দুএকটি স্কুলে এর প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে মাত্র। এতে খরচ অনেক। আমাদের গরীব দেশে তাই এর ব্যাপক

প্রচলন হয়তো বিলম্বিত হবে। টেলিভিসনের সুবিধে এই যে শোনার সাথে যিনি বলেন তাঁকেও দেখা যায়। তাই এখানে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সাথে দর্শন ইন্দ্রিয়ও সক্রিয় হয়। রেডিওর মাধ্যমে বক্তাহীন, দৃশ্যহীন কথা শোনার মাঝে নিষ্প্রাণ থমথমে ভাব; টেলিভিসনে এসে দৃষ্টির আলোক বন্যায় এবং দেখার আনন্দে বিষয়-বস্তুটি অপরূপ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

এছাড়া গ্রামোফোন রেকর্ড বা "টেপ রেকর্ডার" এর সাহায্য আমাদের ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে গ্রহণ করতে পারি। এতেও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বক্তৃতা আমরা ধরে রাখতে পারি। এ বক্তৃতা অবশ্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন হবে। কিংবা কোনো ছোটো ঐতিহাসিক নাটক রেকর্ড করে রেখে দিতে পারি। শ্রেণী কক্ষে উপযুক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় বস্তর পাঠ দেওয়ার সময় এই রেকর্ড গুলির সাহায্য নিলে ঐ পাঠ শিক্ষার্থীর মনে দাগ ফেলতে পারবে।

কিন্তু একটা কথা রেডিও ফোনোগ্রাফ প্রভৃতির সাহায্য নেবার সময় আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা যে এগুলি নিছকই সাহায্য। সমস্ত পাঠটির একটি অঙ্গ হিসেবে হয়তো ধরে নেওয়া যেতে পারে কারণ aid এর ব্যবহার পাঠের একটি অঙ্গ বলে পরিগণিত হবার দাবী রাখে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠনে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে জীবন্ত আলোচনায় শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের এবং শিক্ষকের উপর শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতার প্রতিফলনে যে সতেজ, সাবলীল পরিবেশ গড়ে উঠে,—রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে তার একাংশও হয়না। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক মশায় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত ভাবে জানেন। তাদের প্রত্যেকের মনীষা ও মনীষার বিকাশ শিক্ষক মশায়ের কাছে পরিচিত। কাজে কাজেই তিনি শ্রেণী কক্ষে স্থান কাল পাত্র ভেদে পরিবেশ বিচার করে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারেন। রেডিওর বক্তৃতায় বা কথিকায় এ সব হবে কি করে?

তাছাড়া আর একটি জিনিস। নতুনের বা নতুনত্বের মোহে আমরা যেন কিছু না করতে যাই। রেডিওর সাহায্য নিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে গিয়ে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন যেন কেবল আনন্দ পাওয়া আর আনন্দ দেওয়াতে পর্য্যবসিত না হয়ে দাঁড়ায়।

ভ্রমণ:—ইতিহাস আমরা শ্রেণীকক্ষে পড়াই। সত্যিকথা বলতে কি ইতিহাস-পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত তথ্যগুলির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় সাধন করতে গিয়ে অনেক কৃত্রিমতার আশ্রয় আমরা গ্রহণ করি এবং শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির উপর অনেকটা নির্ভর করি। বস্তুতঃ ইতিহাসের

শ্রেণীকক্ষে মডেল, চিত্র, মানচিত্র, চার্ট প্রভৃতির আমদানি তো এই কথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করে। ইতিহাসের ঘটনা ঘটে কোনো স্থানে আর কোনো কালে। ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবঘটনাই ঘটে গেছে অতীতকালে, আর এই সব ঘটনার স্থান আমাদের ইতিহাসের শ্রেণী কক্ষ নিশ্চয়ই নয়। যে যুগান্তকারী ঘটনা ইতিহাসের ধারায় এনেছে নতুন প্রবাহ, যে মহানায়কেরা যুগে যুগে নানা আবিষ্কারে আর উদ্ভাবনে, চিন্তায় এবং কাজে ইতিহাস রচনা করে গেছেন,—সেই সবের সাথে সাক্ষাৎ যোগাযোগ আজ আর সম্ভব নয়। তাই ইতিহাসের শ্রেণী কক্ষে aids charts এর প্রয়োজন হয়। ইতিহাস পাঠে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কল্পনার আশ্রয় কিছু নিতেই হয়।

কিন্তু একথা স্বীকার্য্য যে ইতিহাসের রচনা শ্রেণী কক্ষের বাইরে। ঐ চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে ইতিহাসের রচনা হয়নি। শ্রেণীকক্ষের বাইরে যে বৃহত্তর জীবন, যে বৃহৎ পরিবেশ সেইখানেই ইতিহাস রচনা হয়েছে, হচ্ছে। ঐ যে ভাগিরথীর পশ্চিমকুলে পুরাণো গির্জ্জাটি (ব্যাণ্ডেল চার্চ) কালের কুটিল ভ্রুকুটিকে অবহেলা করে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ওর সাথে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের অনেক ঘটনা। তেমনি পুরাণো মন্দির, মসজিদ, বন্দর, কেল্লা প্রভৃতির মধ্যে প্রাচীন রয়েছে জীবন্ত হয়ে। ঐ যে সাঁওতাল পল্লীতে মাদল আর বাঁশী বাজছে, আর নাচ চলছে বাঁশের বাঁশীর সুরে আর মাদলের তালে তালে, ওখানে আছে ইতিহাসের মালমশলা। মানবসভ্যতার কোন স্তরে ঐ সাঁওতালরা আছে ; আমাদের আচার আচরণ, সাজপোষাক, ভাষা, শরীরের গঠন প্রভৃতির সাথে ওদের ঐ গুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে ইতিহাসের তথ্যের সাথে খানিকটা পরিচয় হয়। শুধু aids এর সাহায্যে কিংবা শিক্ষকমশায়ের কুশলী বিশ্লেষণে বা উপস্থাপনে ইতিহাসের সঙ্গে বাস্তবতা সম্যকরূপে সংযুক্ত করা যেতে পারে না। আমাদের আগে যারা বাস করতো ইতিহাস যে তাদের জীবনের সাথে জড়িয়েছিল যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের যুগের ইতিহাস। যারা আমাদের যুগের ইতিহাস পড়বে একশো বছোর পরে তারা তো ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে বসে আমাদের এই কান্না হাসির দোলায় দোলখাওয়া জীবনের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় করতে পারবে না। তাই আমরা যে মানুষের কথা পড়ছি ইতিহাসের পাতায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে চাক্ষুষ পরিচয় হবার কোনো উপায় আজ আর নেই। তবে একথাও ঠিক যে তাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার সমষ্টিই তো ইতিহাস, আর এ ঘটনাগুলি ঘটেছিল ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষের

বাইরে বৃহত্তর জীবনের পরিবেশে। ইতিহাসের এ বোধ জাগাতে হলে, শ্রেণীকক্ষের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে বাইরে আসতে হবে।

ইতিহাস পাঠকে বাস্তব, প্রকৃত ও প্রাণবন্ত করে তোলবার জন্যে তাই এই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুল থেকে ভ্রমনে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। একথা স্বীকার্য্য যে ইতিহাস পাঠের এই উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুল থেকে ভ্রমনে যাওয়া আমাদের দেশে আজও নিতান্ত বিরল। যদিও কখনো সখনো যাওয়া হয় ভ্রমণে, কিন্তু সে অনেক উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তালগোল পাকিয়ে সে ভ্রমণ শিক্ষার্থীদের দেয় খানিকটা আনন্দ। নতুন নতুন জিনিস দেখার বিস্ময়, ভিন্ন জায়গায় দল বেঁধে যাবার প্রাণপ্রাচুর্য্য তাছাড়া আর বিশেষ কিছু নয়।

ইতিহাসের ঘটনার সাথে বিজড়িত স্থান সমূহে ভ্রমণ ইতিহাস পঠনপাঠনের একটি অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। এর অভাবে ইতিহাসকে অনেক সময়েই বইএ পড়া নিছক গল্প বলেই মনে হয়ে থাকে। কারণ সে পড়ার সাথে বাস্তবের কোন সংযোগ নেই। ইতিহাস যে সত্য, নিছক সত্য বই আর কিছুই নয় অনুরূপ ভ্রমণে সে বোধ জাগে। মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার কথা বইএ পড়া এক জিনিস আর সেখানে গিয়ে, মাটি খুঁড়ে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে তা চাক্ষুষ দেখা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সেখানে বইএ পড়া ও ছবিতে দেখা কি মাষ্টার মশায়ের মুখে শোনা জিনিসের সাথে চাক্ষুষ পরিচয়। বাস্তবের সাথে অদ্ভুত একাত্মতা। ইতিহাস অভাবনীয়রূপে প্রকৃত সেখানে।

নীচের শ্রেণীর ছাত্রদের, যাদের পরীক্ষা ভীতি জাগেনি তাদের স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় ইতিহাসের মাধ্যমে ইতিহাসের সাথে বাস্তব পরিচয় সহজ হয়। যে জায়গায় স্কুলটি অবস্থিত তার ধারে পাশে যে সমস্ত জায়গায় প্রাচীন ঐতিহ্যের কিছু কিছু নিদর্শন আছে সেই সমস্ত জায়গায় শিক্ষার্থীদের ভ্রমণে নিয়ে যেতে পারা যায়। কোথায় হয়তো একটি মেলা বসে অনেক কাল আগে থেকে। মেলার স্থানে মেলার দিনে মেলা দেখতে যেতে পারা যায়। সেই মেলার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের বলা যেতে পারে। কোন প্রাচীন মঠ, মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা, অনুরূপ ভাবেই ভ্রমণ করবার স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়, এবং সেগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট আগেকার ঘটনা গল্পের আকারে শিক্ষার্থীদের কাছে বলা চলতে পারে। এ ধরনের ভ্রমণ অবশ্য যারা সবে ইতিহাস পড়তে শুরু করেছে তাদের জন্যে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই বয়েসের শিক্ষার্থীরা তাদের অতীত সম্বন্ধে যেমন কৌতুহলী তেমনি

কৌতূহলী তাদের আশে পাশের জিনিস জানবার জন্তে। শিক্ষার্থীর চারপাশের জায়গা এবং জিনিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ইতিহাস জানার পরিপ্রেক্ষিত। এমনি করেই স্থানীয় ইতিহাস জানবার মাধ্যমে হবে তার ইতিহাসের সাথে পরিচয়। আর এ পরিচয়ের মধ্যে থাকবে ইতিহাস সম্বন্ধে অনির্মোক এবং অখণ্ড বাস্তবতা বোধ। ইতিহাস যে প্রকৃত, এবং জীবন্ত এ ধারণা তার এমনি করেই গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় ইতিহাসের প্রভাব এই বয়েসের বিদ্যার্থীদের উপর অপরিসীম। নানা কৌশলে, নানা উদ্ভাবনে প্রতিভাবান ইতিহাসের শিক্ষক স্থানীয় ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন,—আর সব কৌশল ও উদ্ভাবনের সব থেকে সেরা উপায় যে এই ভ্রমণ একথা নিঃসন্দেহ।

এর পর যখন বিদ্যার্থী কিছু বড়ো হয়ে উঠলো, সে তখন জাতীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বইতিহাস পড়া শুরু করলো। আমাদের দেশের বাইরে ঐতিহাসিক স্থান সমূহ ভ্রমণ করার কল্পনা আকাশ কুসুম। সেখানে চিত্র, মানচিত্রই ভরসা। কিন্তু আমাদের দেশেই যে সব ঐতিহ্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক স্থানগুলি রয়েছে সেগুলি গিয়ে দেখে এলে অনেক কাজ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে সমস্ত জায়গায় কোনো খনন কার্য্য হয়েছে বা হচ্ছে, কি যে সমস্ত জায়গায় কোনো বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির, মসজিদ বা গির্জ্জা, কোনো প্রাচীন দুর্গ বা তার ধ্বংসাবশেষ, কোন স্মৃতিস্তম্ভ বা সৌধ কোনো বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতি আছে,—সে সব জায়গায় ভ্রমণে যেতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে আমাদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে সব সময়। দূরে যাওয়া হয়তো সম্ভব হবেনা তাই কাছাকাছি যে সব অনুরূপ ঐতিহাসিক স্থান আছে সেগুলি দেখার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঐতিহাসিক স্থানগুলি ছাড়া আমরা বিদ্যার্থীদের মাঝে মাঝে জাদুঘরেও নিয়ে যেতে পারি। ইতিহাসের যে অধ্যায়ে পড়া হচ্ছে জাদুঘরে গিয়ে তার সাথে সংশ্লিষ্ট নিদর্শনগুলিই আমরা একদিনে দেখবো। একদিনে নানা জিনিস বা 'সব' দেখতে গেলে সব তালগোল পাকিয়ে যাবে। স্তম্ভে শিলায় বা তাম্র শাসনে যে লিপি প্রাচীনকালে উৎকীর্ণ হয়েছিল সেগুলির মধ্যে রয়েছে নানা ঐতিহাসিক তথ্য। স্তম্ভলিপি তাম্রশাসন ছাড়াও ইতিহাসের বহুতথ্য সম্বলিত বহুধরনের নিদর্শন জাদুঘরে আছে। অতীত যেন সেখানে মূর্ত্ত। বিখ্যাত স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, সুঠাম প্রতিমা গঠনের অনবদ্য কৌশলে রচিত কতো দেবদেবীর মূর্ত্তি, প্রাচীণকালের চিত্র, পুরাকালের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মুদ্রা প্রভৃতি দেখে অতীত কালের সাথে শিক্ষার্থীর নৈকট্য স্থাপিত হবে।

প্রাচীণ কালে যারা ঐগুলি রচনা করেছে তাদের সাথে একাত্মতা হবে।

এখন কথা হচ্ছে যে এই ঐতিহাসিক স্থান সমূহে বা জাদুঘরে বিদ্যার্থীদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কেমন হবে, অর্থাৎ শ্রেণী অনুযায়ী না স্কুলের সব ছাত্রদের ভাগ করে। ছোটদের একদিন। বড়োদের একদিন। একদিনে, ছোটদের বাদ দিয়েও, সবাইকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই তাদের নিয়ে যেতে হবে ক্ষেপে, ক্ষেপে। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের দুটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আবার কোনো কোনো মহলে এই ধারণাই পোষণ করা হয় যে অনুরূপ ভাবে স্কুলের সব ছাত্রদের দুই ভাগে ভাগ না করে স্কুলের শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ করে ভ্রমণেয় ব্যবস্থা করা ভাল কারণ এটা অধিকতর ফলপ্রসূ। অধিকতর ফলপ্রসূ এই জন্যে যে যে শ্রেণীতে যা পড়া হচ্ছে বা হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে হবে এই ভ্রমণ। তাছাড়া স্কুলের একটি শ্রেণীতে প্রায় সমান বয়সের শিক্ষাথীরাই থাকে এবং সেই জন্যেই তাদের মনীষার বিকাশ ও প্রায় সমান মানের। সমান মানের এই শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে ভ্রমণে যেমন শিক্ষক মশায়ের সুবিধে হবে তেমনি এটি শিক্ষাপ্রদ হবার পথেও বিশেষ কোনো অন্তরায় থাকবেনা। তাছাড়া ছাত্র সংখ্যা এতে কম থাকবে। এতে ও সুবিধে বড়ো কম হবে না। তাই এই সমস্ত বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে এক এক শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের পৃথক পৃথক ভাবে ভ্রমণ অনুমোদন করেন অনেকে।

আজকাল শিক্ষামূলক ভ্রমণ আমাদের স্কুলগুলিতে ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করছে। এই সব শিক্ষামূলক ভ্রমণগুলির সাথে ইতিহাস শিক্ষাসংক্রান্ত ভ্রমণের অবকাশও নিশ্চয় থাকবে। ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে বিজড়িত মৌলিক দ্রব্যসামগ্রী অত্যন্ত কম। সেগুলি সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাই এই অভাব পূরণ করার জন্যেই মাঝে মাঝে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের ভ্রমণে বিদ্যার্থীদের মনে ইতিহাসের বাস্তবতা সম্বন্ধে ধারণা আনবে, ইতিহাস যে নিছক গল্প নয় এই বোধ তাদের হবে। শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে নির্জীব নীরস, একটানা পঠনপাঠনে যে বিস্বাদ একঘেয়েমী ওত পেতে বসে থাকে তার হাত থেকে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই রক্ষা পাবেন। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় যে সব বিষয় শিক্ষার্থী পড়ে তাদের দৃঢ়ভিত্তিক বাস্তব জ্ঞান ও চাক্ষুষ পরিচয় হবে সেই সব জিনিসের সাথে সংস্পর্শে এসে। ইতিহাস পাঠের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কাজে লাগাতে পারা যেতে পারে এই সব শিক্ষাভ্রমণগুলিকে।

এই ভ্রমণগুলি নিছক প্রমোদ ভ্রমণে পর্য্যবসিত যেন না হয় সেদিকে লক্ষ

রাখতে হবে। ভ্রমণগুলি হবে শিক্ষামূলক, উদ্দেশ্যমূলক। তাই বলে ভ্রমণে গিয়ে যেন সেখানে মাষ্টার মশায় "ক্লাস" না নেন ; কিংবা শিক্ষক মশায়ের সদা-সতর্ক দৃষ্টি যেন প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে শিক্ষার্থীদের অল্প এই মুক্তির আনন্দ নষ্ট না করে দেয়, "টাস্কের" বোঝায় এ ভ্রমণ যেন শিক্ষার্থীদের কাছে স্বাদহীন না হয়ে যায়। কি কি দেখতে হবে, কি ধারণা নিতে হবে, কোন্ কোন্ বিশেষ বিশেষ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে,—সেগুলি শিক্ষক মশায় পূর্ব্বাহ্নেই ঠিক করে রেখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের সেই মত নির্দ্দেশ দেবেন। ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে আলোচনায় বা প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে যা যা দেখা হয়েছে, যা তথ্য আহরণ করা হয়েছে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে সেগুলিকে দৃঢ়ভিত্তিতে পাকা করে নেওয়া। কিন্তু একাজগুলি করার মধ্যে শাসনের তর্জ্জনী কি পরীক্ষাভীতির হুমকি যেন না থাকে।

ইতিহাস পাঠ ও নাটক :—ইতিহাস পাঠে নাটকের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই বিশেষ ভূমিকার কথা শিক্ষকমশায় যদি স্মরণ রাখেন তাহলে ইতিহাসের বিষয়বস্তু সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ উপস্থাপনে শিক্ষার্থীদের মন আকর্ষণ করতে পারে, আর উপস্থাপন সাফল্যের তৃপ্তিতে ভরে উঠে ফলপ্রসূ হয়। ইতিহাস পাঠে নাটকের যে এই বিশেষ ভূমিকা এর কারণ আছে। প্রথমতঃ আমরা জানি নাটকের এবং নাটকীয় মুহূর্ত্তের বিস্ময়কর আবেদনে মানুষের মন আবিষ্ট ও অভিভূত হয়। দ্বিতীয়তঃ নাটকের মাধ্যমে নাট্যরস-ঘন-চরিত্র চিত্রণে এবং ঘটনার পারম্পর্য্য ও কার্য্যকারণ বিশ্লেষণে শিক্ষার্থীর কাছে অতীত—যে অতীতের সাথে শিক্ষার্থীর বাস্তব সংযোগ আদৌ নেই বা কোনো কালেই সম্ভব নয়—বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থীর তরুণ বয়েসে নাটকের আবেদন শিশু বা পূর্ণবয়স্ক লোকের অপেক্ষা বেশী থাকে। চতুর্থতঃ যারা নাটক অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে এবং যারা নাটক দেখে, উভয় পক্ষই অনুভব করে নাটকের দৃপ্ত আবেদন।

নাটকের এবং নাটকীয় মুহূর্ত্তের বিস্ময়কর আবেদনে মানুষের মন আবিষ্ট হয় একথা আমরা জানি। নাটকের মূল কথা হচ্ছে কার্য্য (to act or to do)। বই-এর পাতায় পড়ে কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে আমরা যে সব চরিত্রের কাছাকাছি আমাদের মনকে পাঠাবার চেষ্টা সাধারণতঃ করে থাকি নাটকের অভিনয়ে সেই সব চরিত্রগুলিই আমাদের চোখের সামনে মঞ্চে অথবা পর্দ্দায় এসে দাঁড়ায়, কথা বলে, কাজ করে। তারা জীবন্ত হয়ে উঠে চলায় বলায়, আচারে আচরণে। আর যে সব ঘনটাগুলি আমরা কোনো দিনই দেখিনি,

সেই সব ঘটনাগুলি আমাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকে একটির পর একটি। যে গতির ছন্দে আমাদের জীবন গতিশীল, নাটকে সেই সামগ্রিক গতির অপূর্ব্ব সমাবেশ। প্রাণ চাঞ্চল্যের অপরূপ অনুভূতি। কর্ম্মমুখর এই নাট্যরূপে মনো-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী লেখনীর অদ্ভুত কলাকৌশল—হর্ষে বিষাদে, মিলনে আনন্দে, বিয়োগে ব্যথায়, সন্দেহে সংশয়ে, প্রণয়ে হিংসায় আবেগ আর অনুভূতিতে; এমনিতরো নানা ধরনের মানবীয় আবেদনে সমন্বিত হয় এই রচনা। অসাধারণ সার্থকতার কলাশৈলীতে মনোবিজ্ঞানের জাদুকরী রূপায়ণ। এই নাট্যরূপে মানুষের মন আবিষ্ট না হয়ে পারে না।

মানব মনে নাটকের বিস্ময়কর এই আবেদনের পটভূমিকায় কোনো ঐতিহাসিক নাটক যখন উপস্থাপিত করা হয় শিক্ষার্থীর সামনে, তখন এক নিমিষে স্থান আর কালের ব্যবধান মুছে দিয়ে নাট্যরূপাঙ্কিত বিষয়বস্তুটি বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক নাটকে অতীতের কোনো অভিজ্ঞতা বা কোনো ঘটনাকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বর্ত্তমানে উপস্থাপিত করবার প্রচেষ্টা থাকে। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির জীবন্ত রূপায়ণে—তাদের আচার আচরণে, তাদের চরিত্রের নানা খুঁটিনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনায়—নাটকে আধৃত বিষয়-বস্তুটির একটি সামগ্রিক রূপ চোখের সামনে নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠে। যে সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাসের, কিংবা যে সব ঘটনা গুরু প্রভাবে ইতিহাসের ধারাকে করেছে নিয়ন্ত্রিত সেই সব যুগান্তকারী ঘটনাবলীর কার্য্যকারণের সম্যক ও চাক্ষুষ বিশ্লেষণে কালের ভাঙাগড়ার একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়ে যায় মনের মণিকোঠায় অম্লানরেখায় আর অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে।

নাটকীয় মুহূর্ত্ত রোমাঞ্চকর। শিক্ষার্থীর তরুণমনে রোমাঞ্চের আবেদন মনোবিজ্ঞান-স্বীকৃত। নাটকের ঘটনারাশির আবর্ত্তে, চিত্রসংযোজনায়, চরিত্র রচনায়, আবেগ উদ্বেগের যে নাটকীয় মুহূর্ত্তগুলি একটির পর একটি আসে যায়, মনে দোলা লাগায়, তার মধ্যে তো রীতিমত রোমাঞ্চ। আর রোমাঞ্চ বলেই শিক্ষার্থীর হৃদয়গ্রাহী।

নাট্যরূপের মধ্যে নাটকের এবং নাটকীয় মুহূর্ত্তের দৃপ্ত আবেদনে নাটকের মধ্যে সংস্থাপিত চরিত্র ও ঘটনার সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও একাত্মতা অনুভব করে থাকে যারা নাটক-অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে আর যারা নাটক-অভিনয় দেখে, উভয় পক্ষই। শিবাজী চরিত্রের যে অভিনয় করবে সেতো অভিনয়ের সময়টিতে পুরাপুরি শিবাজী। তা নইলে শিবাজী চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ হবে কি করে? সাজে পোষাকে, পুরচুলা আর দাড়ির 'মেকআপে', মহারাজ

শিবাজীকে তো দর্শকরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছে তাদের সামনে। আর আকারে ইঙ্গিতে, ভাবে ভঙ্গিতে, কথায় কাজে মারাঠা-নায়ক শিবাজী একটি স্থায়ী দাগ ফেলে চলেছেন দর্শক মনে। আর শুধু একটি চরিত্রই নয়, নাট্যরূপাঙ্কিত প্রতিটি চরিত্রই এমনি ভাবে বাস্তব হয়ে উঠে। নাট্যরসে আপ্লুত হয়ে নাটকের কাহিনীর গতির ছন্দে অভিনয়কারী ও শ্রোতা নাটকে উপস্থাপিত চরিত্রগুলির সাথে নিবিড় নৈকট্যে একাত্মতা অনুভব করে থাকে।

ঐতিহাসিক বিষয় বস্তুগুলিকে নাট্যরূপের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা খুব চমৎকার 'প্রোজেক্ট' হ'তে পারে ইতিহাস পঠন-পাঠনে। বিষয়বস্তুর সামগ্রিক রূপাঙ্কন করবার জন্যে এবং ঘটনাগুলি পারম্পর্য্য রেখে সাজাবার জন্যে প্রয়োজন হবে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পড়বার, নানা ধরনের তথ্য আহরণ করবার, নৈর্ব্যক্তিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেগুলির বিশ্লেষণ করবার। চরিত্র চিত্রণে যেমন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তেমনি তাদের বাক্‌বিন্যাসে ভাষার সাবলীল ভঙ্গি আয়ত্ত করতে হয়। ইতিহাস-শিক্ষকের সহায়তায় এবং নির্দ্দেশে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই করবে নাটক রচনা, আর সাজ পোষাক, মঞ্চ, দৃশ্য প্রভৃতি সব কিছুই করে নেবার 'প্রোজেক্ট' যদি নিতে পারা যায় তাহ'লে নাটকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আহরণ করবার প্রয়োজন হবে। কাজে কাজেই নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করা বা পর্দ্দায় প্রতিফলিত করার মধ্যে দিয়ে নানা ধরনের মডেল তৈরী করার কাজও হয়ে থাকে।

নাটকীয় মুহূর্ত্তে যে আবেগ প্রক্ষোভ, সন্দেহ সংশয়, আর হাসিকান্নার দোলা লাগে মনে, তাতে উদ্গতিতে শিক্ষার্থীর তরুণ মন সতেজ হয়, অবদমন কে পরিহার করে শিক্ষার্থীর মনের সহজ ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও সম্ভব হয়।

ঐতিহাসিক এই নাট্যরূপের প্রকার ভেদ আছে। এর প্রকার ভেদ করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে পুরা নাটক, চতুর্থ বা পঞ্চম অঙ্কবিশিষ্ট। এই ধরনের নাট্যরূপের মাধ্যমে কোনো বিষয়বস্তুর সমগ্রটুকু, পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। এ নাটক উপস্থাপিত করতে স্বভাবতই সময় লাগে। এ ধরনের নাটক সমগ্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে অভিনেতা অভিনেত্রী বেছে নিয়ে করানো যেতে পারে। আর তাও বছরে বড় জোর তিনটি, গ্রীষ্মাবকাশের প্রাক্কালে, পূজাবকাশের পূর্ব্বে এবং বাৎসরিক পরীক্ষার পর স্কুলে পারিতোষিক বিতরণের সময়। পুরা নাটক ছাড়া ইতিহাসের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় একএকটি শ্রেণীতে (সাধারণতঃ উঁচু শ্রেণীগুলিতে)

সীমাবদ্ধ রেখে মাসে একটি করে ছোটো নাটিকার (একাঙ্ক নাটিকার) রূপ দিতে পারেন। এই ধরনের নাটিকাটি তখন সারা মাসের "প্রোজেক্ট" হয়ে দাঁড়াবে। পড়া, মডেল তৈরী করা, সাজপোষাক তৈরী করা, দৃশ্য আঁকা প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ এই "প্রোজেক্টের" মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠনের সময়ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর নাট্যরূপ উপস্থাপিত করতে পারেন শিক্ষকমশায়। তখন এটি খুব ছোটো আকারে কোনো একটি যুগান্তকারী ঘটনা বা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর নাট্যরূপ অঙ্কন করে শিক্ষার্থীদের কাছে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে, অল্প শিক্ষার্থীর মধ্যে অভিনয়কারীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ রেখে এ নাট্যরূপ একটু চেষ্টাতেই খুব ফলপ্রসূ করা যায় এবং এর মাধ্যমে ইতিহাসের বিষয়বস্তু খুব মনোজ্ঞভাবে এবং সার্থকভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়।

বিষয়-বস্তুর নাট্যরূপ অবশ্য নানা উপায়ে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করা যায়। এগুলির মধ্যে দৃশ্যনাট্য (Pageant), ছায়ানাট্য (Shadow play), আলেখ্যদর্শন (Tableau), Puppet show প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলির বিস্তারিত বিবরণ যে কোনো একখানি "Audio visual aids"-এর বই থেকে দেখে নেওয়া ভাল।

শ্রেণী-কক্ষে পঠন-পাঠনের সময় দশমিনিট কি পনরমিনিট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় এমনি কোনো বিষয়ের প্রাসঙ্গিক নাট্যরূপ উপস্থাপিত করবার উপায় (দৃশ্যনাট্য বা ছায়ানাট্যের মাধ্যমে, আলেখ্যদর্শন বা Puppet show-এর সাহায্য নিয়ে, কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের স্বল্পকালীন অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে) শিক্ষকমশায় সবদিক ভেবে, অবস্থা এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে ঠিক করে নেবেন। এই ধরনের সাহায্য নিলে ইতিহাস পাঠে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

ইতিহাস পাঠে মডেল :—ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে মডেলের আবশ্যকতা যেমন প্রচুর এর উপকারিতা ও তেমনি সর্ব্বজনস্বীকৃত। শ্রেণীকক্ষে মডেলের যে আবশ্যকতা আছে তার স্বীকৃতি মিলে অভিজ্ঞ শিক্ষক মশায়দের মডেল ব্যবহারের ব্যাপারে তৎপরতায় এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহে। শ্রেণীকক্ষে মডেল তৈরী করা হবে, আর তা ইতিহাসের পাঠে কাজে লাগবে,—এ দুটোই প্রয়োজন, তৈরী করাটা এবং তৈরী মডেল "aid" হিসেবে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করাটা। ইতিহাস এমনি একটি বিষয় যে এর ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সঠিক দ্রব্যগুলি আমরা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে

পারি না। এই সব জিনিস অত্যন্ত দুর্লভ। সুদূর অতীতের কোন এক অধ্যায়ে সঙ্ঘটিত কোন এক ঘটনার সাথে জড়িত ঠিক ঠিক জিনিসটি শ্রেণীকক্ষে পাওয়া দুরূহ। কোনো কোনো জিনিস, যেমন প্রাচীন মুদ্রা বা প্রাচীন অস্ত্র বা অলঙ্কার প্রভৃতি সংগ্রহ করা যায় বটে কিন্তু সে কাজ সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এই সব নানা কারণে ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে "মডেল" এসেছে। মডেল আসল বস্তুর নকল মাত্র। নকল যত অবিকল হবে মডেল ততো জীবন্ত হবে। আসল বস্তুটির অনুকরণ করে যে রূপে আমরা মডেলকে পাবো তা আসল বস্তুটির থেকে আকারে ছোটও হতে পারে, বড়োও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার ঠিক ঠিকও হতে পারে। এটি নির্ভর করে মডেলের উদ্দেশ্য, তৈরী করার সুবিধে ও যে বস্তুটির মডেল তৈরী হচ্ছে তার আকারের উপর।

আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে মডেলের ব্যবহার সীমিত। তার কারণ শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করবার মত ঠিক ঠিক মডেল বাজারে বিশেষ পাওয়া যায়না। আর যদিও কোনো রকমে কিছু সন্ধানে আসে তার দামও পড়ে যায় অনেক। তাই ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে এই মডেল তৈরীর প্রোজেক্ট নেওয়াটা ইতিহাস পঠন-পাঠনের অঙ্গ হিসেবে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও কর্ম্মতৎপরতায় যে মডেলগুলি তৈয়ী হবে তার সুবিধেও অনেক হবে। যে মডেলটি যেমনভাবে তৈরী করার প্রয়োজন সেটি ঠিক তেমনি ভাবেই তৈরী করতে পারা যাবে। এই মডেল তৈরী করার মধ্যে দিয়ে বর্ত্তমান দুনিয়ার শিক্ষা বিজ্ঞানের একটি বড়ো কথা—"Learning by doing"—সেটি হবে। গতানুগতিক পাঠ নেওয়া ছাড়া বিদ্যার্থীর সৃজনী প্রতিভার বিকাশ এতে সংসাধিত হবে। শেখার সাথে সৃষ্টি করার যে আনন্দ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী সেটি পাবে। স্কুলের শিক্ষার্থীরা কর্ম্মচঞ্চল। তাদের কাজ করার অবকাশ এর মধ্যে মিলবে। এই মডেল তৈরী করার মাধ্যমে সে শিখবেও। মডেল তৈরী করার সময় তাকে নানান রকমের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই মডেল তৈরী করবার মাধ্যমে তাই সে শিখবে। তাছাড়া মডেল তৈরী করাটা মডেল কেনার চেয়ে কম ব্যয় সাপেক্ষ। এই তৈরী করা-মডেলগুলির মধ্যে যেগুলি ভাল হবে সেগুলি সংরক্ষিত করে রেখে শিক্ষোপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্কুল ম্যুজিয়মের শ্রীবৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং স্কুলের যখন বাৎসরিক প্রদর্শনী হবে (যে সব স্কুলে অবশ্য হয়) তখন এগুলি প্রদর্শন করবার অবকাশ থাকবে।

শ্রেণীকক্ষে মডেল তৈরী করার অসুবিধে আছে অনেক। প্রথম এবং প্রধান অসুবিধে হচ্ছে "স্কুল টাইম টেবল"-এ যে সময় ইতিহাসের "পিরিয়ডের" জন্য দেওয়া থাকে সেটি মডেল তৈরী করার পক্ষে স্বল্প। তাছাড়া আমাদের অধিকাংশ স্কুলে মডেল তৈরী করার সাজসরঞ্জাম ও স্থানের অভাব। ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ অধিকাংশ স্কুলেই নেই। মডেল তৈরী করার জন্যে যে মাল-মশলার প্রয়োজন তাও অনেক স্কুলে কেনার অসুবিধে আছে। সর্ব্বোপরি আমাদের স্কুলের ইতিহাস-শিক্ষকের এইসব জিনিস তৈরী করার বা করাবার মত বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই। এই সব-রকমের অসুবিধেগুলিই আমাদের সাধ্যমত দূর করবার ব্যবস্থা করতে হবে। "টাইমটেবলে" সময়ের অসুবিধে অবশ্য আছেই। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অসুবিধে না থাকলে তা আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ, মডেল প্রভৃতি তৈরী করার পৃথক স্থান ও ইতিহাস ম্যুজিয়ম প্রভৃতির ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের কর্ম্মতৎপরতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। মডেল তৈরীর ব্যাপারে শিক্ষক মশায়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দরকার, নিজে শিখতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে শেখাতে হবে। তাঁকে নিজে তৎপর হয়ে স্কুলের ভূগোল শিক্ষক ও "ক্র্যাফ্‌ট্" শিক্ষকের সাহায্য ও সহযোগিতা নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ট্রেনিং কলেজগুলিতে ট্রেনিংএর সময় "aids, charts" তৈরী শেখানোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। এই ধরনের ব্যবস্থা থাকলে কি করে "aids, charts" তৈরী করে ব্যবহার করা যায় তার সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষক মশায়ের হয়ে যাবে।

মডেল বহু প্রকারের তৈরী করা যেতে পারে। ইতিহাস পঠনপাঠনের প্রত্যেকটি দিক বিচার করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর মডেল তৈরী করার অবকাশ আছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের এই বিভিন্ন দিকগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট সব রকমের মডেলই চেষ্টা করলে তৈরী করতে পারা যায়। আজকাল যখন আমরা বিশ্বইতিহাস স্কুলে পড়াচ্ছি তখন তার বিভিন্ন বিষয় বস্তুগুলির তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন আছে; বিষয় বস্তুগুলির তুলনামূলক পাঠ এই মডেলের সাহায্যে উপস্থাপিত হলে খুব কার্য্যকরী হয়। মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা, চাষবাসের পদ্ধতি, কুটীরশিল্প, বিভিন্ন রকমের যন্ত্রের উদ্ভাবন ও তাদের ব্যবহার, বিভিন্ন দেশের বন্য ও গৃহপালিত জন্তু, মুদ্রা, অলঙ্কার, মানুষের

আবাসস্থল, তৈজস পত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, মানুষের উপাস্য দেবদেবী, বড়বড় রাজা বা মহাপুরুষদের, কোনো বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রের,—এমনি নানা জিনিসের মডেল তৈরী করা যেতে পারে।

মডেলে কিন্তু সব সময়েই কোনো বস্তু বা বিষয়ের সামগ্রিক ভাবে ধারণা করে তার সামগ্রিক রূপটিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এর প্রয়োজনীয়তা আছে। খণ্ড, বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্তভাবে এর ধারণায় ও উপস্থাপনে এর মূলগত অর্থের ও বৈশিষ্ট্যের যেমন হানি হয় তেমনি এর উদ্দেশ্য ও ব্যর্থ হয়। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইতিহাসের "Topical development" বা "developmental approach"-এ মডেল বিশেষ কার্য্যকরী হয়।

মডেল সব সময়ে যথাযথ (accurate) হওয়া চাই। ইতিহাসের মডেল শিক্ষার্থীর যদি কল্পনাশ্রয়ী মনের কোনো বিশিষ্ট ভাবের প্রকাশ হয় তাহলে তো আর সেটি ইতিহাসের কোনো বিষয়ের মডেল থাকবে না। সে তখন শিক্ষার্থীর স্বকীয় সৃষ্টি, তার বিষয়বস্তুতে তখন কল্পনার রঙ্। ইতিহাসের কোনো বিশেষ বিষয়বস্তুকে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করবার জন্যে, মূর্ত্ত করবার জন্যে, 'মডেল' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া মডেল হবে সহজ সরল। মডেলের রূপায়ণে জটিলতা সব সময়ে পরিহার করে চলতে হবে। যে ঐতিহাসিক সহজ সত্যটি মডেলের মাধ্যমে প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে নির্ম্মাণ কৌশলের জটিলতা সেটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ করে দেয়। এই ব্যর্থ হয়ে যাবার কারণ হচ্ছে এই যে মডেলের নির্মিতির জটিলতা ও কলাকৌশলের জাঁকজমক শিক্ষার্থীর প্রায় সব মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয়। নির্ম্মাণ শৈলীর সৌখীনতা ও জটিলতার বেড়া পার হয়ে তার পক্ষে আসল সত্যে ও তথ্যে পৌছান হয় রীতিমত কষ্টকর। মডেল নির্ম্মান-কৌশল যদি সহজ হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্ম্মাণ করা সহজ এবং সম্ভব হবে। মডেলের "ডিজাইন" এবং নির্ম্মাণ কৌশল জটিল ও শক্ত হলে মডলের নির্মিতি শেষ পর্য্যন্ত সুন্দর ও যথাযথ হওয়াটা সুদূর পরাহত হয়ে দাঁড়ায়।

মডেল যেমন যথাযথ ও সহজ সরল হবার প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে এর বাস্তবানুগ হবার। মডেল বাস্তবানুগ হয় তখনই যখন এটি বেশ শক্ত-সমর্থ হয় ও আসলের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। সেই জন্যে মডেল তৈরী করার সময় মডেল তৈরীর উপাদান ঠিকভাবে নির্ব্বাচন করবার প্রয়োজন আছে। মধ্যযুগের পাথরের তৈরী দুর্গ পাতলা কাগজ কেটে হবে না, হলেও সেটা বাস্তব থেকে অনেক তফাৎ হবে। তৈরী

ইতিহাস-শিক্ষক

শিক্ষা প্রক্রিয়াটি দীর্ঘমেয়াদী। এর আরম্ভ মায়ের স্নেহ হাতের দোলায়, সমাপ্তি শেষ নিঃশ্বাসে। কতো না বর্ণাঢ্য, বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাবেশ জীবন ভোর মানুষের জীবনে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা, আবার শিক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার এ সমাবেশ অসংযত নয়, পরস্পর সংবদ্ধ, সুবিন্যস্ত। একটি আরেকটির সাথে অবিচ্ছেদ্য। কুশলী কোন জাদু শিল্পীর অনুপম রচনা যেন। সে রচনা মানুষের অস্মিতা; অভিজ্ঞতার রঙে। যত মানুষ ততো প্রকারের অস্মিতা; অফুরাণ্ বৈচিত্র্য। মানুষ পরিণত বয়সের হলে, মনীষার পরিণতির ফলে তার পরিবেশের থেকে সে নিজেই শেখে তার অস্মিতার প্রকৃতি অনুযায়ী। কিন্তু মানুষের যখন এই পরিণতি আসেনি, যখন সে থাকে শিশু, বালক, কিশোর কি যখন যৌবনের অলকরাগে তার মনের দিগন্ত থাকে অরুণাভ তখন শেখবার জন্যে দরকার হয় সাহায্যের। শেখে সে নিজেই। কিন্তু কি শিখবে, কি করে সহজে শিখবে এই রকমের নানা প্রশ্ন আছে এর সাথে জড়িয়ে। এসব প্রশ্নের আবার নানা দিক আছে। তাছাড়া শৈশবে, বাল্যে বা কৈশোরে বিদ্যার্থীর সমাজ চেতনার উন্মেষ ঘটে অন্যের সাথে মেলায়, মেশায়, অন্তরঙ্গতায়। এসব ব্যাপারে বাপ মা নিজেদের হাতে দায়িত্ব রাখতে চান না। তাঁদের পক্ষে সীমিত পরিবেশে এ দায়িত্ব ঠিক ঠিক পালন করাও সম্ভব নয়। মানুষ তাই বহু চিন্তায় ও পরীক্ষায় তার চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তুলেছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার সাহায্যে শিক্ষার পথ সুগম হয়। তাই গৃহ সত্ত্বেও স্কুল, বাপ মা ছাড়াও শিক্ষক শিক্ষিকা।

শিক্ষা প্রক্রিয়াটিকে নৈর্ব্যক্তিক বলা চলে না। শিক্ষক ছাত্রের একান্ত নিবিড় সান্নিধ্যে, ব্যক্তিতার উপর ব্যক্তিতার প্রতিফলনে, প্রভাবে এবং ভাব আদান প্রদানের আন্তরিক প্রয়োজনীয়তায় এটি ব্যক্তি-প্রভাবযুক্ত ও পারস্পরিক। শিক্ষক ছাত্রের এই নিবিড় ও পারস্পরিক সংযোগ ভিন্ন শিক্ষার বিপত্তি আছে। শিক্ষার আজ নানা প্ল্যান পরিকল্পনা, নানা আদর্শ, নানা উদ্দেশ্য আর সঙ্গে সঙ্গে নানা জটিলতা। এসবগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের কাজ চলা-পটভূমিকা রচনা করে শিক্ষার যা উদ্দেশ্য তার বাস্তবে রূপায়ণ হয় শিক্ষকের হাত দিয়েই।

সাধারণ বিষয়-শিক্ষকের কথা এবং সাধারণ ভাবে শিক্ষকের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা বিশেষভাবে ইতিহাস-শিক্ষকের কথাই এখানে আলোচনা করবো।

ইতিহাস পড়ানোর লক্ষ্য অনেক। আদর্শও যথেষ্ট উন্নত; অনেক সময় আকাশ-চুম্বী। সেই অনুযায়ী ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনা। পাঠ্যক্রমের মধ্যেই জীবন আদর্শ প্রতিফলিত। কিন্তু পাঠ্যক্রমের মধ্যে জীবনাদর্শের প্রতিফলন, পাণ্ডিত্যের আরাম কেদারায় বসে কাগজে কলমে পাঠ্যক্রম রচনার অপূর্ব্ব বিন্যাস সাধন এক জিনিস, আর তা হাতে কলমে বাস্তবে, স্থানকাল পাত্র অনুযায়ী বিদ্যার্থীদের শিখতে সাহায্য করা সম্পূর্ণ অন্য এবং ভিন্ন জিনিস। একাজ করেন ইতিহাসের শিক্ষক। কতো দুরূহ জটিল এ কাজ! কতোখানি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মণীষা, ব্যক্তিতা, সহৃদয়তা, শিক্ষার ব্যাপ্তি, উদারতা, এবং পেশাগত প্রস্তুতি আবশ্যক এর বাস্তব রূপায়ণে।

পাঠ্যক্রমের মধ্যে যে আদর্শের ব্যঞ্জনা রয়েছে, সেটা উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ। আর ভবিষ্যৎ বলেই স্বপ্নের 'রোম্যান্টিক' ছোঁয়াচে কিছুটা সোনালী, কিছুটা দুরধিগম্যের অনিশ্চয়তায় অমূর্ত্ত। শিক্ষকের উপর ভার সেই অনিশ্চয়কে নিশ্চিত করার, স্বপ্নকে বাস্তব করার, ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমান করার, উদ্দেশ্যকে সফল করার। হাজারো শিক্ষক ব্যাপৃত রয়েছেন এ কাজে পশ্চিমবাংলায়, সারা ভারতে, ভারত ছাড়া অন্য অন্য দেশে, দুনিয়াময়। লাখো শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনে সংযোগ সাধন করছেন তাঁরা যুগযুগ সঞ্চিত মানব অভিজ্ঞতার, সূর্য্য যেমন করে থাকে জীব-জগতের সাথে বসুমাতৃকার। এ সংযোগ নিত্যকার। শিক্ষার্থীর জীবনের সাথে পাঠ্যক্রমে আধৃত মানুষের অভিজ্ঞতাগুলিকে গেঁথে দেওয়া, একটি একটি করে, নানা কলা-কৌশল আর পদ্ধতির প্রয়োগে, অপার ধৈর্য্যে, অর্জ্জিত অভিজ্ঞতায়, সুনিপুণ মালাকারের কুশলী তৎপরতায়। নিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে শিক্ষার্থীর জীবনের সাথে মানব অভিজ্ঞতার সংযোগ। জীবনের সাথে জীবনের সংযোগ। অভিজ্ঞতাই জীবন আর জীবনই অভিজ্ঞতা। তাই এ কাজ জীবন্ত।

শিক্ষকের এ দায়িত্ব অত্যন্ত গুরু। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক মশায়ের সামনে চল্লিশ পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী। স্কুলের শিক্ষার্থী চঞ্চল, উদ্দাম। তাদের বাইরেকার এ চাঞ্চল্য ও উদ্দামতা মানস লোকের ঝঞ্ঝাবিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। হিমালয় যখন মাথা চাড়া দেয় তখন তার সানুদেশে জাগে ভূমিকম্প। শিক্ষার্থীর অস্মিতার সুনির্দ্দিষ্ট বিন্যাস হয় নানা ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে। আর তা হয় এই সময়েই। অস্মিতা বিমূর্ত্ত। মানব মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম টানা পোড়েন থেকে আরম্ভ করে তার সহজ প্রবৃত্তিগুলির স্থূল বহিঃপ্রকাশের সাথে যেমন অস্মিতার নিগূঢ় সম্পর্কের নৈকট্য, তেমনি সজ্ঞান মনের আলোঝলমল চাঁদোয়া থেকে নির্জ্ঞান মনের অবগুণ্ঠিত অবরোধ অবধি অবাধ সঞ্চরণ তার। তাই যে মান অভিমান,

প্রেমপ্রীতি, আবেগ প্রক্ষোভ, রাগদ্বেষ, সন্দেহ সংশয়ের দোলায় দুলে সারা হয় মানুষের মন, সেই মন নিয়ে কারবার শিক্ষক মশায়ের। তাছাড়া একই গাছের দুটি পাতা যেমন হুবহু এক নয়, তেমনি দুজন শিক্ষার্থী অবিকল এক হয় না। একই উদ্দীপক, শ্রেণীকক্ষের চল্লিশ জন শিক্ষার্থীর মনে চল্লিশ রকমের সাড়া জাগাবে,—এটাই হচ্ছে প্রাতিস্বিক পার্থক্য। শিক্ষক মশাইকে তা লক্ষ্য রাখতে হয়। সেই জন্যেই বলা হয়ে থাকে যে একজন চিকিৎসক একই সময়ে কেবলমাত্র একটি রোগীকেই পরীক্ষা করে দেখে ঔষধ লিখে দেন; কিন্তু একজন শিক্ষক একই সময়ে চল্লিশ পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীকে দেখেন, আর সেটা দৈহিক কোনো বৈকল্যের পরীক্ষাও নয়। শিক্ষকমশায়ের তাতে পেনিসিলিন বা অনুরূপ কোনো ঔষধের প্রয়োগ কৌশল (যার ক্ষিপ্র প্রয়োগে আময় যন্ত্রণার আশু উপশম করেন চিকিৎসক জাদুকরের মতন) ও নাই। ঔষধ প্রয়োগের ফল মুহূর্তে দেখা যায়, শিক্ষার ফল এক পুরুষ বাদে। কাজেই শিক্ষকমশায়ের মহা অসুবিধে। শিক্ষকমশায় কি কাজ করেন, কতটা করেন তা সহজে প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য। শিক্ষা বিজ্ঞান চরম উন্নতির পরও বোধহয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত এমনি হাতে কলমে অতিদ্রুত ফল দেখিয়ে কিংবা কোনো কিছুর সম্বন্ধে সত্য ভবিষ্যৎবাণী করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেনা। তার মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষা বিজ্ঞানের আসল কারবার দেহ নিয়ে বা জড় জিনিস নিয়ে নয়।

আমাদের দেশে শিক্ষার নানা সমস্যা। সমস্যার আবার বিভিন্ন রকমের প্রকৃতি। একই প্রকৃতির সমস্যা আবার স্থান কাল পাত্র ভেদে একটি অন্যটির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই সব সমস্যার সমাধানের সবক্ষেত্রে প্রয়োগসিদ্ধ কোনো ফরম্যুলা নেই। এই সব সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় আমাদের দেশের স্কুলের শিক্ষকমশাইদের। ইতিহাস-শিক্ষকের জ্ঞানগত যোগ্যতা ও পেশাগত প্রস্তুতির কথা তাই এইসব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। তাই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। স্কুলের ভিতরে সমস্যা, বাইরে সমস্যা। স্কুলের ভিতরে নানান রকমের স্কুল পলিটিক্স, স্কুল কমিটি ও সম্পাদককে কেন্দ্র করে কোথাও কোথাও টালবাহানা, শিক্ষার সাজসরঞ্জামের অভাব, আবশ্যকীয় গৃহের অভাব, এমনিতরো বহু সমস্যা আছে স্কুলের ভিতরে। স্কুলের বাইরে আমাদের স্কুলের বিদ্যার্থীদের নিজ নিজ গৃহের পরিবেশ,—অধিকাংশ বিদ্যার্থীরই দৈনন্দিন জীবনে অভাব অনটনের কশাঘাত,—আহারের, বাসের, পরিধেয়ের অভাব,—পিতামাতা বা অভিভাবকের শিক্ষার দৈন্য, সামাজিক অবস্থা এসব মিলে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনা করেছে তার মাঝে বিদ্যার্থীর অস্মিতার বিকাশ

কেমন ভাবে করা সম্ভব শিক্ষক-মশায়কে তা চিন্তা করতে হবে এবং হাতে কলমে কাজ করতে হবে। এগুলি ছাড়া ও আছে স্কুল পরিচালনা, লাল ফিতার গড়িমসি, ও দীর্ঘসূত্রতা, পরিদর্শনের হৃদয়হীনতা, শিক্ষকমশায়ের মাসিক বেতন এবং সম স্তরের ব্যক্তির অন্য পেশায় অধিকতর বেতন ও আপেক্ষিক সামাজিক মর্য্যাদা আর শিক্ষক মশায়ের অসন্তুষ্টি....এমনি আরো কতো সমস্যা।

এই সব সমস্যায় যখন আমাদের দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন আর অসন্তোষের বিক্ষোভে আমরা যখন অপ্রকৃতিস্থ তখন দেখি জগৎ জোড়া শিক্ষাবিজ্ঞানের অগ্রগতি। সে অগ্রগতি আমাদের "চ্যালেঞ্জ" জানাচ্ছে। প্রশ্ন হোলো যে আমরা সে "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ করবো, না নানা সমস্যাপীড়িত-চোখ শুধু বুজে বসে থাকবো, আর মার খাবো? আজকের দুনিয়ায় মানুষ যখন মহাশূণ্যের দুঃসাহসিক পরিক্রমায় সফল হোলো তখন ঘরে বসে চোখ বুজে মার খাবার কোনো অর্থই হবেনা। আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। challenge গ্রহণ করতে হবে। চোখ খুলে প্রকৃতিস্থ মন নিয়ে কাজে নামতে হবে। আমাদের প্রস্তুত হতে হবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে শিক্ষক মশায়ের পেশাগত দায়িত্ব যেমন গুরু তাঁর নাগরিকের দায়িত্বও তেমনি মহান।

ইতিহাস শিক্ষকের যোগ্যতাকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা:—(১) শিক্ষক মশায়ের স্কুল কলেজ—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস এবং ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে অধীত জ্ঞান, (২) শিক্ষক মশায়ের পেশাগত প্রস্তুতি; এবং (৪) পেশাগত প্রস্তুতির পর ভবিষ্যতে অধিকতর প্রস্তুতি ও পড়াশোনা।

যে পটভূমিকায় আমরা ইতিহাসশিক্ষকের যোগ্যতার কথা আলোচনা করছি তাতে একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে। সেটি হচ্ছে এই যে ইতিহাসের শিক্ষক মশাইদের সামনে ইতিহাস পঠনপাঠনের একটা ধরাবাঁধা "ফরম্যুলা" আমরা উপস্থাপিত করতে পারবোনা। পারবোনা এই জন্যে যে এরকম ধরাবাঁধা কোনো "ফরম্যুলা" নেই। তবে তাঁদের যোগ্যতার সম্বন্ধে সাধারণভাবে বিচার করে কতকগুলি জিনিস সম্বন্ধে আমরা একমত হবো।

ইতিহাসের শিক্ষক যিনি হবেন তাঁর ইতিহাসে দখল থাকতেই হবে। এখানে কোনো দ্বিমত নেই, কোনো জোড়া তালি নেই। ইতিহাসের শিক্ষকের ইতিহাসে জ্ঞান না থাকলে তিনি ইতিহাসের শিক্ষক হবেন কি করে? প্রশ্ন এই যে ইতিহাস শিক্ষকের ইতিহাসে জ্ঞান কিরূপ থাকবে? কতো গভীর হবে তা? ইংলণ্ডে অভিজ্ঞ শিক্ষক মহলে ইতিহাস শিক্ষকের ইতিহাস জ্ঞানের

গভীরতা নিয়ে মতভেদ আছে। সেখানে একদল বলেন যে ইতিহাস শিক্ষক হবেন ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ; আর একদল বলেন ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সর্ব্বস্তরে প্রয়োজন নেই। ইংলণ্ডের কথা যাই হোক, আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে ইতিহাস শিক্ষকের ইতিহাসে জ্ঞান কতটুকু থাকবে তাই বিচার করে দেখবার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই জ্ঞানের পরিমাপ অনেকখানি নির্ভর করে ইতিহাস পাঠ্যক্রমের প্রকৃতির উপর। একটা কথা এখানে খোলাখুলিভাবেই বলছি। আমাদের বর্ত্তমান ইতিহাসের পাঠ্যক্রম যেভাবে রচনা করা হয়েছে ঠিক সেই পাঠ্যক্রমটিকে স্কুলের শ্রেণীকক্ষে পঠনপাঠনের মাধ্যমে রূপায়িত করে, পাঠ্যক্রমের এই নব বিন্যাসের আদর্শকে বাস্তবে মূর্ত্ত করে তোলার মত ইতিহাসে জ্ঞান আমাদের খুব কমসংখ্যক ইতিহাস শিক্ষকেরই আছে। কাজে কাজেই বর্ত্তমানে আমাদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে ইতিহাস শিক্ষকের ইতিহাসে জ্ঞান কতো গভীর হবে সেটি নয়, কিভাবে বর্ত্তমান পাঠ্যক্রমটির সার্থক পঠন পাঠন চালাবার জন্যে প্রয়োজন মত ইতিহাসে জ্ঞান আহরণ করা হবে সেইটি। আমাদের দেশের ইতিহাস শিক্ষক-মশাইরা যেভাবে স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এসেছেন তাতে পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা বা জ্ঞান তাঁদের হয়নি। অথচ পৃথিবীর ইতিহাস স্কুলপাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাজেই বর্ত্তমানে ইতিহাস পড়ানোর সংকট দেখা দিয়েছে। সমস্যা এসে ঘাড়ে পড়েছে অথচ আমরা চোখ বুজে আছি। ইতিহাস শিক্ষকের ইতিহাস বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজন আজকের মত অতীতে আর কোনও দিনই অনুভূত হয়নি বোধ হয়। বিষয় না জানলে পদ্ধতি আসবে কোথা থেকে ? বিষয় সম্যক না জেনে পদ্ধতি পড়ে পদ্ধতি প্রয়োগ করবার চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি ; কিন্তু তাতে ফল বিশেষ হচ্ছে না।

পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান ছাড়াও নিজের দেশের বা ইতিহাসের যে কোনো এক অধ্যায়ের বা কোনো বিষয়ের উপর ইতিহাস শিক্ষকের যদি গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকে তাহ'লে ভাল হয়। ভাল হয় এই জন্যে যে ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো কিছু রচনা করার সময় তার মূল উপাদানগুলি বিচার ও যুক্তির নিক্তিতে ওজন করে তা ব্যাখ্যা করবার এবং তার থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অভিজ্ঞতা ইতিহাস শিক্ষকের একাজে হয়। এ অভিজ্ঞতা ইতিহাস শিক্ষকের খুব বড় অভিজ্ঞতা ; এতে নৈর্ব্যক্তিক মনের কাঠামো যেমন অতি সহজে তৈরী হয় তেমনি নানা অসত্য ও অতিরঞ্জিত বিষয় বাদ দিয়ে মূল উপাদান থেকে সত্যের নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা জন্মায়। আর এ অভিজ্ঞতা

এবং ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি সংক্রামিত করে দিতে পারেন। নৈর্ব্যক্তিক মনের কাঠামো তৈরী করে, বহু মিথ্যার ভেজাল থেকে আসল সত্যকে বেছে নেবার ক্ষমতা জাগিয়ে তোলা তো স্কুলে ইতিহাস পঠন-পাঠনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিহাস শিক্ষকের সে অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা না থাকলে তিনি তা সংক্রামিত করবেন কি করে শিক্ষার্থীদের মনে? আমাদের দেশের স্কুলগুলির পরিবেশ বিবেচনা করে গবেষণায় অভিজ্ঞ ইতিহাস-শিক্ষকের কথা চিন্তা করতে সঙ্কোচ বোধহয়। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে এগুলি আদর্শ। আদর্শের সাথে বাস্তবের তফাৎ আসমান্‌জমীন্‌ আমাদের দেশে। আমরা আশাবাদী। আমরা আশা করবো আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে ও গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশেষজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষক আসবেন শিক্ষকতা করতে।

অনেক সময় ইতিহাসের শিক্ষককে ইতিহাস ছাড়াও আরো অন্য দুএকটি বিষয় পড়াতে হয়। সেই দুএকটি বিষয় যদি আমাদের স্কুলে অধুনা প্রবর্ত্তিত সমাজ বিদ্যা, কি ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান বা অর্থনীতি হয় তাহালে ভাল হয়। ভূগোল তো ইতিহাসের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত! পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতি ইতিহাসের সাথে অনুবন্ধে সংযুক্ত করে পড়ালে পঠন পাঠনে প্রাণের সঞ্চার হয়, আর তাতে ফলও ভাল হয়। আর সমাজবিদ্যা তো ইতিহাসের আপন কথা,—মানুষ, তার ভৌগোলিক পরিবেশ, তার নিজের ও সভ্যতা সংস্কৃতির কথা, তার সমাজ, রাষ্ট্রগড়ে তোলার কথা আর তা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালনার কথাগুলিই তো সাধারণ ভাবে সমাজ বিদ্যার পাতায়। তাই ইতিহাসের শিক্ষকমশায়ের এই সব বিষয়গুলির জ্ঞান অর্জ্জন করার প্রয়োজন আছে। আর প্রয়োজন আছে নৃতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি কথাগুলি জানবার। কারণ এরা 'কবে কোন একদিন থেকে' ইতিহাসের সাথে এমনি সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছে যে এগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান না থাকলে ইতিহাস পঠন-পাঠনে সফলতা লাভ করা সুদূর পরাহত। ইতিহাসের সাথে নিকট সম্পর্কে সংযুক্ত এই সব বিষয়গুলি পৃথক পৃথক ভাবে পড়া হবে কি একটি সমন্বিত-সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমের প্রবর্ত্তন করা হবে, এর পঠনপাঠন বিশ্ববিদ্যালয় বা সাধারণ কলেজে হবে, না ট্রেনিংকলেজে হবে সে সিদ্ধান্ত অবশ্য চিন্তা ও বিচার সাপেক্ষ। এ পরিকল্পনা আমাদের দেশে আপাততঃ ভবিষ্যতের গর্ভে হলেও এ সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য এই যে এ বিষয়ে মনোযোগ দেবার এবং নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নেবার সময় এসে গেছে। পাঠ্যক্রমের যে নব বিন্যাস, এবং বিষয়বস্তুর যে সুচিন্তিত সংযোজনা আমাদের স্কুলের ইতিহাস পাঠ্যক্রমকে দিয়েছে অভিনবত্ব, যে পাঠ্যক্রম প্রবর্ত্তিত

হয়েছে সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশের স্কুলে স্কুলে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, যার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষে মানুষে গড়ে উঠবে সার্বজনীন সৌভ্রাত্র, আন্তর্জাতিক মনোভাবে আর পরস্পর বোঝাবুঝির রাখিবন্ধনে,—তার সার্থক এবং সফল পঠন-পাঠন ব্যাহত যাতে না হয় তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। যে শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি আমাদের স্কুল পাঠ্যক্রমে তার বাস্তব রূপায়ণের জন্যে বিশ্ব ইতিহাসের এবং আনুষঙ্গিক বিষয় গুলি শিক্ষা করবার সুযোগ আমাদের ইতিহাস শিক্ষকদের দেওয়া একটি জরুরী বিষয়।

আমাদের এই শতকে আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে একাজ সহজ হয়। বিশেষ করে ইতিহাস শিক্ষার মাধ্যমে এর পথ হয় প্রশস্ত। আমরা তার জন্যে পরিকল্পনা নিয়েছি। ইতিহাস পাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাস অন্তর্ভুক্তি এই পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গ। ইতিহাস শিক্ষকের দায়িত্ব একশোগুণ বেড়ে গেছে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হবার সাথে সাথে। পাঠ্যক্রমে বিষয় বস্তুর নির্ব্বাচনও বিন্যাস যেমন বদলে গেছে তেমনি বদলে গেছে ইতিহাস পঠন পাঠনের দৃষ্টি ভঙ্গি, তার মুল উদ্দেশ্য। এই পরিবর্ত্তিত পরিপ্রেক্ষিটি ইতিহাস শিক্ষকমশায়ের যোগ্যতা কেমন ধরনের হবে সে প্রশ্নের উপরেও সমধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। আজকের ইতিহাস শিক্ষক মশায়কে হতে হবে আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন। ইতিহাসের পাতা হাতড়ে তাঁকে অনুসন্ধান করতে হবে মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্র গড়ে তোলবার শুভ প্রয়াস পৃথিবীর কোথায় কোথায় কিকি কারণে অতীতে প্রকট হয়েছিল কিংবা এ সং প্রচেষ্টা প্রকট হয়েও বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিল কিকি কারণে। তাঁকে জানতে হবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সৃষ্টির রহস্য। শুধু যুনোই নয়। যুনো থেকে শুরু করে দু চারপা পিছিয়ে গিয়ে লীগঅফ্‌নেশন্‌স্‌, কি ইউরোপের "কনসার্টঅফ্‌ ইউরোপ" এবং "হোলি এলায়েন্স"-এর অধ্যায়গুলি নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে। দেখতে হবে কোন্ কোন্ ঘটনার সঙ্ঘাতে জেগেছিল তাদের সৃজনের প্রয়োজন। অবহিত হতে হবে তাদের সৃষ্টি স্থিতি ও বিলুপ্তির রহস্য সম্বন্ধে, সংশ্লিষ্ট কারণগুলি বিশ্লেষণ করে, অনুশীলন করে। আন্তর্জাতিক সংস্থা-সৃষ্টির এই ঐতিহাসিক পটভূমিকার সম্যক অনুধাবনেই আসবে যুনোর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা। আজকের ইতিহাস শিক্ষকের এধারণা চাইই। তাই তাঁকে জানতে হবে যুনোর গঠন পদ্ধতি ও কার্য্যক্রম। জানতে হবে কোন কোন শাখা প্রশাখার সাহায্যে যুনো কি কি কাজ করেছে, করে চলেছে। এগুলি না জানলে আজকের স্কুলের ইতিহাস কোন শিক্ষকই সুষ্ঠুভাবে পড়াতে পারবেন না। তাঁর ইতিহাস পঠন পাঠন এলোমেলো হয়ে যাবে।

ইতিহাস শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতির উদ্দেশ্য, সাদামাঠা কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, বিদ্যার্থীদের সামর্থ্য, পরিবেশ ও আবশ্যকতা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়-বস্তুগুলি বিদ্যার্থীদের শিখতে সাহায্য করা, পাঠ্যক্রমে আধৃত অভিজ্ঞতার সাথে তাদের জীবন অভিজ্ঞতার সংযোগ স্থাপন করা, বাস্তবের সাথে তার যোগসূত্রটি গেঁথে দেওয়া। বিদ্যার্থীদের শিক্ষা যাতে সহজ সুগম হয় তার দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি নিশ্চয় নিবদ্ধ থাকবে। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে শিক্ষকমশায়কে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জানতে হবে বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি যে ক্রমিক স্তরগুলি পেরিয়ে শিক্ষার্থী বেড়ে উঠছে সেই স্তরগুলিকে। এই প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্য-গুলির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে। যে আবেগ প্রক্ষোভ, মান অভিমানের অবিরাম দোলার ছন্দে বিদ্যার্থীর অস্মিতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠে তার হিসেব দেখা শিখতে হবে শিক্ষকমশায়কে কুশলী নিরীক্ষকের মত। শিক্ষকমশায়কে জানতে হবে মানুষ শেখে কি করে, মনুষ্যেতর জীবের সাথে মানুষের শিক্ষার প্রভেদ কি এবং কোথা, জানতে হবে মানুষ ভুলে যায় কি করে, কোন্ কোন্ অবস্থায় তার ভুলে যাওয়া দ্রুততর হয়। নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে কি করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে বিদ্যার্থীর উৎসাহের উদ্দীপন ও কৌতূহল সৃষ্টি করা সহজ হবে; কি করে পাঠে বিদ্যর্থীর মনঃসংযোগ আসবে এবং এই মনঃসংযোগ কি করে জিইয়ে রাখতে পারা যাবে।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এই মূল কথাগুলি ছাড়াও শিক্ষকমশায়কে জানতে হবে সমাজবিজ্ঞানের মোটামুটি কথাগুলি। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রবণতা ও 'অস্মিতার' সুষ্ঠু বিকাশে একান্ত অপরিহার্য্য চাহিদাগুলির সাথে সমাজ পরিবেশের চাহিদার যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। ব্যক্তির ও সমাজের চাহিদার নিখুঁত সমন্বয়ই তো আদর্শ-শিক্ষার গোড়ার কথা। তাই তাঁকে স্কুল ও বিদ্যার্থীর গৃহের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হবে। বিদ্যার্থীর গৃহছাড়া, খেলার সাথীছাড়া, আর কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান-পরিবেশ তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করছে তা তাঁকে অনুধাবন করতে হবে। এই জন্যেই শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের সাথে শিক্ষকমশায়ের পরিচিতির প্রয়োজন আছে। স্থানীয় পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী তাঁকে ভরিয়ে দিতে হবে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভাণ্ডার। এই ভরিয়ে দেবার ভিত্তি হবে শিক্ষার্থীর নিজ প্রবণতা ও স্বীয় চাহিদার সাথে পরিবেশের চাহিদার সমন্বয়। সমাজ পরিবেশের সাথে শিক্ষা সমন্বিত না হলে বিদ্যার্থী সামাজিক হবে কি করে? সমাজ

পরিবেশের চাহিদার সাথে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সমন্বিত না হ'লে সে শিক্ষা হবে অবান্তর। আবার বিদ্যার্থীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাকে গলায় অবদমনের জগদ্দল পাথর বেঁধে সমাজের চাহিদার দরিয়ায় ডুবিয়ে মারলে সে শিক্ষা হবে বৈচিত্র্যহীন গড্ডলিকা,—জোর করে চাপানো। কোনো জিনিস জোর করে চাপানোর অন্তরালে থাকে অসন্তোষের ধূমায়মান বহ্নি। তা একদিন সমাজে সর্ব্বনাশ আনে।

আজকের সমাজে মানুষের অবস্থান প্রতিযোগিতায় নয়, সহযোগিতায়। প্রতিযোগিতায় আসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হিংসা, শত্রুতা, নীচতা। এর ফল সঙ্কীর্ণতা, হীনতা, মৃত্যু। সহযোগিতায় আছে জীবনের জয়গান। বিদ্যার্থীদের এই সহযোগিতার ভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের চলায় বলায়, আলাপ আলোচনায়, কাজে কর্ম্মে, চিন্তায়, অনুপ্রেরণায়। এই সহযোগিতাই শেষে আন্তর্জাতিক বোঝাবুঝির পথ সুগম করবে। তাই ইতিহাস-শিক্ষককে এই দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানিয়েছেন আজকের বিশ্বের মনীষীরা। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলি থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ফিরবেন ইতিহাসের শিক্ষকরা নিজ নিজ স্কুলে।

এ ছাড়া ইতিহাস পড়ানোর যে কলাকৌশল সেগুলি পেশাগত প্রস্তুতির সময়েই শিখে নিতে হবে। ইতিহাসের পাঠে সময়ের ধারণা কতোবছর বয়েসে দেওয়া হবে, আর তা পাঠের কোন সময়ে কি রকম ভাবে দেওয়া হবে, তা যেমন জানতে হবে তেমনি জানতে হবে সময়ের ধারণা দেবার জন্যে আমরা ইতিহাসের শিক্ষকেরা কোন্ কোন্ জিনিসের সাহায্য নিতে পারি। তাছাড়া ইতিহাসের বিষয়বস্তু কিভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করলে বিশেষ ফল পাওয়া যাবে, সময়ের ক্রম অনুসারে (chronological), কি এক একটি জিনিসের ক্রমবিবর্ত্তনকে অনুসরণ করে (developmental), কি ইতিহাসের সুনির্ব্বাচিত বিশেষ বিশেষ অধ্যায়গুলির উপস্থাপনে ও অধ্যয়নে (Patch System), এসবগুলিও আমাদের জেনে নিতে হবে শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে পেশাগত প্রস্তুতির সময়েই। এই সময়েই জেনে নিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের পূর্ব্বজ্ঞানের বা পূর্ব্বঅভিজ্ঞতার পটভূমিকায় তাদের মনকে পাঠাভিমুখী করা যাবে কি করে।

ইতিহাস পঠন-পাঠনের "aids" বলতে কি বুঝি বা audio visual aids"-ই বা কি তার যেমন যথাযথ ধারণা নিতে হবে তেমনি শিখে নিতে হবে এই সব "aids"-এর সুষ্ঠু ব্যবহারের পদ্ধতি। আর তার যথাযথ ব্যবস্থার

উপায় কি হবে তারও সন্ধান নিয়ে নিতে হবে এই পেশাগত প্রস্তুতির সময়ে, এবং তার সাথে আয়ত্ত করে নিতে হবে শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনে ব্যবহৃত মোটামুটি সরঞ্জামগুলির নির্ম্মাণ কৌশল। পেশাগত প্রস্তুতির সময় এই সব শিক্ষোপকরণ বা সরঞ্জামগুলি তৈরী করা শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। ভাল কাগজে বড়ো করে ঐতিহাসিক মানচিত্র এঁকে তার পিছনের দিকে কাপড় সেঁটে দেওয়া এবং তারপর "রোলারে" জড়িয়ে দেওয়ালে ঝুলানো-মানচিত্র তৈরী করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। এতে কিছু সুবিধাও আছে। শিক্ষক মশায়ের যে সময়ের মাত্রচিত্রের প্রয়োজন ঠিক সেই সময়ের মানচিত্র তিনি নিজের চাহিদা মত তৈরী করে নিতে পারবেন। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সময় রেখা, লেখ, "মডেল" প্রভৃতি তৈরী করা শিখে নিতে হবে পেশাগত প্রস্তুতির সময়। ইতিহাস শিক্ষকের যে ভ্রমণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং যেখানে তিনি যাবেন সুযোগ সুবিধে মত ঐতিহাসিক নিদর্শন কিছু সংগ্রহ করবার দিকে যে তাঁর দৃষ্টি থাকবে এই পেশাগত জ্ঞাতব্য তথ্যটি তিনি জানবেন পেশাগত প্রস্তুতির সময়ই। এই ধরনের সংগ্রহের পেশাগত এবং শিক্ষাসংক্রান্ত গুরুত্বও যথেষ্ট। ইতিহাস পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষকমশায় এই সংগৃহীত নিদর্শনগুলি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। নিজ স্কুলের শিক্ষোপকরণ এতে বৃদ্ধি পাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মনেও এই ধরনের সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হবে। ছাত্র ছাত্রীরা এই সমস্ত পুরাণো দিনের জিনিসগুলি নাড়াচাড়া করে পুরাণো দিনের সাথে নৈকট্য অনুভব করবে। এতে অবাস্তব বলে প্রতীয়-মান বই-এ লেখা কাহিনী বাস্তব হয়ে উঠবে। বিমূর্ত্ত মূর্ত্ত হয়ে উঠবে। এছাড়া পেশাগত প্রস্তুতির সময় ব্ল্যাকবোর্ডের যথাযথ ব্যবহার করার কৌশলও আয়ত্ত করে নিতে হবে। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পরিষ্কার করা, লাইন ঠিক করে, হিজিবিজি না করে সহজ বোধ্য করে, সংক্ষিপ্ত করে, ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ করা এমন একটা দুরূহ কাজ নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের বলার কথা এই যে aids charts তৈরী করা ও ব্ল্যাকবোর্ডের কিছু অঙ্কন করার অভ্যাস যদি ট্রেনিং কলেজগুলিতে শিক্ষা দেবার জন্যে কিছু সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে তো তাতে ফল পাওয়া যাবে।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক একটি বড়ো এবং অত্যন্ত আবশ্যকীয় "aid"। এই পাঠ্যপুস্তক কিভাবে ব্যবহার করা হবে, কিভাবে শিক্ষার্থীদের নিজেদের করবার জন্যে কাজ দেওয়া হবে, কিভাবে লিখিত কাজ সংশোধন করা হবে, কিভাবে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস জ্ঞানের মূল্যায়ন করা হবে,—এ সবের কৌশল আয়ত্ত করে নিতে হবে এই পেশাগত প্রস্তুতির সময়। আরও খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে

এমনি আরো কতো জিনিস আছে যা পেশাগত প্রস্তুতির সময় অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহযোগিতায় ও নির্দেশে খুব সহজেই আয়ত্ত করে নেওয়া যাবে।

আজকাল বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক উন্নতিতে ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষে নানা "audio visual aids" এর ব্যবহার। সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রচালিত। যন্ত্রচালিত "audiovisual aids"-গুলির যথাযথ ব্যবহার করবার পদ্ধতি বিশেষভাবে এর কারিগরী দিকটির শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে তা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এই পেশাগত প্রস্তুতির সময়।

ইতিহাসের পঠন-পাঠনে শ্রেণীকক্ষে শুধু বক্তৃতা চালালে যে ফল কিছুই হয় না এ বিষয়টি যেমন হৃদয়ঙ্গম করতে হবে "অভ্যাস পঠন-পাঠনের" (Practice teaching) মহড়ার সময়, তেমনি জেনে নিতে হবে পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করানোর জন্যে কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশ দাগ দিয়ে সেগুলি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করানো, কি শ্রেণীকক্ষে শুধু "নোট" হাঁকিয়ে ছাত্রদের সেটি টুকে নিতে বলা, কি একজনের পর আর একজনকে পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়তে বলা, আর তাতেই ঘণ্টা কাবার করা যে শ্রেণীকক্ষে অচল, শুধু এগুলি করলে যে শিক্ষক মশায়কে কর্ত্তব্যচ্যুত হতে হয় এ সহজ সত্যটি উপলব্ধি করে নিতে হবে এই পেশাগত প্রস্তুতির সময়।

পেশাগত প্রস্তুতির জন্যে আমাদের দেশ বর্ত্তমান সময়ে ট্রেনিংকলেজ গুলির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই শিক্ষাকালের মেয়াদ, পাঠ্যক্রম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির দিকে একটু নজর দিলেই এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে কিছু করার মত অবস্থা হলেই এই পেশাগত প্রস্তুতির বেশ খানিকটা শুভংকর গুণগত উন্নতি পরিলক্ষিত হবে। তখন এই প্রস্তুতির উদ্দেশ্যটা শুধু বর্দ্ধিতহার B. T, স্কেল পাবার জন্যে লোভাতুর ব্যগ্রতায় "যেন তেন প্রকারেন" পরীক্ষায় "পাস" করার প্রহসনে দাঁড়াবেনা। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে পেশাগত প্রস্তুতির একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার অন্তরায় বহু, এবং বহু প্রকারের। হাজারো শিক্ষক ব্যাপৃত রয়েছেন শিক্ষকতা বৃত্তিতে যাঁদের পেশাগত প্রস্তুতি নেই। শুধু তাঁদের পেশাগত প্রস্তুতির সুযোগ দিতে গেলেই বহু বছর লেগে যাবে। দুটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এবং তৃতীয়টির আরম্ভে আমরা দেতখে পাচ্ছি যে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন অসম্ভব রকম বাড়বে, তেমনি বাড়বে স্কুলের সংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা। এই বর্দ্ধিত সংখ্যার সব শিক্ষককে পেশাগত প্রস্তুতির সুযোগ করে দেওয়া,—সে এক দুরূহ কাজ। শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতি তো এখন

"জরুরী অবস্থার" সামিল। ট্রেনিং কলেজগুলিতে অসম্ভব রকমের ভিড়। দশজনের জায়গায় প্রায় বিশজন শিক্ষার্থী ভর্ত্তি হচ্ছেন সেখানে। এতো ভিড়ে পেশাগত প্রস্তুতির যথেষ্ট অসুবিধা আছে। এমনি তরো আরো কতো রকমের অন্তরায় আছে পেশাগত প্রস্তুতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার পথে। এইসব প্রতিকূল অবস্থাগুলির কথা সম্যক অবহিত হয়েও আমাদের বক্তব্য এই যে পেশাগত প্রস্তুতিটি বড্ড "Theoretical" হয়ে যাচ্ছে। Theory ভারাক্রান্ত হয়ে এধরনের প্রস্তুতি বেশ ভাল হবে না। বেশী Theoryকে পরিহার করে "Practice"-এ নামতে হবে। বক্তৃতায় নয়, হাতে কলমে কাজেই আসে পেশাগত প্রস্তুতির সার্থকতা, পূর্ণতা। খুব কম সংখ্যক ট্রেনিং কলেজগুলির সংলগ্ন "Demonstration" স্কুল আছে। Demonstration স্কুল না থাকলে হাতে কলমে কাজ করা হবে কোথা? আমাদের ইতিহাস-শিক্ষকদের এই পেশাগত প্রস্তুতির পাঠ্যক্রম, শিক্ষন পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, বিশেষ করে "External Examination"-এর মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু সেগুলি এখানে প্রাসঙ্গিক হবেনা বলেই সেগুলি পাশকাটিয়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু যেটি এই প্রস্তুতির সাথে সাক্ষাৎ ভাবে এবং একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত সেই "অভ্যাস পঠন পাঠনের" (Practice teaching) সম্বন্ধে এই কথা বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাবে যে বর্ত্তমান অবস্থায় এটি যেভাবে চলছে তাতে দিন দিন এই অভ্যাস পঠন-পাঠনের (Practice teaching) ব্যবহারিক মূল্য কমে আসছে। বিস্তৃত ভাবে এর ত্রুটিগুলির আলোচনার প্রসঙ্গ এটি নয় তা আমরা স্বীকার করি তবু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি যে,—পেশাগত প্রস্তুতিতে শিক্ষক মশায় "থিওরী" নিয়ে খুব ব্যস্ত না থেকে "প্র্যাকটিসে" যাতে কিছু বেশী গুরুত্ব দেন তার ব্যবস্থা থাকবে এখানে। তিনি পাঠ্য পুস্তকের যথাযথ ব্যবহার শিখবেন; পঠন-পাঠনে প্রাসঙ্গিক "aids" ব্যবহার করতে শিখবেন; শিক্ষার সরঞ্জাম কিছু কিছু নিজে তৈরী করতে শিখবেন; বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক দেখে প্রাণবন্ত, সুসংবদ্ধ, অর্থপূর্ণ এবং যথাযথ অথচ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করতে শিখবেন, পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস বিষয়টি পড়বার সুযোগ পাবেন; এই প্রস্তুতির ব্যবহারিক দিকটির প্রতি সম্যক সচেতন হবেন; আমাদের দেশের স্কুল-পরিবেশে ট্রেনিংকলেজে শেখা বিদ্যের প্রয়োগ করবেন, শত অসুবিধেতেও হালছেড়ে দেবেন না। এক কথায় এই পেশাগত প্রস্তুতিটি কার্য্যকরী যাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তা নাহলে সবইতো ব্যর্থ হবে।

স্কুল পাঠ্যক্রমে বিশ্বইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হবার পর ইতিহাস পঠন-পাঠনের

মূল ভঙ্গির মধ্যে এসেছে আমূল পরিবর্ত্তন। ইতিহাস পঠন-পাঠনের এই পরিবর্ত্তিত ভঙ্গির সাথে ইতিহাস শিক্ষকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও একান্ত ভাবে সংশ্লিষ্ট। ইতিহাস পঠন-পাঠনের এই পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্যক পরিচিতি আর তার সাথে সমতা রেখে ইতিহাসের সম্বন্ধে সেই মনোভাব গড়ে তোলাও এই পেশাগত প্রস্তুতির প্রধান অঙ্গ হবে। ইতিহাসের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আস্তীর্ণ তথ্য-রাজির মধ্যে থেকে "কি"শেখানো হবে এবং "কেমন করে" শেখানো হবে,—এ প্রশ্ন মূলতঃ মনোবিজ্ঞানের। যা শেখানো হবে তা যেন শিক্ষার্থীর কাছে দুরূহ না হয়, যে উপায়ে শেখানো হবে তা যেন ফলপ্রসূ হয়,—এসবের মধ্যে আছে মনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক বিচার। কিন্তু শিক্ষার্থীদের কি শেখানো "উচিৎ" সেটি নির্ভর করে ইতিহাস পঠন-পাঠনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের উপর। কাজে কাজেই এই পেশাগত প্রস্তুতির সময়েই ইতিহাসের শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে যে ধরনের বিষয়বস্তু তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন তার প্রকৃতি সম্বন্ধে। উপস্থাপিত বিষয় বস্তুগুলির প্রকৃতি বিচার করতে হবে সেগুলির সাথে মানুষের জীবনের মূল ধারণাগুলির (যেমন, স্বাধীনতা, মানুষের স্বকীয় মর্য্যাদা, তার সৌভ্রাত্র, তার জীবন বোধ, তার শুভংকর চিন্তাধারার সার্ব্বজনীনতা প্রভৃতির) সম্পর্কের নৈকট্য উপলব্ধি করে। আর সেগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে মানব ইতিহাসের বিবর্ত্তনের পটভূমিকায়। এই সব বিচার বিশ্লেষণের সাথে সাথেই আবার চিন্তা করতে হবে যে এই সব তথ্যরাজি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবার সময় যে উপায়, যে পদ্ধতি, যে কৌশল অবলম্বন করা হবে তাতে যেন উপস্থাপিত তথ্যগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তাদের উপস্থাপন করার অন্তর্নিহিত অর্থ যেন সার্থক, সফল হয়। সেইজন্যেই অভিজ্ঞ এবং কুশলী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পেশাগত প্রস্তুতির সময়ে অর্জ্জিত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করবার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে থাকার একান্ত প্রয়োজন।

ইতিহাস পাঠ্যক্রমের এই অভিনবত্বের মধ্যে দিয়ে বর্ত্তমানে ইতিহাসের এই নব আদর্শ-বিন্যাস, এই নব দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির যে আন্তরিক প্রয়াস, আর এর পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে এই নতুন আদর্শের রূপায়ণ,—বাস্তবে তার সার্থক প্রয়োগ,—এ সবই নির্ভর করে ইতিহাস শিক্ষকের ব্যক্তিতা, অস্মিতার উপর। যে মালমশলার সাহায্যে তাঁর অস্মিতার নির্মিতি সেগুলি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। তাই সেগুলি ইতিহাস শিক্ষকের একান্ত নিজস্ব। পরিবেশ সেখানে সহায়ক মাত্র। তাই এই অস্মিতার যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হতে পারে এই পেশাগত প্রস্তুতির

সময়, এমন কথা আমরা অবশ্য বলিনা। তবে কি ধরনের অস্মিতা ইতিহাস শিক্ষক-মশায়ের হবে, কি ধরনের ব্যক্তিতা বা ব্যক্তিগত প্রকৃতি তাঁর থাকা উচিৎ সে সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকলে চোখের সামনে একটি আদর্শ থাকবে যেটি অনুসরণ করবার জন্যে সচেষ্ট হবেন ইতিহাস-শিক্ষক। মণীষার প্রাচুর্য্যে ইতিহাসশিক্ষকের মননশীলতা হবে প্রাণবন্ত। কল্পনা মধুর অথচ নৈর্ব্যক্তিক তাঁর মন হবে নব নব পরিকল্পনার উৎস, আর বিশ্লেষণাত্মক বিচার বুদ্ধিতে বাস্তবের সাথে নিবিড় ভাবে সংযুক্ত। ইতিহাসের শিক্ষক হবেন সংস্কৃতিবান। ব্যাপক ও উদার হবে তাঁর চর্য্যা,—শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজবিজ্ঞানে, দর্শনে, মানবিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই থাকবে তাঁর সঞ্চরণ। তাঁর নৈর্ব্যক্তিক মনের পটভূমিকা হবে উদার দৃষ্টিভঙ্গি—যাতে করে ঐতিহাসিক তথ্যরাজির যথাযথ আলোচনায় ও বিশ্লেষণে বিতর্কমূলক বিষয়গুলির যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন তিনি। অফুরাণ উৎসাহে ভরপুর এবং আন্তরিক অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ইতিহাস-শিক্ষক-মশায়ের সান্নিধ্যে এসে বিদ্যার্থীরা হবে উৎসাহী, অনুপ্রাণিত; আর তাদের মধ্যে জাগবে অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসা, আর সত্য অনুসন্ধান করবার ঐকান্তিক এষণা। বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে ভার সাম্য বজায় রাখার মত আত্মসমীক্ষা ইতিহাস-শিক্ষকের থাকবে। তানাহলে ইতিহাস পঠন-পাঠন অবাস্তব হবে। ইতিহাস-শিক্ষক হবেন আন্তর্জাতিক মনোভাব সম্পন্ন। আন্তর্জাতিক মনোভাবের উদ্বোধন তিনি করবেন শিক্ষার্থীদের মনে। ইতিহাস-শিক্ষকের যে কোনো রকমের ধর্ম্মের গোঁড়ামি, বিশেষ করে আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে, হবে বিশেষ ক্ষতিকর। যে কোনো রকমের মতবাদকে সহ্য করবার ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখবার মত সহিষ্ণু মন তাঁর থাকবে। আত্মাভিমান শূন্য এবং উন্মুক্ত মন থাকা ইতিহাস-শিক্ষকের একটি অতি আবশ্যকীয় গুণ। নিজ ভুল স্বীকার করার সৎ সাহস, নানা প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্য্য, এবং 'Sense of humour' থাকলে ইতিহাস-শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব পালনে নিশ্চয়ই সাফল্যমণ্ডিত হবেন। এই প্রসঙ্গটি শেষ করবার আগে একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এগুলি আদর্শ। এই আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে।

ইতিহাস-শিক্ষকের ছেদহীন শিক্ষা ও প্রস্তুতি।—

একটি একটি ফুল গেঁথে যেমন রচিত হয় পুষ্পমালিকা অনবদ্য সৌন্দর্য্যে, মানুষের জীবনের শিক্ষাও তেমনি অপূর্ব্ব গ্রন্থনায় মূর্ত্ত হয়ে উঠে জীবনের অভিজ্ঞতার পরম্পর সুসংবদ্ধ সমাহারে। সব স্তরের সব শ্রেণীর মানুষের পক্ষে এটা

যেমন প্রযোজ্য তেমনি সব রকমের শিক্ষার বেলাতেও এটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার যেমন বিরতি নেই, অভিজ্ঞতারও তেমনি শেষ নেই। জীবনভোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। জীবন ভোর শিক্ষা। ইতিহাস-শিক্ষক ও শেখেন সারা জীবন। যে দিন থেকে তাঁর শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশ যেদিন থেকে শ্রেণীকক্ষে তাঁর উপস্থিতি, সেই দিন থেকেই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে শিক্ষা শুরু। প্রতিটি দিনের কার্য্যসমাধার প্রয়াসে, আলাপে আলোচনায়, অধ্যয়নে চিন্তায়, বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের নিরীক্ষাগারে, বিদ্যার্থীর সংস্পর্শে, সামাজিক পরিবেশে, হাজারো অভিজ্ঞতার সমাবেশ হয় ইতিহাসশিক্ষক-মশায়ের শিক্ষক-জীবনে। আর বহু প্রকারের এই অভিজ্ঞতাগুলির কুশলী সংগ্রহে এবং প্রয়োগে, পরীক্ষা নিরীক্ষায় সিদ্ধির ব্যাপ্তি ঘটে তাঁর শিক্ষা সাধনায়, তাঁর পেশায়। জীবনে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। যে কোনো পেশায় অভিজ্ঞতার দাম আমরা যথাযথ ভাবেই দিয়ে থাকি। ইতিহাস শিক্ষককে তাই জানতে হবে, শুনতে হবে, ভাবতে হবে, দেখতে হবে, শিখতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে,—এসব তো তাঁর জীবনের প্রাত্যহিক কাজ। এর মধ্যেই তিনি থাকবেন জীবন্ত। এছাড়া তিনি মৃত, তিনি নিভে যাবেন। যে প্রদীপ নিভে যায় সে আর পাঁচটা প্রদীপকে জ্বালতে পারে না।

ইতিহাস-শিক্ষকের দৈনন্দিন জীবনের আহৃত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা ছাড়াও তাঁর ছেদহীন শিক্ষা ও প্রস্তুতির কয়েকটি বাস্তব পন্থার কথা উল্লেখ করা হবে এখানে। ইতিহাস-শিক্ষকের এই ছেদহীন শিক্ষা ও প্রস্তুতি একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। কারণ আমাদের এই বিংশশতক গতির যুগ। মানুষের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার সব ক্ষেত্রের পরিধিই প্রচণ্ড গতিশীলতায় অবিশ্বাস্য ও কল্পনাতীত দূরত্বের দিগদিগন্ত বিস্তৃত হয়ে চলেছে। লাখো পরীক্ষা নিরীক্ষায় শিক্ষাবিজ্ঞানের, শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের ও শিক্ষাশ্রয়ী সমাজ বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আজ সমৃদ্ধই শুধু নয়, ক্রমবর্দ্ধমান। লাখো পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রয়োগসিদ্ধ শিক্ষাবিজ্ঞানের এই ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানের সাথে পরিচয় থাকতেই হবে প্রত্যেক ইতিহাস-শিক্ষকের। তা নাহলেই পিছিয়ে পড়তে হবে। দুনিয়া এগিয়ে চলেছে, সমান তালে চলতে না পারলেই পথে বসতে হবে। গতিই যেখানে জীবন, গতির অভাবই সেথা মৃত্যু। মানুষের ভাবধারা দ্রুত পাল্টায়। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি পাল্টায় বহু বিলম্বে। মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের ফলে এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে আনে সামাজিক পরিবর্তন। ইতিহাস-শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে, সেই সব সামাজিক পরিবর্তনগুলিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সামাজিক এই পরিবর্ত্তনগুলির প্রভাব তাঁর নিজের জীবনে, বিদ্যার্থীর জীবনে যাতে মঙ্গলকর হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যার্থীর শিক্ষা। শিক্ষকমশায় তার সাথে পরিচিত না থাকলে শিক্ষার বিপত্তি আছে।

যথাযথভবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে হলে ইতিহাস শিক্ষকমশায়ের চাই মনের প্রসারতা, জ্ঞানের গতিশীলতা, অভিজ্ঞতার নিত্যসঞ্চয়, সংযোজন। এগুলি হবে তাঁর জীবনে ক্রমাগত। জ্ঞানানুসন্ধানে ও জ্ঞানার্জ্জনে নিত্যনৈমিত্তিক। এর জন্যে চাই অর্থ, বর্দ্ধিতহারে বেতন কিংবা বিশেষ ভাতা, যা দিয়ে তিনি কিনতে সক্ষম হবেন সংশ্লিষ্ট আধুনিক পুস্তক, ম্যাগাজিন প্রভৃতি। ম্যাগাজিন শুধু নিজের দেশের নয়, দেশবিদেশের। দেশ বিদেশের ইতিহাস-শিক্ষকেরা যে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে নানা পরীক্ষায়, গবেষণায়, বিশ্লেষণে এগিয়ে চলেছেন, তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করছেন শ্রেণীকক্ষে, আর যে ফললাভ করছেন সেই প্রয়োগ প্রযোজনায়,—সেইগুলি আমাদের দেশের পরিবেশে কি করে প্রয়োগ করা যায়, সেই জ্ঞান আহরণ করতে হবে। এ সবের জন্যে শুধু অর্থই চাইনা, চাই উপযুক্ত অবকাশেরও।

ঐক্য এবং সংস্থায় প্রচেষ্টা হয় সঙ্ঘবদ্ধ এবং সেই জন্যেই তাতে সাফল্য আসে দ্রুত। সঙ্ঘবদ্ধ সংস্থাশক্তিই আজকের যুগের শক্তি। তাই সাধারণ ক্ষেত্রে একাকীত্ব ও একক প্রচেষ্টা সাফল্যলাভের পথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তরায়। একক প্রচেষ্টায় বাধা দুস্তর। তাই সঙ্ঘ-শক্তির উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে ইতিহাস শিক্ষকদের কোনো সংস্থা নেই। আমাদের দেশে যে সব শিক্ষক সংস্থা গড়ে উঠেছে সেগুলির অধিকাংশই দাবী দেওয়া ও দাবী আদায় করার মধ্যেই তাঁদের কার্য্যাবলী মুখ্যতঃ সীমাবদ্ধ রেখেছেন। গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ট্রেনিং কলেজে Extension service Department-এর মাধ্যমে স্কুলের পঠন-পাঠনের অসুবিধাগুলি দূর করবার ব্যবস্থা হলেও শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনের অসুবিধেগুলি অনুসন্ধান করে সেগুলি দূর করবার জন্যে আরও বেশীকরে চেষ্টার প্রয়োজন।

গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এ প্রচেষ্টা ছাড়াও ইতিহাসের শিক্ষকমশায়দের একটি সংস্থা থাকা দরকার। জেলাকে য়ুনিট ধরে সারা 'ষ্টেট'-ব্যাপী সে সংস্থার কাজ বিস্তৃত থাকতে পারবে। ইতিহাস-শিক্ষকমশায়রা ঐ সংস্থার মাধ্যমে মাঝে মাঝে একত্রে মিলিত হবেন, আলোচনা করবেন, দৈনন্দিন

জীবনে যা অভিজ্ঞতা হয় সেগুলি একে অন্যকে বলবেন, অন্যদের কাছে শুনবেন। যদি কোনো বিশেষ সমস্যা থাকে সেটি সাধারণভাবে আলোচনা করবেন। এতে ভাবের আদান প্রদান হবে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও প্রসার হবে, নানা সমস্যার সমাধান হবার পথ প্রশস্ত হবে,—এমন কি অনেক ভুলও সংশোধিত হবে। ইতিহাসের শিক্ষক মশায়দের শিক্ষার ব্যাপ্তির জন্যে এই ধরনের সংস্থা খুবই শুভংকর হবে।

নিজেদের 'ষ্টেটের' ইতিহাস-শিক্ষকদের সাথে পরিচিতির সাথে সাথে এর কাজ আরও ব্যাপকতর করা যেতে পারে। এর পরে ভারতের অন্যান্য "ষ্টেটের" ইতিহাস-শিক্ষকদের সাথে পরিচয় পরিচিতি আর তার পরের ধাপ হবে ভারতের বাইরের অন্যান্য দেশের ইতিহাস-শিক্ষকদের সাথে পরিচয় পরিচিতি। এতে দৃষ্টির প্রসারতা বাড়বে। আমরা ইতিহাস পড়াতে গিয়ে যে যে সমস্যার সম্মুখীন হই, অনুরূপ প্রকৃতির সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অন্যদেশের ইতিহাস-শিক্ষকেরা কি করেছেন, বা কি করছেন, বা কি করে সমাধান করেছেন, সে সমাধানটিই বা কি,—এমনিতরো বহু জ্ঞাতব্য জিনিস এই ধরনের পরিচিতির মাধ্যমে জানতে পারা যাবে।

ইতিহাস শিক্ষকের জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও অভিজ্ঞতার গভীরতার জন্যে আরেকটি জিনিসের প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে দেশভ্রমণ। আমাদের পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ ইতিহাস-শিক্ষক নিজের গৃহ পরিবেশ ছাড়া, কি বড়ো জোর ২৫।৩০ মাইল পরিধি ছাড়া বাহিরে বোধহয় যাবার সুযোগ বিশেষ পাননি। অনেকে হয়তো নিজের জিলা ছাড়া অন্য জিলায় কম গিয়েছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের জিলার সবজায়গাও তাঁর যাওয়া সম্ভব হয়নি, দেখা হয়নি। এটি ইতিহাসের শিক্ষকের বিশেষ গৌরবের নয়, এতে ইতিহাস পঠন-পাঠনেও তাঁকে অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। সামান্য দূরত্বের যে সব ভ্রমণ তার জন্যে বিশেষ অর্থের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বাইরে যাবার জন্যে বা দক্ষিণ বাংলার শিক্ষককে উত্তর বাংলায় যাবার জন্যে, কি বাংলাদেশের শিক্ষককে বাংলার বাহিরে উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত কি দক্ষিণ ভারত যাবার জন্যে কি ঐ সব এলাকার ইতিহাস শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসার জন্যে, এবং ঐ সব স্থানের স্কুল পরিবেশের সাথে পরিচয় করবার জন্যে একক প্রচেষ্টায় হবে না, সেখানে আবশ্যক সঙ্ঘ-শক্তির, সরকারী আনুকূল্যের। আমাদের দেশের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের দেশের পর আছে দেশবিদেশ। সেখানে যাবার, দেখবার, শোনবার, জানবার অনেক আছে। এগুলির জন্যে

প্রয়োজন অর্থের, প্রয়োজন সংস্থার, সঙ্ঘ-শক্তির, সরকারী সাহায্যের।

আজকাল আন্তর্জাতিকতার যুগ। আমরা দেশ বিদেশের ইতিহাস শিক্ষকদের নিয়ে 'সেমিনার' করতে পারি। সেখানে নানা আলোচনায় অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ইতিহাস-শিক্ষকের আদান প্রদানের মাধ্যমে ও এ কাজটি আরও সহজ হয়। আমাদের দেশের ইতিহাস শিক্ষক অন্যদেশে গেলেন আর সেই দেশ থেকে ইতিহাস শিক্ষক এলেন আমাদের দেশে,—এতে ইতিহাস শিক্ষক হবেন বহুদর্শী। অন্যদেশ ও তার সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে লাভ করবেন বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে ইতিহাস শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনে, তাঁর পেশাগত দায়িত্বে, ব্যষ্টির জীবনে, আর সমষ্টির জীবনে।

আমাদের দেশে "Refresher course" বলে একটি কথা আছে। সেটির বাস্তব প্রয়োগ আমরা করতে পারি ইতিহাস শিক্ষকদের বেলায়। আজকাল সরকারের আনুকূল্যে "Workshop" হচ্ছে দেশের নানান জায়গায়। ইতিহাস পড়ানোর সমস্যাগুলি নিয়ে "Workshop" এর ব্যবস্থা করে যাতে বেশীসংখ্যক ইতিহাস-শিক্ষক এই "Workshop"-এ যোগ দেন তার ব্যবস্থা করলে যে ভাল ফল পাওয়া যাবে এবং ইতিহাসের শিক্ষকের যে "বিষয় ও পদ্ধতির" সম্বন্ধে জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

নানা দেশের ইতিহাস-পাঠ্য-পুস্তকের যদি সংগ্রহ থাকে প্রতি স্কুলের Library-তে তাহলে ইতিহাস শিক্ষকদের উপকার হবে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসের বিষয় বস্তুর নির্ব্বাচন ও বিন্যাস কিভাবে করা হয়েছে, কিভাবে বিষয় বস্তুর উপস্থাপন করবার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে বা করা হয়ে থাকে,—এসবগুলির জানবার সাথে সাথে ইতিহাস বিষয় সম্বন্ধে যেমন ইতিহাস-শিক্ষকের জ্ঞান ব্যাপক হবে, তেমনি অন্যান্য দেশের ইতিহাস পঠন-পাঠন সম্বন্ধেও তাঁর একটা মোটামুটি ধারণা হবে। এধরনের ধারণারও প্রয়োজন আছে এইজন্যে যে এ ধারণা থাকলে নিজদেশের ইতিহাস-পাঠ্যপুস্তক, তার বিষয় নির্ব্বাচন ও বিন্যাস পদ্ধতি, এবং উপস্থাপনের মূল নীতিগুলির সম্বন্ধে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে নিজের পেশাগত দায়িত্ব অধিকতর সাফল্যের সাথে সমাধা করতে সক্ষম হবেন।

ইতিহাসশিক্ষক-মশায়ের দৈনন্দিন প্রস্তুতি ও পাঠটীকা রচনা :—

ইতিহাস শিক্ষকের সাধারণ যোগ্যতা, ইতিহাসের বিষয়-বস্তুর উপর দখল, পেশাগত প্রস্তুতি, তাঁর নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানার্জ্জন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ছাড়াও আর

একটি বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা না করলে "ইতিহাসের শিক্ষক" এই অধ্যায়টির আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে বিষয়টি হচ্ছে ইতিহাস-শিক্ষকের দৈনন্দিন প্রস্তুতি। এটি অবশ্য পেশাগত প্রস্তুতির অন্তর্গত অংশ; কিন্তু এ জিনিষটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কিছুটা বেশী বলে পৃথক আলোচনা অবান্তর হবে না।

ইতিহাস শিক্ষকের দৈনন্দিন পাঠ প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। ইতিহাস এমন একটি বিষয় যে প্রস্তুতি ছাড়া এর পাঠদানে বিপত্তি আছে। ইতিহাস পাঠ্যক্রমে যে সব বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত, তাদের সাথে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার ব্যবধান দুস্তর। বাস্তব সংস্পর্শহীন তথ্যতাবাস উপস্থাপনে যদি না মনোরম ভঙ্গি এবং সহজ প্রণালী অনুসৃত হয় তাহ'লে তা নীরস হয়। এ ভঙ্গি বা প্রণালী প্রস্তুতি না থাকলে আসে না। বহু নিরীক্ষা ও গবেষণায় অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে ইতিহাসের, নতুন করে রচিত হচ্ছে ইতিহাস নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গিতে। এ সবের খোঁজখবর না রাখলে ইতিহাসের শিক্ষক-মশায়ও যেমন পিছিয়ে পড়বেন, তেমনি তাঁর ছাত্রদের কাছে যা উপস্থাপিত করবেন তা হবে হয়তো একশতাব্দী আগেকার তথ্য বা সিদ্ধান্ত। তাছাড়া নতুন ও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে পাঠ হবে বৈচিত্র্যহীন এবং মামুলি। আর একই তথ্যের বার বার প্রতিবছরে পুনরাবৃত্তি তাঁর নিজের কাছেও স্বাদহীন, নিরানন্দময় ঠেকবে। তাই নতুন তথ্যের সংকলনে, আধুনিকতম সিদ্ধান্তসমূহের সাথে পরিচয়ে, ইতিহাস-শিক্ষকের ইতিহাসে জ্ঞানের ব্যাপ্তি আর সংযোগ থাকবে। তা নইলে তাঁর পাঠ অন্তঃসার শূন্য হয়ে যাবে পুরানো একঘেয়ে ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে।

জ্ঞানের রাজ্যে আছে নানা ভাব, নানা চিন্তা। সেগুলি সনাতন নয়। তারা নিত্য নতুন। ইতিহাসের শিক্ষককে ভাবসমৃদ্ধ ও চিন্তাশীল হতে হবে। জ্ঞানের রাজ্যে তাঁর হবে সহজ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ, নিয়ত। তবেই তো নিত্য নতুন ভাবে, নতুন চিন্তায় তিনি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে পারবেন,—তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা ঘটাতে পারবেন। এর জন্যে শিক্ষকমশায়ের দৈনন্দিন প্রস্তুতি চাই।

দৈনন্দিন পাঠটীকা রচনা করবার জন্যে পেশাগত প্রস্তুতির সময় ইতিহাস শিক্ষক এই দৈনন্দিন প্রস্তুতির কাজ করে এসেছেন হাতে কলমে। পেশাগত প্রস্তুতির শেষে নিজ স্কুলে এটি বাস্তবে প্রয়োগ করবার সময় একটি কথা তাঁকে মনে রাখতে হবে। সারা বছরের পাঠ্যক্রমকে তিনি দুটি কি তিনটি "term"এ (যে স্কুলে যেমন নিয়ম চলিত আছে সেইমত) ভাগ করে নেবেন। তারপর

এক একটি "term"-এর পাঠ্যক্রমটিকে যথাযথ "দৈনিক পাঠে" ভাগ করে নেবেন। এই "দৈনিক পাঠ" ভাগ করবার সময় তাঁকে সামান্য হিসেব করে নিতে হবে। প্রথম তাঁকে দেখতে হবে যে একটি "term"-এ তিনি কতগুলি ক্লাস পাচ্ছেন। যতগুলি ক্লাস পাচ্ছেন সেই অনুসারে তাঁকে পাঠ্যক্রমটিকেও ভাগ করে নিতে হবে। উদ্দেশ্য, সমস্ত পাঠ্যক্রমটি যেন বছরের মধ্যে শেষ হয়। এই ভাগ করবার সময় পাঠের পুনরালোচনা (revision) ও লিখিত কাজের জন্যে ও যথাযথ সময় আলাদা করে রেখে দিতে হবে। এই ভাগের পর তাঁকে দৈনন্দিন পাঠের প্রস্তুতিতে লাগতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে ইতিহাস পঠন-পাঠনে সমস্ত বছরের পাঠ্যক্রমটির সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা চাই। খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত আকারে পাঠ-রচনা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়। পাঠ্যক্রমটির সামগ্রিক রূপ চোখের সামনে থাকলে পাঠ রচনায় ও পরিকল্পনা মত পাঠ পরিচালনায় ধারাবাহিকতা থাকে। ইতিহাস পাঠে ধারাবাহিকতা না থাকলে বহু অসুবিধে আছে। সারা বছরের পাঠ্যক্রমের সামগ্রিক পরিকল্পনা, পাঠ রচনায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ইতিহাস শিক্ষকের দূরদৃষ্টি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এই পেশায় নতুন যিনি, তাঁর অভিজ্ঞ সহকর্মীর সাথে আলাপ আলোচনায় লাভবান হবেন।

দৈনন্দিন পাঠের প্রস্তুতি বা পাঠটীকা তো পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেমন করে নতুন পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে ইতিহাস শিক্ষক উপস্থাপিত করবেন এতো তারই পরিকল্পনা। পাঠের কি উদ্দেশ্য সেটি আগে ঠিক করে নিতে হবে। তারপর পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্যে কি ভাবে কোন্ রকমের প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের মন পাঠাভিমুখী করবেন, উপস্থাপন সুগম ও সহজবোধ্য করার জন্যে কিকি এবং কি ধরনের "aids"এর সাহায্য নেবেন, উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর কি সংক্ষিপ্তসার ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন, কি উপায়ে অভিযোজন করবেন, পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার কতটুকু এবং কি ভাবে করবেন, লিখিত কাজ দেবেন কিনা, লিখিত কাজ দিলে কি ধরনের লিখিত কাজ দেবেন,—এমনি বহু জিনিস তাঁকে ভাবতে হবে, প্ল্যান পরিকল্পনা করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য গ্রন্থ থেকে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে তথ্য সংকলন ও সংগ্রহ করতে হবে,—এসবের জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

প্রথম প্রথম একটা পাঠ প্রস্তুত করতেই সারা সন্ধ্যা হয়তো চলে যাবে, প্রস্তুতির বেশী সময় পাবেন না। তাতে দমে যাবার প্রয়োজন নেই। ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। নিত্যকার আপনার যা প্রস্তুতির ফল সেগুলি যেন নষ্ট

করবেন না। সে গুলি যত্ন করে রেখে দিন দ্বিতীয় বছরে দেখবেন আপনার পরিশ্রম অনেক কমে গেছে। তখন কেবল নতুন তথ্য সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠটিকে পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করে নেওয়া। মূল তথ্যের জন্যে বা তথ্যের বিন্যাসের জন্যে তখন আর বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন হবেনা। পদ্ধতির কথা তখন বেশী করে ভাববার অবকাশ পাবেন।

এই পদ্ধতির কথা প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। আপনার দৈনন্দিন পাঠ এমনি ভাবে প্রস্তুত করবেন যে তা যেন সহজেই পরিবর্ত্তন করা যায়। কারণ শ্রেনীকক্ষে শিক্ষক মশাইকে সবসময়েই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। আপনার পাঠটি যদি অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে আপনার অসুবিধে হয়, আপনার ছাত্রছাত্রীদের তাতে আরো অনেক বেশী অসুবিধে হবে, আর ক্ষতি হবে। দৈনন্দিন পাঠ প্রস্তুতির সময় আর একটি কথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে। যে পাঠটি পরিচালনার জন্যে আপনি প্রস্তুত হচ্ছেন, পরিকল্পনা তৈরী করছেন, তার থেকে আপনি কিকি জিনিস বিদ্যার্থীদের শিখতে সাহায্য করবেন, অর্থাৎ ঐ পাঠটির উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে আপনার সুস্পষ্ট ধারণা থাকার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে, এটি স্বচ্ছ থাকলে আপনার পরিকল্পনা সফল হবেই। এটি শিক্ষকমশায়ের পাঠপ্রস্তুতির মূলকথা। এটির অভাবে আপনার পাঠ হবে উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো।

এমনি ভাবে যদি শিক্ষকমশায় তাঁর দৈনন্দিন প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহলে তাঁর পাঠপরিচালনা নিশ্চয়ই সার্থক হয়ে উঠবে।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে সময়ের ধারণা

ইতিহাস পঠন-পাঠনে সময়ের ধারণার একান্ত প্রয়োজন। মহাকালের অনন্ত যাত্রার বিজয়রথের নেমিচ্ছিন্ন এবং শতঘটনা আস্তীর্ণ পথের বাঁকে বাঁকে যে কাহিনী-গুলি মানুষকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সেগুলি, আমাদের একালের সাথে সম্পর্কযুক্ত আছে, আবার একাল থেকে অনেক আগেকার কালের সাথেও যুক্ত আছে। যে সব ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে মানুষের কাহিনী গড়ে উঠেছে সেগুলির বিন্যাস সাধন করবার প্রয়োজন আছে। বিন্যস্ত না হ'লে সেগুলি থাকবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বহু ঘটনার অবিন্যস্ত ভিড়ে সেগুলি হবে বিভ্রান্তিকর, হিজিবিজি। কিন্তু রাশি রাশি এই ঘটনাগুলির বিন্যাস সাধন হবে কোন উপায় অবলম্বনে? ক্রমকে অবলম্বন করে এই বিন্যাস সাধন করবার কথাই বলেছেন প্রায় সকলে। ক্রমকে অবলম্বন করে ঘটনার বিন্যাস সাধন করবার প্রথা চলে আসছে। ঘটনাগুলির ক্রমিক বিন্যাস সাধনই যুক্তিযুক্ত। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখি একটি দিন শেষ হয়, আর একটি দিন আসে। এই আসা যাওয়ার মধ্যে একটি "ক্রমের" অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। তাই ক্রমানুসারে ঘটনার বিন্যাস সাধন প্রায় সর্ব্বজনগ্রাহ্য। অবিন্যস্ত ও ইস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুষ্পসমষ্টি যেমন সূত্রের সান্নিধ্যে গ্রথিত হলে সেগুলি পুষ্পমালিকার অনুপম শোভায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে, তেমনি অতীত বর্ত্তমানের ঘটনা রাশি 'ক্রমের' সূত্রে গ্রথিত হয়ে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ রূপে ইতিহাস রচনা করে। কিন্তু ঘটনাগুলির শুধু ক্রমানুসারে বিন্যাসেই পরিসমাপ্তি ঘটলে তাও সব সময়ে সহজবোধ্য হবে না। তাই অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ঘটনাগুলির সংশ্লেষ ও সংযোজনের প্রয়োজন এবং তার পর তাদের ক্রমিক বিন্যাসই শোভন হয়।

ঘটনাগুলি ঘটবার সময় একটা থাকবেই। যে কোনো ঘটনাই ঘটুক না কেন সে ঘটেছিল বিশেষ এক সময়ে। সময়কে আমরা বলি কাল,—মহাকাল। মহাকাল পৃথিবীর প্রতি অনু পরমানুতে, আকাশে বাতাসে, পরিব্যাপ্ত; সে সর্ব্বব্যাপী, সতত সঞ্চরণশীল। সময় ছাড়া ঘটনার ধারণা বাস্তব নয়। সময় ছাড়া যেমন কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না তেমনি স্থান ছাড়া কোনো ঘটনার কল্পনাও করা যায় না। ঘটনা তো শূন্যে ঘটতে পারে না। যে ঘটনার সাথে তাই

কালের ও স্থানের কোনো সংস্রব নেই সে তো আজগুবি, আগড়্ বাগড়্। তার সাথে আমাদেরও কোনো সম্পর্ক নেই। আবার যে "কালের" সাথে ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই, যে কাল শূন্য, তার সাথেও আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের এই দৈহিক কাঠামোর মধ্যে যে জীবন তার ধারণা যেমন আলো এবং জলবাতাসহীন পৃথিবীর বুকে করা যায় না, তেমনি স্থান আর কালের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য কোনো ঘটনার ধারণাও ইতিহাসে করা যায় না। ইতিহাস পাঠে ঘটনার সাথে স্থানের এবং কালের এই গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের জন্যেই সময় এবং স্থানকে ইতিহাসের দুটি চোখ বলা হয়ে থাকে। "Chronology and Geography are two eyes of history." বলা বাহুল্য যে "Chronology"-র মধ্যে সময়ের, আর "Geography"-র মধ্যে স্থানের কথা সুস্পষ্ট।

সময়ের ধারণা বিমূর্ত্ত। বিমূর্ত্তকে মূর্ত্ত করা সহজসাধ্য নয়। ইতিহাস পাঠে সময়ের ধারণা না হলে সে হয় অর্থহীন। তাই শিক্ষার্থীর যাতে সময়ের ধারণা সুসংগঠিত করতে পারা যায় তার জন্যে চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে থাকবে জটিলতাকে পরিহার করে সহজ সরল পন্থার অনুসার। প্রথমেই দেখতে হবে কি উপায়ে সহজভাবে, স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষার্থীর কাছে এই অমূর্ত্ত "সময়ের ধারণা' মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে। অমূর্ত্তকে মূর্ত্ত করবার প্রধান এবং ফলপ্রসূ উপায় হচ্ছে প্রতীকের সাহায্য। কিন্তু এই প্রতীক কি ধরনের হবে ? কি ধরনের প্রতীকের সাহায্য নিলে আমাদের প্রচেষ্টা সহজেই সাফল্য লাভ করবে সেটি পূর্ব্বাহ্নে ঠিক করে নিতে হবে। এই প্রতীক ঠিক করবার আগে আমাদের পরিষ্কার ভাবে জানা উচিৎ যে আমরা পরিণত বয়সের লোকেরা কি ভাবে সময়ের ধারণা করে থাকি। আর কি ভাবে শিক্ষার্থীর সময়ের ধারণা দেওয়াটা স্বাভাবিক এবং সঠিক হবে। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে সময়ের ধারণা পরিণত বয়সের মানুষের কাছেও শক্ত, অস্পষ্ট। আসলে সময়ের স্ব-রূপ কোনো অস্তিত্বই নেই, এবং সেই জন্যেই সময়ের সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করে নিতে বাধ্য হয়ে থাকি। কিন্তু এই ধারণাটি আমরা কিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলে থাকি ? এটি কি মানুষের স্বজ্ঞা (intuition) সংজাত না তার অনুমিতির (inference) উপর প্রতিষ্ঠিত ? একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, সময় সম্বন্ধে মানুষের ধারণা স্বজ্ঞা সংজাত নয় এটি এক ধরনের অনুমিতি, এবং এই অনুমিতির কাঠামো গড়ে উঠে কতকগুলি কারণ প্রমাণ এবং সাক্ষ্য সম্পর্কের উপর ভিত্তি

করে। সকাল বেলা পূবদিকে সূর্য্য উঠে, দিন হয়। সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম গগনে সূর্য্য ডুবে যায়। দিনের আলো নিভে যায়। একটি দিন শেষ হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পৃথিবীর আপন অক্ষে যে আবর্ত্তন সেটা আমাদের কাছে অদৃশ্য থাকে। আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখি পূর্ব্ব দিকচক্রবাল থেকে শুরু করে পশ্চিম দিগন্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যের অবস্থিতির ক্রমিক স্থান পরিবর্ত্তন। এমনি ভাবেই বিমূর্ত্ত সময়ের ধারণার সাথে আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের মনে "স্থানের ভাবের" (Space conecpt) সাথে একটি স্বাভাবিক এবং ক্রমিক নৈকট্য গড়ে উঠে এই দুইটিকে নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত করে তুলে থাকে। তার পর দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে, শিশু বড়ো হয়, কিশোর তরুণ হয়, তরুণ প্রৌঢ়, প্রৌঢ় বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সবগুলি মিলে সময়ের যে অনুমা আমাদের মনে আনে তার মধ্যে একটা গতির, বৃদ্ধির, ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এই গতির এবং বৃদ্ধির অনুমিতির সাথেও স্থানের ভাব (space c ·ncept) ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া অসংখ্য শত বছর ধরে পৃথিবী আপন কক্ষ পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিন করে চলেছে। এই পরিক্রমার পথে আপন অক্ষে ও হচ্ছে তার আবর্ত্তন। অবিরাম এই পরিক্রমার সাথেও এই "স্থানের ভাব" (space concept) সুস্পষ্ট।

তাই সময়ের ধারণাকে শিক্ষার্থীর কাছে মূর্ত্ত করে তুলতে আমরা যে প্রতীক সাধারণতঃ ব্যবহার করি তা স্বাভাবিক কারণেই স্থান (space) এর সাথে সম্পর্কিত। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের সময়ের ধারণা সুগঠিত করবার জন্যে আমরা সাধারণতঃ রেখার প্রতীকের সাহায্য নিয়ে থাকি। রেখাটিকে সময় রেখা নাম দিই। এই রেখাটির একদিকে ছাড়া ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি নেই; বিস্তৃতি শুধু দৈর্ঘ্যে। তার কারণ আর কিছুই নয় সময়ের ব্যাপ্তি শুধু একদিকেই। একটি উদাহরণ নিন। আজ যে দিনটি শেষ হচ্ছে তার প্রতীক হিসেবে একটি এক ইঞ্চি রেখা টানুন। এক দিনের প্রতীক হিসেবে যদি এক-ইঞ্চি একটি রেখা নেন তাহলে আগামীকাল যে দিনটি আসবে এবং শেষ হয়ে যাবে সেটির প্রতীক হিসেবে আর একইঞ্চি রেখা পূর্ব্ব অঙ্কিত রেখাটির সাথে যুক্ত হচ্ছে [একদিন | দুদিন | তিনদিন | | |] যে দিনটি শেষ হয়ে গেল "সেই" দিনটি তো আর ফিরে এলোনা। দিনটি শেষ না হয়ে অপেক্ষাও করলোনা। কাজেই সময়ের ব্যাপ্তি একদিকেই। আবার দুটি দিনের মাঝখানে অন্য কিছু এসে একটি দিনের উপস্থিতিকে ব্যাহত বা বাধাগ্রস্তও করলোনা। কাজে কাজেই সময়ের ব্যাপ্তি নিরবচ্ছিন্ন। এখন কথা হচ্ছে যে সময় রেখার এই প্রতীকের

মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে সময়ের ধারণা সংগঠিত করা হবে কি করে? আপনি একটি শ্রেণী কক্ষে পড়াচ্ছেন। শ্রেণীকক্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের গড় বয়েস বারো বছর। "বর্ত্তমানে" তাদের বয়েস যদি বারো বছর হয় তাহলে তাদের জীবনে বারটি বছর কেটে গেছে। একটি বিশ ইঞ্চি রেখা টানুন। শুরুতে ১৯৬২ লিখুন। এক ইঞ্চি পরিমাণ রেখা ধরুন এক বছরের জন্যে। বর্ত্তমানে অর্থাৎ ১৯৬২ সালে শিক্ষার্থীদের বয়েস বারো বছর হলে আজ থেকে কতদিন আগে শিক্ষার্থী জন্মেছিল তার হিসেব মোটামুটি এই সময়-রেখায় ধরা পড়ে। শিক্ষার্থীর কাছে সে হিসেব চাক্ষুষ হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীর সময়বোধ এমনি করে জন্মায়।

সময়রেখা-প্রতীকের সাহায্যে সময়ের ধারণা শিক্ষার্থীর মনে গড়ে তোলবার এই হচ্ছে মূলনীতি। শিক্ষার্থী ক্রমশঃ যতো বড়ো হয় এই মূলনীতি অনুসরণ করে সময় রেখাকে রঙে, সংখ্যায় নানা ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনাময় করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সব ঘটনা আমরা পড়ি তাদের সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে নিতে সাহায্য করি। সময় বোধ শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে তোলবার পর ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে সময়ের ধারণা স্পষ্ট করে তোলবার জন্যে আবশ্যক হবে ঐ ঘটনাগুলির সম্বন্ধে কতকগুলি সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা। এগুলির দ্বারা সম্পর্কিত হয়ে সময়ের ধারণা শিক্ষার্থীর মনে হয়ে উঠবে প্রোজ্জ্বল। বলা বাহুল্য প্রতীক এই সময় রেখাই থাকবে। এই সম্পর্কগুলি যথাযথ সন্নিবিষ্ট করতে পারলে সময়ের অনুমিতি সহজ হয়ে উঠবে। এই সময়ের অনুমিতি যেহেতু "স্থানের ভাবের" (space concept) সাথে ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে আবদ্ধ সেই জন্যে সময়ের অনুমার জন্যে যে উপমাগুলি আমরা উল্লেখিত সম্পর্কগুলির সাথে সংযুক্ত করে থাকি সেগুলিও হবে "স্থানের ভাবের" (space concept-এর) সাথে সংসৃষ্ট। যে সম্পর্কগুলির মাধ্যমে সময়ের ধারণা মূর্ত্ত করতে চেষ্টা করা হয়ে থাকে সেগুলি হচ্ছে অবস্থাপন location), দূরতা (distance) ব্যাপ্তি (duration

সময়রেখায় কোনো ঘটনাকে বা ইতিহাসের কোনো চরিত্রকে অবস্থাপিত করতে হলে সময় বোধের যেটি প্রধান সোপান অর্থাৎ "পূর্ব্ব ও পর" বোধ সেটি করে নিতে হবে আগে। তার পর আসবে "কোন সময় হতে" পূর্ব্বে বা পরে, এবং কতো পূর্ব্বে বা পরে এই প্রশ্ন। সমগ্র সময় বোধের নিশানা হিসেবে সময়-রেখার উপর এমন একটি বিশেষ স্থান ঠিক করে নিতে হবে যার উপর দাঁড়িয়ে বলতে পারা যাবে এখান থেকে কতো পূর্ব্বে বা কত পরে। রেখার ভাষায় সেই স্থান হচ্ছে বিন্দু। আমরা আমাদের এই বর্ত্তমানকে এমনি একটি বিন্দু ধরে নিয়ে থাকি। আবার অতীত কালের কোনো একটি যুগান্তকারী ঘটনার সময়টিকেও

অনুরূপ একটি বিন্দু ধরে নেওয়া ও হয়ে থাকে। যীশুখৃষ্টের সময়কে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এরূপ একটি বিন্দু ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। যার ফলে খৃষ্টাব্দ বা খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ নামকরন করে সময়ের হিসেব করবার চলন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ধরনের বিন্দু সময়রেখাতে ঠিক করে নেবার পর ইতিহাসের যে কোন ঘটনার, "পূর্ব্ব ও পর" দুটিরই সঙ্গতি বজায় রেখে, সময় রেখায় অবস্থাপন (location) বিশেষ দুরূহ বলে মনে হবেনা। অবস্থাপন সম্ভব হলে অবস্থাপিত ঘটনার দূরতা (distance), সময় রেখার যে কোনো বিন্দু থেকেই হোকনা কেন,—বর্ত্তমান থেকেই হোক আর যীশুখৃষ্টের সময় থেকেই হোক বা অন্য যে কোন বিন্দু থেকেই হোক,—নির্ণয় করা সহজ হয়ে যায়। কোনো ঘটনার ব্যাপ্তি বা স্থায়িত্ব (duration) কতোদিন ছিল, অর্থাৎ কতোখানি সময় কোনো ঘটনার ঘাতে আলোড়িত হয়েছিল তাও ঠিক করে নেওয়া যাবে সময় রেখার তার দৈর্ঘ্য হিসেব করে নিয়ে। এ সম্পর্কে "ইতিহাস পঠন-পাঠন সংশ্লিষ্ট টিচিং এইডসমূহ" এই অধ্যায়ে "রেখা লেখ" এই নামাঙ্কিত আলোচনায় কি ভাবে এই সময় রেখাকে শ্রেণীকক্ষে কাজে লাগানো যেতে পারে সে কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু ঘটনার শুধু অবস্থাপন, দূরতা ও ব্যাপ্তি ঠিক করাতো সন তারিখ বসানোর ব্যাপার। অনেকে সনতারিখ পড়েন, ব্যবহার করেন, মুখস্থ করেন, মুখস্থ বলতে পারেন,—অথচ তাঁরা সময়বোধের বা সময়ের ধারণার ধারও ধারেন না। সময়ের ধারণা সুষ্ঠুভাবে গঠিত না করেই শুধুমাত্র এই সনতারিখের আবৃত্তি এবং উপস্থাপন একান্ত ভাবেই অবাঞ্ছনীয়। কারণ এটি একেবারেই অর্থহীন। সময়ের ক্রমে শুধু একটি সনতারিখ আর তা নিঃসঙ্গভাবে, অন্য কোনো ঘটনার সাথে সম্পর্কহীন অবস্থায় যেমন আমাদের কাছে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় তেমনিই সন তারিখ হীন ঘটনাও ইতিহাস পাঠে একান্ত অকিঞ্চিৎকর। তারিখ সংশ্লিষ্ট থাকবে ঘটনার সাথে আর ঘটনা সংবদ্ধ থাকবে তারিখের সাথে। একটি বাদ দিয়ে অপরটির মূল্য ইতিহাসে বিশেষ নেই। ঘটনারই হোক বা তারিখেরই হোক কোনটিরই একক এবং নিঃসঙ্গ অবস্থিতি অসম্ভব কারণ ইতিহাসের পাতায় এদের সম্পর্ক পারস্পরিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক। এদের যুগ্মঅবস্থিতি এদের পরস্পরের সম্পর্ক বিশ্লেষিত করে, নিরূপিত করে, সময়ের অনুমিতি সহজ করে। আর এই সময়ের অঙ্কে ঘটনার অবস্থান নির্দ্ধারণ করা, এবং সময় ও ঘটনার পরস্পর সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও নিরূপণ করা ইতিহাস পাঠে অবশ্য করণীয়।

শিক্ষার্থীর সময়ের ধারণা গড়ে তুলতে হলে এবং ইতিহাস পাঠে সময়বোধ কাজে লাগাতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার জন্যে যে সব কৌশল অবলম্বন করা

হয়ে থাকে তার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে দু'একটি কথা আলোচনা করে এই প্রসঙ্গ শেষ করা হবে।

শিক্ষার্থীর যখন সময়বোধের উন্মেষ হতে থাকে তখন তাকে সময়ের ধারণা সাধারণ ভাবে কিছু কিছু দেওয়া হয়ে থাকে। সে গল্পে পড়েছে "অনেকদিন আগে এক রাজা রাজত্ব করতো"। এই "অনেকদিন" তার কাছে "অ-নেকদিন"। সে রাজাকে নিয়েই আর রাজার ঘোড়াকে নিয়েই ব্যস্ত। "অনেকদিন" নিয়ে কোনো দিন সে বিশেষ মাথা ঘামায়না। কারণ সময় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা তখনও হয়নি তার। সময়বোধ অস্পষ্ট। সময়বোধ জাগিয়ে তুলতে হ'লে আজ আর কালকের ধারণা তাকে সাহায্য করবে। আজ বর্ত্তমানকে মাঝে রেখে গতকাল ও আগামী কালের, পূর্ব্ব ও পরের, অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা তার স্পষ্ট হয়। এর পর, দিন থেকে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে মাস, মাস থেকে বছর ধরে ক্রমে ক্রমে শতাব্দীতে এগিয়ে যেতে হবে। এই সময় শিক্ষার্থী নিশ্চয় জানবে কতোদিনে এক সপ্তাহ হয়, কতোদিনে এক-মাস হয়, কতো মাসে এক বছর হয়, এবং কতো বছরে একশতাব্দী হয়।

এর পর শিক্ষার্থীর বয়েস যখন এগারো বারো বছর হয়েছে, একএক বছরের চিহ্ন দিয়ে, এগারো বারো বছরের পরিমাণ মত একটি সময় রেখা এঁকে তার সময়ের ধারণা স্পষ্টতর করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তার পর সেই সময় রেখার আকার ক্রমে বাড়িয়ে পঞ্চাশ বছর, একশো বছর, কি দুশো বছর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থেকে কি করে ধারণা করা বা হিসেব করা যায় সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা হয়ে থাকে।

কোনো ক্ষেত্রে বংশতালিকা প্রস্তুত করে (familytree) শিক্ষার্থীর পিতা মাতা, পিতামহ পিতামহী, মাতামহ মাতামহী, প্রপিতামহ প্রপিতামহী, প্রমাতামহ প্রমাতামহীর জন্ম তারিখ দিয়ে শিক্ষার্থীর জন্মতারিখ থেকে এঁরা কতো আগে জন্মেছিলেন তা দেখানো হয়ে থাকে। এতে শিক্ষার্থীর সময় বোধ স্পষ্টতর হয়। সময় "রোল" তৈরী করাও এ সম্পর্কে আরেকটি উৎকৃষ্ট পন্থা। আধহাত চওড়া কাগজের টুকরো জুড়ে জুড়ে সেটিকে লম্বা করে নিতে হয় প্রথমে। সেটি যখন চল্লিশ হাত হয়েছে তখন এক হাত অন্তর সেই কাগজে একটি একটি করে মোটা দাগ দিতে হবে। একহাত অন্তর একটি করে মোটা দাগ এক একটি বছরের প্রতীক। সমস্ত কাগজটি এক দুই থেকে ক্রমিক চল্লিশ পর্য্যন্ত অঙ্কে চিহ্নিত। সেটির এক প্রান্তে লেখা থাকে বর্ত্তমান। ১৯৬২ সাল। চল্লিশ হাত দীর্ঘ এই কাগজের "রোলটি" একটি কাঠিতে জড়িয়ে রাখতে হয়। সেটি তারপর

ধীরে ধীরে খুললে একটির পর একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার ধারণা শিক্ষার্থীর মনে হবে। শেষ পর্য্যন্ত চল্লিশের অঙ্কে এসে শেষ হয়ে গেল গুটানো কাগজের টুকরো। শিক্ষার্থীর বাবার বয়েস চল্লিশ বছর। কতো আগে তার বাবা জন্মেছিলেন সে সম্বন্ধে তার ধারণা একটা হবে। শিক্ষার্থীর যদি বয়েস বারো বছর হয় তবে কাগজের টুকরোটিতে বারো অঙ্কচিহ্ন স্থানটিতে বিশেষ ভাবে কিছু একটা নিশানা দিলে তার জন্মসময় সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে উঠে। সবগুলিই হবে অবশ্য বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে।

তারপর শিক্ষার্থীর বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সময় রেখা এঁকে সময়ের সাথে ঘটনার এবং ঘটনার সাথে স্থানের সম্পর্ক সংযুক্ত করে ইতিহাসের পাতায় অধীত কাহিনীগুলির সময় সম্বন্ধে সঠিক বোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা হয়ে থাকে। সময় রেখায় এখন কেবল মাত্র বর্ত্তমান এই একটি বিন্দুই শুধু না দিয়ে যীশুখৃষ্টের সময়কে আর একটি বিন্দু ধরে প্রচলিত প্রথানুযায়ী সময়ের সাথে ঘটনার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির একটি সময়রেখা করে রেখে দিলেও অনেক কাজ হয়! সময়রেখায় যেন বেশী সনতারিখের ভিড় না হয় সেটা দেখতে হবে। তারিখ-গুলি "yard stone" না হয়ে হবে "mile stone"।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেই এ আলোচনার উপসংহারে আসা যাবে। বিমূর্ত্ত "সময়বোধ"কে মূর্ত্ত করবার জন্যে তাকে "স্থানের বোধে" (space concept-এ) এ রূপান্তরিত করলেই যে বিমূর্ত্ত সময়বোধ, মূর্ত্তহয়ে উঠবে এ দাবী করা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই আমরা মনে করি। তবে অমূর্ত্তকে মূর্ত্ত করবার জন্যে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করাতে কাজটি যে সহজ হয় সেকথা স্বীকার্য্য। জানিনা ভবিষ্যতে সময়ের ধারণা স্পষ্ট করে নেবার এর চেয়ে আরো কোনো ফলপ্রসূ উপায় উদ্ভাবিত কোনো দিন হবে কিনা!

ইতিহাস পঠন-পাঠনে কয়েকটি বাস্তব কথা

ইতিহাস পঠন-পাঠনে নোট দেওয়া ও নোট তৈরীকরা (Note taking and note making) :—

নোট দেওয়া আর নোট তৈরী করার মধ্যে তফাত আছে। নোটদেওয়া হয় তখন যখন শিক্ষক মশাই নোট হাঁকান আর শিক্ষার্থী তা খাতায় টুকে নেয় ; আর নোট তৈরী করাটা হয় তখন যখন শিক্ষার্থী নিজেই তথ্য নির্ব্বাচন করে, তার বিন্যাস সাধন করে নিজের ভাষায় নিজের মত নোট তৈরী করে নেয়। নোট দেওয়া এড়িয়ে চলাটাই শিক্ষকমশায়ের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে। নোট দেওয়াটা যে এড়িয়ে চলতে হবে এ সম্বন্ধে প্রায় মতৈক্য আছে। তবে কোথাও কোথাও কেউ কেউ বলে থাকেন যে যেখানে বাইরের পরীক্ষার প্রস্তুতি আছে, হয়তো ইতিহাসের একটি দুরূহ অধ্যায়,—শিক্ষার্থীর সহজে তা বোধগম্য হওয়া দুষ্কর,—সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নোট দেওয়া চলতে পারে।

নোট দেওয়াটা সাধারণতঃ এড়িয়ে চলা উচিৎ এই জন্যে যে নোটদেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা এবং নির্ব্বাচন ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে পারে না। এতে শিক্ষার্থীর মন "critical" হয়না অথচ ইতিহাস পড়ানোর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলি শিক্ষার্থীদের মনে জাগিয়ে তোলা। নোট দেওয়াটা যাঁরা অনুমোদন করে থাকেন তাঁরা অগত্যা,—উপায়হীন হয়েই এটি অনুমোদন করে থাকেন এবং তাও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সেখানে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে সময় খুব কম, কিংবা ইতিহাসের এমন কোন বিষয় যার সম্বন্ধে পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বিশেষ কিছু বলা নেই, এবং যাও বলা আছে তাও এমনই অবিন্যস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিংবা এমনি দুরূহ যে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেগুলিকে যথাযথভাবে আয়ত্তে আনা কঠিন, আর সময় অল্প, এসব যায়গায় তাঁরা অনুমোদন করেন নোট দেওয়া নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। তাঁরা বেশ জানেন এ ব্যবস্থা নিরুপায় অবস্থার। নোটদেওয়া প্রয়োজন হলেও আসলে সেটা ক্ষতিকর। এরকম অবস্থা ছাড়া নোট দেওয়াটাকে সকলেই বাতিল করে দিতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নোট তৈরী করবে, আর এ কাজে তাদের উৎসাহিত করতে হবে শিক্ষক মশায়কে।

কিন্তু একটা কথা আছে। নোট তৈরী করাটা শিক্ষার্থীর কোন বয়েস আর

কোন শ্রেণী থেকে অনুমোদন করবেন ? সে নোটের প্রকৃতিই বা কেমন হবে ? কতখানি বিষয়বস্তু সে নোটে থাকবে ?

একেবারে নীচের দিকের শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নিজেরা "নোট" তৈরী করতে পারবেনা নিশ্চয়। তাদের স্কুল জীবনের মাঝামাঝি সময় থেকে, অষ্টম মান থেকে, তাদের নিজেদের নোট তৈরী করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু হঠাৎ তারা এ নোট তৈরী করার মত দুরূহ কাজ কি করে করবে ? সেই জন্যে কিছু আগে থেকে তার প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য পুস্তকের লিখিত অংশগুলি ক্রিয়াপদ বাদ দিয়ে সেইগুলি সাজিয়েই তাদের নোট তৈরী করছে। এটি নিশ্চয়ই ভাল জিনিস নয়। শিক্ষার্থীদের তৈরী নোট যথাযথ, স্পষ্ট, স্বল্পআয়তন, এবং সুসংবদ্ধ করতে হলে, শুরু থেকেই তাদের এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে এবং এ শিক্ষা যাতে নিশ্চিৎ-রূপে ফলপ্রসূ হয় তার জন্যে লক্ষ রাখতে হবে। সেই জন্যে কেউ কেউ বলে থাকেন যে প্রথম প্রথম শিক্ষক মশায় শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয়ের শিরোনামা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্তসার শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেবেন তার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের অল্প কথার মধ্যে প্রতি শিরোনামায় কিছু কিছু লিখবে। এমনি করে শুরু করে ধীরে ধীরে তারা বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তথ্যের নির্ব্বাচন ও বিন্যাস অল্পাকারে করতে শিখবে। নোট তৈরী করার শিক্ষা এমনি ভাবেই হবে। নোট খাতার এক পাতায় থাকবে শিক্ষার্থীর লেখা নোট, অপর পাতায় থাকবে শিক্ষার্থীর নিজহাতে করা ছবি, ম্যাপ, স্কেচ, সময় রেখা, চার্ট, ডায়াগ্রাম প্রভৃতি। এতে পাঠ্য বিষয় বস্তুর ধারণা খুব স্পষ্ট হবে। যে সব ছেলের আঁকার হাত নেই তাদের এ অক্ষমতার জন্যে তিরস্কার করা ঠিক নয়। তিরস্কার না করে তাদের উৎসাহ দেওয়াই ভাল। অনেক সময় তারা ভাল আঁকতে পারবেনা জেনেই উৎসাহ দিতে হবে।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে শিক্ষার্থীরা দিনের পাঠ থেকে মাসের পাঠের, মাসের পাঠথেকে সারা বছরের পাঠের নোট নিতে শিখবে। একাজে শিক্ষক মশায়ের সাহায্য ও নির্দ্দেশ সব সময়েই প্রয়োজন হবে। কেথায় কোন বইতে পাঠ অন্তর্গত বিষয়টির বা কোন বিশেষ বিষয়ের সম্বন্ধে ভালকরে লেখা আছে সেগুলি শিক্ষক মশায় ছাত্রকে বলে দেবেন। শিক্ষক মশায়ের কাছে এই সন্ধান পেয়ে শিক্ষার্থী সেগুলি পড়ে নিয়ে নোট নিয়ে নেবে।

শিক্ষার্থীদের কৃত নোটগুলি পড়া ও শোধন করে দেওয়া খুবই শ্রমসাধ্য। কিন্তু এটি পরিহার করা কোন ক্রমেই উচিৎ নয়।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে শ্রেণীকক্ষে যখন পাঠের আলোচনা চলছে তখন যেন শিক্ষার্থী সেই আলোচনার অতীত সূত্র নিয়ে মাথা না ঘামায়। এতে শ্রেণী কক্ষের আলোচনা এবং পাঠ ঠিকমত সে অনুধাবন করতে পারেনা। পাঠে মনঃসংযোগ তার হয়না। পাঁচমিনিট আগে যে আলোচনা হয়ে গেছে তার নোট গুছিয়ে টোকার জন্যে সে হয়তো যখন মাথা ঘামাচ্ছে তখন পাঠ ও আলোচনা ক্রমশই এগিয়ে চলছে। এতে তার ক্ষতিই হয় বেশী। একসাথে শুনে বুঝা, এবং বুঝে নোট নেওয়া খুব সহজ নয়। এরকম নোট নেওয়া কলেজের ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, অবশ্য যদি তারা স্কুলজীবন থেকে শিক্ষকমশায়ের নির্দেশ মত নোট তৈরী করতে অভ্যস্ত থাকে।

এই নোট তৈরীর ব্যাপারে আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়। সেটি হচ্ছে "পাঠ্যপুস্তকে আধৃত বিষয়বস্তুর নোট কি শিক্ষার্থীরা নিজেরা করবে"?

বাস্তবিক, শিক্ষার্থী কি পাঠ্যপুস্তক থেকে নোট নেবে? পাঠ্যপুস্তকে যা আছে তার সংক্ষিপ্ত সারই কি ছাত্রদের তৈরী নোট বলে অনুমোদন করবেন? এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে ছাত্রদের তৈরী 'নোট' পাঠ্য-পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সার না হয়ে তার"supplement" হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। নোট তৈরীর ব্যাপারে লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে বিষয় বস্তুর নির্ব্বাচন এবং সেগুলির যথাযথ বিন্যাস, সেগুলি বিচার বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগিয়ে না দিতে পারা যায়; যদি তারা বিষয় বস্তুগুলি সুসংহত করতে না শেখে, মনের ভাব যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে না পারে, যদি শিক্ষার্থীর লেখা আগড়ুম বাগড়ুম পর্য্যায়ের হয়, তাহলে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়না কি?

নোট তৈরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ও কোনো নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। সেটি নির্ভর করে শিক্ষক মশায়ের উপর।

শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরীক্ষা :—

শ্রেণীতে পঠন-পাঠন চলে পাঠ্যক্রমকে কেন্দ্র করে। এই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয় বস্তুগুলি শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করেছে এ জানবার জন্যে শিক্ষকমশায় মাঝে মাঝে তাদের জ্ঞানের পরীক্ষা করবেন। এই পরীক্ষার প্রয়োজন একাধিক কারণে আছে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে যতটুকু শ্রেণীতে পড়ানো হয়েছে তা শিক্ষার্থী আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা জানা যাবে। কোনো শিক্ষার্থী যদি পিছনে থাকে তাকেও চিহ্নিত করা যাবে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান পাকা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোল কিনা তাও বুঝতে পারা যাবে। শিক্ষকমশায় বুঝতে

পারবেন তিনি যা পড়িয়েছেন তাতে কতদূর সাফল্য অর্জন তিনি করেছেন।

এই পরীক্ষা করবার ধরন শিক্ষার্থীদের বয়েস ভেদে বা মনীষার বিকাশের তারতম্য ভেদে নানা প্রকারের হতে পারে। কোনোটি অধিকতর অল্প বয়সের এবং নীচের শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে আবার কতকগুলি অধিকতর উচ্চ শ্রেনীর এবং বেশী বয়সের শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রজোজ্য হবে। এই ধরনের পরীক্ষা অল্পক্ষণ স্থায়ী হতে পারে আবার দীর্ঘক্ষণ স্থায়ীও হতে পারে। মৌখিক হতে পারে, লিখিতও হতে পারে। অল্পক্ষণ স্থায়ী পরীক্ষা মৌখিক ও হতে পারে আবার লিখিতও হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী পরীক্ষা লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মৌখিক পরীক্ষা অবশ্যই অল্পক্ষণ স্থায়ী। ছোটো ছেলেদের পক্ষে এর এক বিশিষ্ট আবেদন ও মূল্য আছে। পরীক্ষার প্রশ্নগুলি সুনির্বাচিত, সুপরিকল্পিত হওয়া চাই। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মনীষা অনুযায়ী এই প্রশ্নগুলি করা যেতে পারে। একই প্রশ্ন বা একই ধরনের প্রশ্ন সকলকে জিজ্ঞাসা না করে যে যেমন তাকে তেমন প্রশ্ন করাই যুক্তিযুক্ত। প্রশ্নগুলি সাজানো এবং জিজ্ঞাসা করার কৌশল শিক্ষক-মশায়ের নিজের উপর নির্ভর করবে। তাঁকে অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে যে অনগ্রসর, অলস প্রকৃতির বা লাজুক স্বভাবের শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের হাত যেন এড়িয়ে না যেতে পারে। প্রশ্ন কাকে কখন করা হবে শিক্ষার্থীরা যেন অনুমান করেও বুঝতে না পারে। প্রশ্ন যখন যাকে খুসি তাকে জিজ্ঞাসা করার ব্যবস্থা থাকবে। শ্রেণীকক্ষে সব শিক্ষার্থী যেন সতর্ক থাকে, এবং তারা যেন একথা মনে করে, "পরের প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে"। এই ধরনের প্রশ্নের আর একটি সুবিধে এই যে শিক্ষকমশায় যেটি চান, একটির জায়গায় দুটি কি তিনটি প্রশ্ন করেও সেটি আদায় করে নিতে পারেন; এবং তাতে প্রথম উত্তরের উপর আরো কিছু যোগ করা বা সেটিকেই আরো ভালো ভাবে গুছিয়ে বলার, বা আরও উন্নত ধরনের উত্তর আদায় করার অবকাশ এখানে আছে।

অল্পক্ষণ স্থায়ী লিখিত প্রশ্নের (পরীক্ষার) সুবিধেও আছে অসুবিধেও আছে। সুবিধে এই যে শিক্ষার্থীর এতে লেখবার অভ্যাস হয়। বানান ভুল সংশোধিত হয়। লিখিত প্রশ্ন থেকে যেটি চাওয়া হয়েছে সেটি ঠিক করে নিতে অভ্যস্ত হয়। অসুবিধে এই এধরনের প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করবার সময় করে নেওয়াটা। শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা যে সব ক্ষেত্রে বেশী সেখানে শিক্ষকমশায়কে বেশ অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর অতো

খাতা পরীক্ষা করবার সময় কোথা? শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর জন্য তাঁর প্রস্তুতি আছে, শ্রেণীতে পঠন-পাঠন আছে। আর এই ধরনের পরীক্ষার খাতা দেখাতে সময় দোবার চেয়ে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যে পাঠপরিকল্পনায় ও প্রস্তুতিতে বেশী সময় দিলে তা অধিকতর কার্য্যকরী হবে। কারণ শিক্ষার্থীদের খাতার সংশোধিত ভুল খাতাতেই থেকে যায়। শিক্ষার্থী খাতা পেয়েই নিজের নম্বরটা (বা মূল্যায়নের মানটা) সর্ব্বপ্রথমে দেখে, তারপর তার পাশের ছেলেটির খাতায় একবার হয়তো আড়চোখে তাকায় তারপর খাতা মুড়ে রেখে দেয়। যারা একটু ভাল ছেলে তাদের বড়জোর জানতে ইচ্ছে করে কে সবথেকে বেশী নম্বর পেয়েছে। তাই সময় যাতে এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষকমশায়কে বেশী দিতে না হয় সেই জন্যে তিনি এমন প্রশ্নের নির্ব্বাচন করবেন যার উত্তর একটির বেশী হবার অবকাশ থাকবে না। প্রশ্ন যেন রচনামূলক উত্তর দেবার মত না হয়। "Objective test" আমরা এই ব্যাপারে প্রয়োগ করতে পারি। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরের সমাধান হাতে পেলে শ্রেণীর ছাত্ররাই নিজেরা উত্তর মিলিয়ে নিতে পারে। এতে খাতা দেখা সহজ হবে।

দীর্ঘক্ষণস্থায়ী লিখিত পরীক্ষা সাধারণতঃ আমাদের দেশের Terminal ও Annual পরীক্ষাগুলি। কোনো একটি "term"-এর শেষে বা বৎসরের শেষে এরূপ পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। কোনো "term"-এ কিংবা সারাবৎসরের জন্যে যেগুলি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলি কোন্ ছাত্র কতটুকু আয়ত্ত করেছে তার হিসেব এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যায়। ছোট ছেলে মেয়েরা যারা নীচের শ্রেণীতে পড়ে তাদের বেলায় রচনা মূলক পরীক্ষা পরিহার করতে হবে। কিন্তু যতদিন আমাদের "Public examination"-এর ধারা এমনি থাকবে ততদিন শিক্ষার্থী যতো উপরের শ্রেণীতে উঠবে এবং যতই Public examination-এর সময় কাছে আসবে ততো ঐ পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন হয় সেই ধরনের প্রশ্নের সাথে যথেষ্ট পরিচয় ঘটানের জন্যে স্কুলের পরীক্ষা গুলিতেও সেই ধরনের প্রশ্ন দেওয়ার প্রয়োজন হবে। কারণ এটাতো অস্বীকার করবার নয় যে বাইরের পরীক্ষা আমাদের স্কুলের পড়াশোনা আর ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষা করবার পদ্ধতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এটাতো ঠিক কথা যে প্রত্যেক স্কুলই চেষ্টা করে যতো বেশীসংখ্যক ছাত্র স্কুল থেকে বাইরের পরীক্ষায় "পাস" করানো যেতে পারে তার জন্যে।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীর লিখিত কাজ :—

শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের জ্ঞান শ্রেণী কক্ষে নানা ভাবে পরীক্ষা করা ছাড়া তাদের জ্ঞানের দ্রুত ব্যাপ্তি এবং অর্জ্জিত জ্ঞানের ভিত্তি পাকা বনেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নানা লিখিত কাজ দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এসব কাজ শ্রেণী কক্ষের সীমিত সময়ের মধ্যে সব সময় করানো সম্ভব নাও হতে পারে তাই অনেক সময় সেগুলি গৃহকাজের রূপ নেয়। গৃহকাজ শিক্ষার্থীদের আদৌ দেওয়া যুক্তিযুক্ত কি না এবং দেওয়া হলেও তার পরিমাণ কতটুকু হবে এ নিয়ে যদিও নানা রকমের মত পার্থক্য ও গবেষণার অবকাশ আছে তবুও অনুরূপ কাজের উপকারিতা অধিক সংখ্যক অভিজ্ঞ ইতিহাস-শিক্ষক স্বীকার করে থাকেন। কারণ একদিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে ইতিহাস তো একটি 'আর্ট'—অধীত বিষয় বস্তুর সুষ্ঠু প্রকাশ ও বিন্যাস সাধন এর একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাছাড়া শিক্ষার্থী ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে নিজের ভাবকে ভাষার মাধ্যমে সুষ্ঠু ভাবে প্রকাশ করতে শেখে। ইতিহাস পাঠের একটি অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য এটি। মনের ভাব প্রকাশ সাধারণতঃ লেখার মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই লিখিত কাজের প্রয়োজন আছে ইতিহাস পঠন-পাঠনে। পরিপাটি করে রচনা আবার সব শিক্ষার্থীর হাতে আসেনা একথাও যেমন ঠিক তেমনি লেখা ছাড়াও মনের ভাব প্রকাশ করবার যে অন্য মাধ্যম আছে সে কথাও ঠিক। তা না হলে চিত্রের এবং ভাস্কর্য্যের সৃষ্টি হোতোনা। ইতিহাসের কথা যা শেখা যায় তা নানা ধরনের চিত্র, লেখ, চিত্র-লেখ, সময় রেখা প্রভৃতির প্রস্তুতির মাধ্যমে, ম্যাপ, চার্ট, ডায়াগ্রাম প্রভৃতি আঁকার আশ্রয়েও প্রকাশ করা যেতে পারে। তাই এগুলিও যে লিখিত কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

অনেকেই মনে করেন যে এই লেখার কাজ করতে শেখানো আমরা আমাদের স্কুলগুলির ষষ্ঠ মান (১১+) থেকেই ব্যাপক ভাবে প্রবর্ত্তন করতে পারি। কিন্তু এই লেখার কাজটিকেও শিক্ষার্থীদের স্কুলজীবনে. (লিখিত কাজের বিষয় বস্তুরও তথ্যের সমাবেশ, প্রকৃতি ও রচনা-শৈলী প্রভৃতি নানা বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে) দুই ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। একটি ভাগ হবে ষষ্ঠমান থেকে অষ্টমমান পর্য্যন্ত আর একটি নবম থেকে দশম বা একাদশ মান পর্য্যন্ত। এতে সুবিধে হবে এই যে নবম মান থেকে বহুমুখী পাঠ্যতালিকা প্রবর্ত্তিত তাই অনেক শিক্ষার্থী নবম মান থেকে ইতিহাস ছেড়ে দেবে এবং উচ্চ ধরনের লেখার কাজ তাদের করতে হবেনা।

১১—১৪ বছর বয়েসের বিদ্যার্থীদের লেখার কাজের প্রয়োজন কি, বিশেষ করে তাদের মধ্যে সকলেই যখন শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাস পড়বেনা ? এ প্রশ্নও কেউ কেউ করেন। তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে তাহ'লে ইতিহাস এই প্রারম্ভিক স্তরে পড়ারই বা কি প্রয়োজন, সবাইতো আর শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাস পড়বেনা ? বিদ্যার্থী যে বিষয় শেষ পর্য্যন্ত পড়বে সেইটিই কেবল গোড়া থেকে তার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, অন্য কোনো বিষয় থাকবেনা। এ যুক্তি ঠিক নয়। এতে সাধারণ শিক্ষার হানি হবে। আর ১৪+বছর বয়েস না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তত ঠিক হচ্ছে না যে কি কি বিষয় শিক্ষার্থী পড়বে। তাই তার আগেই কোনো বিষয়কে বাদ দেবার যুক্তি ও গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া স্কুল পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ আজ আর নেই। ইতিহাস ১৪+বছর বয়েসের শিক্ষার্থীকে পড়তে হবে। ইতিহাস পড়া শুধু তথ্য আহরণেই শেষ নয়, লেখারও প্রয়োজন ; লেখাতো পড়ার অর্দ্ধেক। সুসংবদ্ধ ভাবে জানা জিনিষ লেখায় প্রকাশ হবে। অতীত কালের যে সব অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ইতিহাস তা সুষ্ঠুভাবে আহরণ করবে এবং ইতিহাস পঠন-পাঠনে সেগুলি সংযুক্ত হবে শিক্ষার্থীর নিজ অভিজ্ঞতার সাথে। যা শিখবো তা লিখবো ; যা শিখবো তা যেন সুসংহত হয়, যা লিখবো তা যেন আগড়ুম বাগড়ুম না হয়। লেখাটা নিজের ভাব প্রকাশের একটি সুষ্ঠু এবং প্রকৃষ্ট পন্থা। লেখার মধ্যে দিয়েই আসে বিচার, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা। ইতিহাসের পাতায় অতীত বিমূর্ত্ত। কিশোরের কল্পনাশ্রয়ী মন এই প্রারম্ভিক স্তরে তার মনের খোরাক পায় এখানে। তার কল্পনার সার্থক রূপায়ণের অবসর ও এখানে আছে। তাছাড়া ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে আশ্রয় করে তার মন পুষ্পিত হয়ে উঠে। সেই কাহিনীগুলির চারপাশে থাকে চরিত্র বিশ্লেষণ, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের বাস্তববোধ। তারা সকলে মিলে অতীতকে অন্ধকারের আবর্ত্ত থেকে আলোয় নিয়ে আসে। সেই জন্যে ইতিহাসের গোপন রহস্য বর্ণনাশ্রয়ী। লেখার মাধ্যমে সে জিনিস শিক্ষার্থীর অধিকারে আসে।

তাই সব দিক বিচার করে একথা বলা যেতে পারে যে ইতিহাস পঠন-পাঠনের সময় লেখার কাজ অতি আবশ্যকীয়। শিক্ষার্থীদের লিখতে দিতে হবে। আর সে কাজ শিক্ষার্থীর ১১ বছোর বয়েস থেকে শুরু করতে হবে। তার আগে নিশ্চয় নয়। এখন কথা হচ্ছে যে প্রারম্ভিক স্তরেই বা কি রকম কাজ দেওয়া হবে আর উচ্চস্তরেই বা সে কাজের প্রকৃতি কেমন

হবে? কতটুকু সময়ই বা আমরা তার জন্যে দিতে পারবো? সে সমস্ত লেখার কাজ দেখাই বা কেমন করে হবে? একথা অবশ্য বলা বাহুল্য যে প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার্থীদের লেখার কাজ অপেক্ষাকৃত কম হবে আর উচ্চস্তরের বিদ্যার্থীদের অপেক্ষাকৃত বেশী।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে লেখার যে কাজ তার গুরুত্ব ও আধিক্য-অনাধিক্য এবং সময় হিসেব করে তার প্রকৃতি কি হবে সেটি বিচার করবার আগে আমরা আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করে নেবো। যদিও এই অধ্যায়ের শুরুতেই সে প্রশ্নটি প্রসঙ্গক্রমে এসেছে কিন্তু তার যথাযথ মীমাংসার প্রয়োজন আছে। শ্রেণীকক্ষে পড়াতে গিয়ে প্রায়ই চোখে পড়ে যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি শ্রেণী আছে যারা বেশ লিখতে পারে। তাদের ভাষা, কল্পনা, ভাব বেশ স্পষ্ট। প্রকাশ ভঙ্গীও সুষ্ঠু। আবার আর একশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দেখা যায় যাদের লেখা ভালো আসে না। যাদের লেখা ভালো আসে তাদের লিখতে দেওয়া ভাল। আর যাদের লেখা আসে না, তর্জ্জন গর্জ্জনেও তাদের লেখা আসবে না। তাদের কম লেখা দিয়ে বেশীকরে ম্যাপ, 'চার্ট' লেখ-ডায়াগ্রাম কি অনুরূপ হাতের কাজ দেওয়ার সার্থকতা আছে। তাতে সুফল পওয়া যাবে। এটি অবশ্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সাধারণতঃ প্রারম্ভিক স্তরে। উচ্চস্তরে শেষোক্ত শ্রেণীর বিদ্যার্থী অন্য stream-এ চলে যায়।

ইতিহাস পঠন পাঠনে লেখার কাজে কতটুকু সময় দেবো? এটিই প্রথমে আলোচনা করা যাক। স্কুলের টাইম টেবলে কতো পিরিয়ড সপ্তাহে ইতিহাস পঠন-পাঠনের জন্যে একটি শ্রেণীতে পান? যা পান তার একতৃতীয়াংশ এই লেখার কাজে দিন ১৪—১৬।১৭ বছর বয়েসের শিক্ষার্থীদের জন্যে। ১৪—১৫ বা ১৪—১৬ বছর বয়েসের শিক্ষার্থীদের লেখার কাজের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ম্যাপ, চার্ট, সময়রেখা, ডায়াগ্রাম ও করান। ১৬—১৭ বছর বয়েসের ছেলেদের লেখান বেশী। সাধারণতঃ ইতিহাস ক্লাস একটি শ্রেণীতে সপ্তাহে তিনটি পান। দুটিতে পড়ান। আর একটিতে লেখার কাজ দিন। ১১—১৪ বছর বয়েসের ছেলেদের ও দুদিন পড়ান আর একদিন লেখা ও ম্যাপ চার্ট ডায়াগ্রাম প্রভৃতি কাজের মধ্যে ভাগ করে নিন। এর খুঁটিনাটি ব্যাপার অবশ্য ইতিহাস-শিক্ষক সবদিক চিন্তা করে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে নেবেন।

এর পর লেখার কাজের প্রকৃতি কেমন হবে তার আলোচনা। ম্যাপ চার্ট ডায়াগ্রাম প্রভৃতি শিক্ষক মশায় ঠিক করে দেবেন। নানা ধরনের ম্যাপ নানা ভাবে আঁকতে দিতে পারেন। আর চার্ট ডায়াগ্রাম প্রভৃতির ব্যাপারে

তো নানা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পাঠে এগিয়ে যাওয়া যায়। এগুলির প্রকৃতি ঠিক করা বিশেষ দুরূহও নয় আর এতে অসুবিধেও বিশেষ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে যে লেখার কাজের প্রকৃতি কেমন হবে? নবম মান থেকে দশম বা একাদশ মান পর্য্যন্ত এ কাজ রচনামূলক, ও তথ্যবহুল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর ষষ্ঠমান থেকে অষ্টমান পর্য্যন্ত লেখার কাজ রচনামূলক তো হবেই না, যদি কিছু বিধিবহির্ভূত হয় তাতে ক্ষতি কি? এই স্তরে অতীতের কোনো ঘটনার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর যা অনুভূতি, তার যা প্রতিক্রিয়া তারই প্রকাশ থাকনা তার লেখাতে। নাই বা থাকলো সেখানে বিধি আর নিষেধের তর্জ্জনী তুলে শিক্ষার্থীর অনুভূতি আর প্রতিক্রিয়াকে সীমিত সঙ্কুচিত করা? থাকলোই বা সে লেখার মধ্যে কিছু কল্পনার রঙ্। নাইবা হোলো ইতিহাসের নিখুঁত তথ্যের সমাবেশ আর তাদের সীমিত বিশ্লেষণ। লিখুক না সে মোগল বাদশাদের জাঁকজমক আর আড়ম্বর-ময় জীবনের কথা। নাই বা সে চিন্তা করলো এ জাঁকজমক এলো কোথা থেকে। রাণা প্রতাপের এবং শিবাজীর বীরত্ব গাথার গল্পকাহিনী সে লিখুকনা,—নাইবা লিখলো মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ কি? এই স্তরে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জীবনী, কোনো যুদ্ধের বর্ণনা,—এই সব জিনিসকে অবলম্বন করে,—গল্প, কবিতা, বিবরণ প্রভৃতিও শিক্ষার্থী লিখতে পারে।

মাধ্যমিক স্কুলের নিম্নস্তরে শিক্ষার্থীদের লেখা যেমন হবে কল্পনাশ্রয়ী উচ্চস্তরে কিন্তু সেটি হবে রচনামুলক, সত্যাশ্রয়ী, তথ্যমূলক, বাস্তবধর্ম্মী। বিচার বিশ্লেষণে এবং যুক্তির বিস্তারে, রচনার দৃপ্ত ভঙ্গিতে এবং সুকৌশলে তা হবে ঐতিহাসিক মনোভাবাপন্ন, ও নিরপেক্ষ। ঘটনার কার্য্যকারণ বিশ্লেষণে থাকবে উদার মনোভাব। প্রয়োজনীয় তথ্যের নির্ব্বাচনে এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্যের বর্জ্জনে সত্য সিদ্ধান্তকে বেছে নেবার শক্তির পরিচয়ে সে রচনা হবে দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। তথ্যের বিন্যাসে ও বক্তব্যের প্রকাশে তা হবে সুসংবদ্ধ ও সুপরিচ্ছন্ন। আবছা ধোঁয়াটে ধারণা কোথাও থাকবে না। আর এধরনের রচনামূলক লেখার শুরু হবে নবম দশম মান থেকে। কারণ এর জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন।

এই ধরনের রচনা লেখানোর মধ্যে যে অনেক অসুবিধে আছে তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। প্রথম অসুবিধে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বিষয়-বস্তুর সামান্যীকরণে (generalisation-এ) অভ্যস্ত। এ সম্বন্ধে ইতিহাস শিক্ষককে অবহিত হতে হবে। কোনো সিদ্ধান্তের আগে যে স্বপক্ষ যুক্তির প্রমাণ হিসেবে তথ্যগুলির বিন্যাস সাধন প্রথমে করতে হয় আর তার পর সিদ্ধান্তে আসতে

হয় এ ধারণা শিক্ষার্থীকে দিতে হবে। অনেক সময় নিরপেক্ষ যুক্তি ছেড়ে দিয়ে যে কোনো একটি পক্ষে ঝুঁকে আবেগ আর অনুভূতির প্রবাহে ভেসে গিয়ে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসের ঘটনাকে বিচার করার প্রবণতা দেখা যায়। লেখা তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করবার জন্যে বিশেষ বিশেষ বইয়ের বিশেষ বিশেষ অধ্যায় পড়তে বলে দিলে অনেক সময় বই থেকে টোকার চেষ্টা থাকে। এ সব অসুবিধে বা বাধাগুলি ইতিহাসের শিক্ষকের সতর্কদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিলক্ষিত হলে তাঁর নির্দ্দেশে ও তত্ত্বাবধানে বিদূরিত হতে বেশী বিলম্ব হবে না। তখন ইতিহাস পঠন-পাঠনে লেখার কাজ প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।

শিক্ষার্থীদের লিখিত কাজের ভ্রম সংশোধন ও মূল্যায়ন :—

দিনের পাঠ ফলপ্রসূ করবার জন্যে শিক্ষক মশায় নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। অবস্থানুযায়ী তাঁর পদ্ধতির রকমফের করে, নানা "teaching-aids"-এর সাহায্য নিয়ে, নিজের প্রস্তুতি সন্তোষজনক করে, নানাভাবে বিষয়-বস্তুর উপস্থাপন চিত্তাকর্ষক করে, বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়ে। এগুলি দিনের পঠনপাঠনের আবশ্যকীয় অঙ্গ। কিন্তু তিনি দৈনন্দিন পঠনপাঠনে কতোখানি কৃতকার্য্য হচ্ছেন, তাঁর দৈনন্দিন পাঠ অরণ্যে রোদন হচ্ছে কিনা, তাঁর পাঠদান পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করতে হবে কিনা, কিংবা কতো সংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁকে ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারছে এসব তাঁর জানবার প্রয়োজন আছে বলেই তাঁকে শিক্ষার্থীদের অধীত বিষয়ে জ্ঞান পরীক্ষা মাঝে মাঝে করে দেখতে হয়। বলা বাহুল্য, এ পরীক্ষা দু তরফেরই। শিক্ষক মশায়ের এবং শিক্ষার্থীদের। শিক্ষক মশায়ের বেলায় এটি আত্মপরীক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে জ্ঞান পরীক্ষা। শিক্ষার্থীদের বেলায় এটি বিষয় জ্ঞানের পরীক্ষা ছাড়াও তাদের জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় করবার একটি প্রক্রিয়া বলেও গণ্য হয়ে থাকে। এই পরীক্ষা নানা ধরনের হতে পারে। লিখিতও হতে পারে এ পরীক্ষা, আবার মৌখিকও হতে পারে। বাৎসরিক, অর্দ্ধবাৎসরিক প্রভৃতি এই পর্য্যায়ের পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। বার্ষিক বা অর্দ্ধবার্ষিক প্রভৃতি পরীক্ষার খাতা আমাদের দেখতে হয়। তাহলে বৎসরের মধ্যে দুবার কোনো কোনো স্কুলে তিনবার ছাড়া আবার মাঝে মাঝে বিষয় জ্ঞান পরীক্ষা করার (যেটাকে অনেক সময়ে সাপ্তাহিক বিষয়জ্ঞান পরীক্ষা বলা হয়ে থাকে) খাতা দেখা আছে। কিন্তু এ সব ছাড়াও শিক্ষার্থীদের অন্য ধরনের লিখিত কাজও (ইতিহাস পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীর লিখিত কাজ এই প্রসঙ্গে বিবৃত) তো শিক্ষার্থীদের দিতে হবে! সমস্যা হচ্ছে এসব লিখিত কাজ দেখবার সময় শিক্ষক মশায় পাবেন কোথা থেকে?

শিক্ষার্থীদের এই লিখিত কাজ দেখবার সময়ের প্রশ্ন একটি অতি জটিল এবং বিরক্তিকর বস্তু। আমাদের স্কুলগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাসের শিক্ষক দুজন। স্কুলে যদি গড়ে ৪০০ ছাত্রছাত্রী থাকে তাহলে প্রত্যেককে ২০০ খানি করে খাতার লিখিত কাজ দেখতে হবে। অবশ্য নবম মান থেকে বিভিন্ন stream-এ ছাত্র সংখ্যা ভাগ হয়ে গেলে এ সংখ্যা কিছু কমে যাবে। কিন্তু অন্য বিষয় যেমন সমাজ বিজ্ঞান ইতিহাস শিক্ষকের ঘাড়ে এসে পড়বে। আবার অনুসন্ধানে জানা যাবে যে ইতিহাস-শিক্ষককে ইতিহাস ছাড়াও অন্য দু-একটি বিষয়ের ভারও নিতে হয়। মোটের উপর এ বড় কম কথা নয়। তাছাড়া শুধু এই লিখিত কাজ দেখাই নয়। এর উপর শিক্ষক মশায়ের প্রস্তুত হবার প্রয়োজন আছে তা নাহলে তাঁকে অপ্রস্তুত হতে হবে। ছাত্রদের কাছে না হলেও তাঁর নিজের কাছে। প্রস্তুতি নাহলে তিনি যথাযথ ভাবে তাঁর কাজ সমাধা করতে পারবেন না। তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হবেন। আর তাঁর নিজের প্রস্তুতি মানে অনেক। নিজে পড়া, পরিকল্পনা করা, পাঠটীকা রচনা করা, পদ্ধতি ঠিক করে নেওয়া, "teaching aids"-এর ব্যবস্থা করে নেওয়া, এমনিতরো নানা জিনিস। শিক্ষক মশায় সময় পাবেন কোথা থেকে? যা সময় তাঁর হাতে আছে বা থাকে, কিসে তিনি সেটি দেবেন? শিক্ষার্থীদের লিখিত কাজ দেখায় না তাঁর নিজের প্রস্তুতিতে।

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে এ প্রশ্নটি জটিল। সবদিক যথাযথ পর্য্যালোচনা করে এর উত্তর দেওয়া শক্ত। কেতাবী বাঁধাগৎ আউড়ে অবশ্য এর উত্তর দেওয়া যায় যেমন, "দুটিই অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগে, কার্য্য-ক্ষেত্রে কোনোটির জন্যেই সময় পাওয়া দুরূহ। কিন্তু সময় আমাদের করে নিতেই হবে" ইত্যাদি। এতে সমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা সে আরো জটিল হয়ে যাবে। তাই কেতাবী আদব কায়দা ছেড়ে নিছক আমাদের বাস্তব অভি-জ্ঞতার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এর উত্তর খুঁজতে হবে। একটু খুঁজলেই আমরা দেখতে পাবো যে এর দু রকমের উত্তর এসে যাবে। যাঁরা নতুন শিক্ষক তাঁরা বলবেন শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্যে বেশী সময় দেওয়া প্রয়োজন। এ উত্তর অবশ্য নতুন শিক্ষকদের কাছ থেকে খুবই স্বাভাবিক। আবার যাঁরা এই পেশায় পুরানো তাঁরা বলবেন শিক্ষক মশায়ের প্রস্তুতি তো আছেই; শিক্ষার্থীদের লিখিত কাজ দেখার জন্যে সময় না দিলে কি করে কি হবে? পুরানো শিক্ষক মশায়দের এই উক্তির তাৎপর্য্য আছে। তাঁরা অনেকদিন এই পেশায় অভ্যস্ত। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁদের মোটামুটি দখল হয়ে আছে। কেমন করে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে তা তাঁদের আয়ত্তে এসে গেছে অনেকখানি, কারণ

তাঁরা একাজ অনেক দিন করে আসছেন। পাঠটীকাগুলি তাঁদের প্রায় সব হয়ে আছে।

কিন্তু এ কথা শুনে প্রধান শিক্ষক মশায় হয় তো পুরানো শিক্ষক মশায়দের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝে ফেলবেন এবং বলবেন "সেকি! শিক্ষক মশায়ের নিত্য-নতুন প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে বৈকি। সেই পুরানো 'ঘোড়বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি ঘোড়' ! নতুন জ্ঞান আহরণ করুন, সংকলন করুন, পদ্ধতির যে নব রূপায়ণ হচ্ছে, শিক্ষণের যে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধন হচ্ছে সেগুলি পড়ুন, শ্রেণী-কক্ষে হাতে কলমে তার সার্থক প্রয়োগ করুন। তা নাহলে কি করে হবে" নতুন শিক্ষকের কথা শুনে বলবেন "শিক্ষক মশায়ের প্রস্তুতিরও যেমন প্রয়োজন আছে, শিক্ষার্থীদের লিখিত কাজ দেখারও তেমনি প্রয়োজন আছে। তা নাহলে আপনি কি করে বুঝবেন আপনার পড়ানো কতোখানি কার্য্যকরী হচ্ছে? কি করে জানবেন আপনার ছাত্ররা কি কচ্ছে না কচ্ছে। তাদের ব্যাকরণ ভুল, বানান ভুল, তথ্যের ভুল, তথ্য বিন্যাসের ভুল, তথ্যপ্রকাশ করার ভঙ্গির ভুল, এক কথা বার বার বলার ভুল, তথ্য নির্ব্বাচন করার ভুল, অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করার ভুল,—এসব ভুল যদি সংশোধন না করে দেন, তো কি করে কি হবে? আপনাকে যেমন করেই হোক সময় করে নিতে হবে। এছুটিই চাই।" খুবই স্বাভাবিক যে আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে মত পার্থক্য আছে এবং থাকবে। সেইজন্যে প্রশ্নটির গভীরে গিয়ে এর মূল তথ্য ও তত্ত্বটিকে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। প্রথমে দেখা যাক ছাত্ররা তাদের লিখিত কাজ সংশোধন করার থেকে কি উপকার পায়? সংশোধিত খাতা ফেরৎ দেবার সময় লক্ষ হয়তো করেছেন যে শিক্ষার্থী খাতা হাতে পেয়ে কতো নম্বর পেয়েছে সে দেখলো আর তা দেখে মুড়ে ফেলেই হয়তো আড়চোখে একবার দেখে নিলো পাশের ছেলেটির খাতা (যদি অবশ্য সে ছেলেটি ইতিমধ্যে খাতা মুড়ে না ফেলে থাকে), সে কতো পেয়েছে। ব্যাস্। যারা একটু ভাল ছেলে তার মনটা খানিকটা উৎসুক হ'ল সব থেকে বেশী নম্বর কে পেয়েছে জানবার জন্যে। প্রধান শিক্ষক-মশায়ের ইচ্ছামত বানান ভুল ইত্যাদি ভুল সংশোধন করার যে ফিরিস্তি তিনি দিলেন তা কঠোর পরিশ্রমে সংশোধন করবার পর সেগুলি খাতার মধ্যেই রয়ে গেল। হয়তো জোর করে খাতাগুলো পড়ালেন, বানান ভুল লেখালেন। কিন্তু শ্রেণী-কক্ষে সে সময়ই বা আপনার কৈ? এগুলি নিখুঁত ভাবে সব করাতে গেলে আরও একদিন নতুন পড়া ক্লাসে হবে না। পারবেন সে সময় দিতে? অবশ্য বানান ভুল, ব্যাকরণ ভুল,—এগুলি সংশোধন হবে, আগে থেকে এ

ভুলগুলি সম্বন্ধে একটু সাবধানতা নিলে। তাছাড়া সাহিত্য বা ভাষার ক্লাসে এ ধরনের ভুলগুলির সংশোধন হবার অবকাশ যথেষ্ট আছে। বানান ভুল ব্যাকরণ ভুল ছাড়া. প্রকাশ ভঙ্গির ভুল, বিষয়বস্তু সংযোজনের সংকলনের ভুল, অতিশয়োক্তি প্রভৃতির যে সব ভুল সেগুলির সংশোধন সময় সাপেক্ষ। এগুলি অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। এগুলি ক্রমে ক্রমে ঠিক হয়ে যায়।

তাহলে লিখিত কাজ দেখে দেবার কি কিছুই প্রয়োজন নেই? লিখিত কাজ যে শিক্ষার্থীরা করবে এতে বোধহয় দ্বিমত নেই। তাই যদি হয় তাহলে তাদের কাজ দেখে দেবার ও প্রয়োজন আছে। লিখিত কাজ করতে দেবেন ছাত্রদের আর সেগুলি দেখে দেবেন না,—এ অবস্থা অচল। যদি লিখিত কাজ দেখে দেওয়া না হয় তাহলে আপনার ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে কাজ করবেই না। ছাত্রদের মনে এরকম ধারণা যেন কোনো দিন না হয় যে তাদের লিখিত কাজ কোনোদিন দেখাই হবে না বা তার মূল্যায়ন হবে না। ছাত্রদের মনে এরকম ধারণা হবার একটা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া আছে। লিখিত কাজের যথাযথ সংশোধন হবে, মূল্যায়ন হবে,—শিক্ষকমশায় দেখবেন তাদের লিখিত কাজ এ ধারণাটা ছাত্রদের মনের উপর একটি শুভংকর, ও বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া ছাত্রদের কাজের বা পড়াশোনার অগ্রগতির একটি ধারাবাহিক হিসেব আপনাকে রাখতে হবে। সেদিক থেকে বিচার করে দেখলেও লিখিত কাজ দেখে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারা যায়।

তাহলে এটা ঠিক যে শিক্ষার্থীদের লিখিত কাজ দিতে হবে এবং সে কাজ শিক্ষকমশায়কে দেখেও দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কি করে সময় পাওয়া যাবে। ইতিহাস বিষয়টি এমন এবং ইতিহাসের প্রশ্ন লিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা এমন সব অভিনব উত্তর লিখে বসে, এমন সব নিজেদের দ্বারা আবিষ্কৃত নতুন তথ্য উত্তরের মধ্যে আমদানি করে বসে যে সেগুলি অতি বৃহৎ পুস্তকাগারের কোনো পুস্তকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজে কাজেই শিক্ষার্থীদের উত্তর খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে হবে। সব দিক বিচার বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে এই সমস্ত লিখিত কাজগুলির মধ্যে রচনামূলক লেখা খুব কম থাকলে সুবিধে হবে। অবশ্য উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাজে রচনামূলক লেখারই আধিক্য থাকবে। কিন্তু তেমনি নবম মান থেকে ইতিহাসের ছাত্রসংখ্যা কমে আসবে। নীচের শ্রেণীর ছাত্রদের ম্যাপ, চার্ট, ডায়াগ্রাম, সময়রেখা বা নানা ধরনের লেখ তৈরী করতে দিতে

পারা যায়। কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অল্প করে লিখতে দিতে পারা যায়। এগুলি দেখতে বেশী সময় লাগবে না। শিক্ষার্থীদের লিখিত কাজ দেখা সুষ্ঠু ভাবে সমাপন করার জন্যে হাতে সারা বৎসরের যা সময় আছে তা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ভাগ করে পড়ার কাজে ও লেখার কাজে ভাগ করে নেবেন। আগে থাকতে পরিকল্পনা না করে নিলে এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন ভাবে এ কাজ করলে বহু ধরনের অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে। সময় যা পাওয়া যাবে সেইমত কাজের, বিশেষ করে লেখার কাজের, একটি পূর্ব্ব-পরিকল্পিত ছক্ ঠিক করে নিতে হবে এবং এই পরিকল্পিত ছক অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করতে হবে। এগুলি অবশ্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার ভার শিক্ষক-মশায়ের উপরেই নির্ভর করে।

একটা কথা এসম্বন্ধে বলার এই যে ছাত্রদের কৃত এই কাজের মূল্যায়ন ও যথাযথ ভাবে করতে হবে। মূল্যায়ন যথাসাধ্য নিখুঁত করতে হবে। যে বিষয়ে পাঠ শ্রেণীতে চলছে বা হয়ে গেল সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে দেওয়া— কাজ যেন সঙ্গে সঙ্গেই করার ব্যবস্থা হয়। পড়ার সঙ্গে কাজ করলে ছাত্রদের জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হয়, ভুল সংশোধন (ছাত্রদের পক্ষে) সহজ হয়। বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতেও বিশেষ অসুবিধে হয় না। লিখিত কাজের প্রকৃতি যদি এমন হয় যে শিক্ষার্থীরাই শিক্ষকমশায়ের সামান্য সাহায্যে নিজেরা নিজেদের ভুল শ্রেণীকক্ষে বসে সংশোধন করে নিতে পারে তাহলে শিক্ষকমশায়ের সময় অনেক বাঁচে। কিন্তু ছাত্ররা তো সব জিনিস সংশোধন করতে পারবেনা। তথ্যের বা সন তারিখের ভুল, কি বানান ভুল, হয়তো শিক্ষার্থীদের পক্ষে সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব হতে পারে; কিন্তু যেখানে কোনো বিশ্লেষণ, কার্য্যকারণ অন্বেষণ প্রভৃতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে সেগুলি শিক্ষকমশায়কে নিজে দেখতে হবে। ম্যাপ, চার্ট, ডায়াগ্রাম প্রভৃতিও শিক্ষকমশাকে নিজে দেখে দিতে হবে। কিন্তু মূল্যায়ন করবেন কি করে? "নম্বর" দিয়ে? "নম্বর" দিয়ে মূল্যায়ন করাটা বিজ্ঞান সম্মতও নয় এবং মনোবিজ্ঞানের যুক্তি-সিদ্ধও নয়। বরঞ্চ কোনো প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা অনেক ভাল। পঞ্চ-বিন্দু-সম্বলিত পরিমাপ (Five point scale) দিয়ে মূল্যায়ন করা অনেক সময় ভাল। এই পরিমাপের প্রকৃতি ও যুক্তি সম্বন্ধে এক্ষেত্রে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, তাই আমাদের নম্বর দেওয়ার যে ধারণা আছে আমাদের মনে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এই পরিমাপ নির্মিতির উপায়টি নীচে দিয়ে আমাদের এ প্রসঙ্গ শেষ কোরবো।

... ...

80—100 ...	....	A
60— 79	....	B
40— 59 ...	...	C
20— 39	...	D
1— 19	....	E

নম্বরের পরিবর্তে A, B, C প্রভৃতি প্রতীকের ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়ে থাকে এই পরিমাপে।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে পৃথক শ্রেণীকক্ষ :—

ট্রেনিং কলেজ থেকে বি, টি, পাঠ শেষ করে ইতিহাসের শিক্ষকমশায় স্কুলে ফিরে এসে প্রথম ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছেন,—নবম শ্রেণী। অনেক-দিন পরে সেদিন স্কুলে প্রথম বলে নিয়মিত পাঠ নয়। কথায় কথায় ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষের কথা উঠলো। শিক্ষক-মশায় প্রশ্ন করলেন, "ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ কেন চাও?" "স্যার, বিজ্ঞানের পৃথক শ্রেণীকক্ষ আছে, আমাদের থাকবেনা কেন?" উত্তর এলো একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে।

একটু চিন্তা করে দেখলে উত্তরের হাল্কা স্তর ভেদ করে তার ভিতরে যে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে সেটি প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানের জন্যে পৃথক শ্রেণীকক্ষ, ভূগোলের জন্যে পৃথক শ্রেণীকক্ষ, "আর্ট্‌স্‌ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌"-এর জন্যেও সেই ব্যবস্থা কিন্তু ইতিহাসের জন্যে থাকবেনা কেন? প্রশ্নটি অবশ্য স্বাভাবিক কারণে ছাত্রদের কাছ থেকে আসবে; কিন্তু ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজনীয়তা ছাত্ররা যেমন উপলব্ধি করেছে তার থেকে আরো ঢের বেশীকরে উপলব্ধি করে থাকেন সব স্কুলের সব ইতিহাস শিক্ষকেরা। যে প্রশ্নটি ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষ সম্বন্ধে উঠেছে তার মধ্যে মনোবিজ্ঞানের একটি খুব সাধারণ কথা প্রকাশমান। গৃহহীন মানুষের আপনার করে, মনের মত করে, সাজাবার যেমন গৃহ থাকে না, তেমনি আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাবে তার আত্মবিশ্বাসও সজাগ সব সময়ে থাকে না। একটা অনিশ্চয়তা, পরমুখাপেক্ষা এবং ঔদাসীন্যের ছাপ থাকে তার চোখে মুখে, চলায় বলায়। ইতিহাসের শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর পক্ষেও ঠিক তেমনি। ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ না থাকলে বাস্তুহীন মানুষের মতই নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে এবং উদ্যমহীন গতানু-গতিকতায় এঁদের কাজের মধ্যেও প্রাণ থাকে না। কিন্তু পৃথক শ্রেণীকক্ষ থাকলে "নিজগৃহে" প্রতিষ্ঠিত হয়ে, কক্ষটি সাজিয়ে গুছিয়ে, উৎসাহে উদ্যমে,

কর্মচাঞ্চল্যে ও উদ্দীপনায় শিক্ষক যেমন নিজে সজীব ও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেন তেমনি নিত্য নব অনুপ্রেরণায় তাঁর উৎসাহ ও উদ্যম তিনি সংক্রামিত করে দেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর নিজের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবার বা প্রতিষ্ঠিত থাকার যে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিদ্যমান সেকথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। শ্রেণীকক্ষে ইতিহাসের শিক্ষকই হচ্ছেন ইতিহাস পড়ানোর প্রধান সহায়। টিচিং-এইড বলুন, অধুনাতম পদ্ধতিই বলুন, মনোজ্ঞ পাঠ্যপুস্তক বলুন, প্রধান শিক্ষকের বিচক্ষণ তত্ত্বাবধান বলুন, সব কিছুই অসার প্রতিপন্ন হয়ে যায় ইতিহাস পঠন-পাঠনে ইতিহাস শিক্ষকের মন বিকল হয়ে ভেঙে পড়লে। আর ইতিহাস পাঠ নেবে যে শিক্ষার্থীরা তারাও যদি ইতিহাসের ক্লাসে গৃহ হীনের উদাসীন মনোভাব নিয়ে থাকে তাহলে ইতিহাস পাঠ কি জমে? ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর একটি সুস্থ সবল, আত্ম-নির্ভরশীল, সন্তুষ্ট, স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকার মনোভাব গড়ে তুলে ইতিহাস পঠন-পাঠনকে সফল ও সার্থক করে তুলতে সাহায্য করে।

ইতিহাসের পঠন-পাঠনে নানা ধরনের টিচিং-এইড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ না থাকলে সাধারণ ক্লাসে সব টিচিং-এইড নিয়ে গিয়ে পড়ানো অনেক সময় অসুবিধেজনক। প্রথম কথা ক্লাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠে ব্যবহৃত উপকরণগুলি সবই সরিয়ে নিতে হবে, কারণ তার পরেই হয়তো বাংলার পঠন চলবে সেই শ্রেণীতে। পঠন-পাঠনে ব্যবহৃত উপকরণগুলি এই ভাবে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া, সেগুলিকে যথাযথভাবে সাজানো, এবং তাও যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে, বেশ অসুবিধেজনক। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন চলাকালে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি ম্যাপ মডেল বা অন্য একটি উপকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়লো (যেটি শ্রেণীকক্ষে আনা হয়নি), সেটি অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করা যায় না, সেটি সম্ভব নয়। এই সব নানা কারণে ইতিহাস পঠন-পাঠনে উপকরণের বিশেষ ঝামেলা না করে নিতান্ত সাদামাঠা ভাবে, মধুর অভাবে (গুড়ও নয়) "জলং দদ্যাৎ" বলে ইতিহাস পঠন-পাঠনের কাজ শেষ হলে খুব বেশী বিস্মিত হবার থাকেনা।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে ব্ল্যাকবোর্ডের কাজও অনেক সময় বেশী করা হয়ে থাকে। কোথাও বা ম্যাপ এঁকে, কোথাও স্কেচ করে, কোথাও বোর্ডে সারাংশ লিখে ইতিহাসের শিক্ষক মশাই ব্ল্যাকবোর্ডে অনেক কাজ করে থাকেন। কিন্তু ইতিহাসের ঘণ্টা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি সব মুছে ফেলবার প্রয়োজন হয়

সেই কক্ষে অন্য বিষয় পঠন-পাঠন ও তার আনুষঙ্গিক বোর্ডের কাজের তাগিদে। এতে ছাত্রদের অনেক সময় অসুবিধে হয়, আর শিক্ষক মশায়ের ও অসুবিধে হয়। ছাত্রদের অবশ্য অসুবিধে হবার কথা নয়; তবুও যদি কেউ বোর্ডের সংক্ষিপ্তসার কি অন্য কিছু সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিতে না পেরে থাকে তো তার অসুবিধে হবে। আর শিক্ষক মশায় হয়তো ঐ পাঠই ঐ শ্রেণীর অন্য Section-এ দেবেন। তাঁকে বোর্ডে আবার ঐ ম্যাপ চার্ট ডায়াগ্রাম স্কেচ বা সংক্ষিপ্তসার সবই করতে হবে, আবার পঠন-পাঠন যথাযথভাবে পরিচালনা করবার মত করে শ্রেণী-কক্ষটিকে সাজাতে হবে। ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ থাকলে শিক্ষক মশায়কে দুবার করে আর খাটতে হয়না এবং তার জন্যে সময় ও নষ্ট করতে হয়না। একটি ক্লাস শেষ হওয়ার পর ব্ল্যাকবোর্ডের আবশ্যকীয় কাজগুলি, কি সাজানো উপকরণ গুলি যথাযথ ভাবে রেখে দেওয়া সম্ভব হয়।

তাছাড়া আজকাল বিজ্ঞানের দৌলতে শ্রেণীকক্ষের চেহারা যখন বদলে যাচ্ছে আর পঠন-পাঠনের সরঞ্জামের যখন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটছে তখন ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ না হলে Audiovisual aids এর যথাযথ ব্যবহার করা হবে কি করে? Film Projector কিংবা Epidioscope কাঁধে নিয়ে একবার এ শ্রেণী একবার অন্যশ্রেণী করা কি সম্ভব? পঠন-পাঠনের মাঝখানে আজকাল শিক্ষার্থীকে বসানো হয়েছে। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এই পঠন-পাঠনে যখন নবতম পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাঠে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার কথা বলা হচ্ছে শুধু প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে নয়, বাস্তবে হাতে কলমে কাজ করে,-তখন ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ না হলে সব কথাই যে অন্তঃসারশূণ্য, ফাঁকা হয়ে দাঁড়াবে। ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ না থাকলে প্রোজেক্ট নেবেন কি করে? মডেল তৈরী করাবেন কোথা? তর্ক অলোচনার আসর জমিয়ে, উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে, য়ুনিট প্রথা অনুসরণ করে ইতিহাস পাঠ প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরিয়ে তুলবেন কি করে?

ইতিহাস পঠন-পাঠনে একটি সুষ্ঠু এবং জীবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে। এই পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষার্থীর মনকে কল্পনার রথে চড়িয়ে যে যুগের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে সেই যুগে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং সহজ হয়। ইতিহাস পাঠে এই কল্পনা জাগিয়ে তোলবার জন্যে আনুষঙ্গিক একটি পরিবেশের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। কিন্তু "বারোয়ারী" ক্লাসে কি সে পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়? সেটি একমাত্র সম্ভব ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষে। ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষ ইতিহাস পঠন-পাঠনের পরিবেশে জম-জমাট। চিত্রে, মানচিত্রে, সময় রেখায়,

নানা যুগের নানা ধরনের জিনিসের বিভিন্ন রকমের মডেলে, বিভিন্ন ধরনের সংগৃহীত উপকরণে আর সেগুলির যথাযথ ও সুষ্ঠু বিন্যাসে ইতিহাসের শ্রেণী-কক্ষ তো ইতিহাসের "মুাজিয়ম"। তাই বিজ্ঞানের পৃথক শ্রেণীকক্ষ যেমন বিজ্ঞানের বীক্ষণাগার, ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ ও তেমনি ইতিহাসের বীক্ষণাগার। এখানে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে উদ্দীপন আসবে; কৌতূহল জাগাবে, জাগিয়ে তুলবে অনুসন্ধিৎসা।

অনেক সময় দেখা যায় ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ থাকলে নানা জিনিস সংগ্রহ করে, নানা ধরনের মডেল তৈরী করে, চিত্র, মানচিত্র, চার্ট ডায়াগ্রাম সময় রেখা প্রভৃতি তৈরী করে সেগুলি সংরক্ষিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষের অভাবে এইগুলি তৈরী করা ঠিকমত হয়না। ঐগুলি সংরক্ষিত হবে না সেই জন্যে একটি নিরুৎসাহ নিরুদ্যমের ভাব স্বেচ্ছায় উৎসারিত কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। যদিও কোথাও কোনো উৎসাহী ইতিহাস শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহু ধরনের জিনিস তৈরী হয়, কিন্তু সেগুলি নষ্ট হয়ে যায় সংরক্ষণ করবার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে, স্থানের অভাবে, ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষের অভাবে। ফলে ক্রমে ক্রমে উৎসাহী ইতিহাসের শিক্ষকের আন্তরিকতা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা তলিয়ে যায় কোনো রকম দায়সারা মামুলী গতানুগতিকতায়, ব্যর্থ প্রচেষ্টার ভগ্নোদ্যমে।

তাছাড়া দেখা গিয়েছে ইতিহাস যেখানে পঠন-পাঠন হবে সেখানে কিছু "রেফারেন্স" বই থাকার প্রয়োজন। এটি আবশ্যক উঁচু ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জন্যে। যারা ছোট তাদের জন্যেও, তাদের মন বিষয়বস্তুতে আকর্ষণ করতে পারে সেই ধরনের বই কিছু থাকার বা রাখার দরকার। এটি সম্ভব হবে যদি ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষ থাকে তবেই।

ইতিহাসের শ্রেণীকক্ষ কিরকম হবে, কি করে বেশী আলো বাতাস শ্রেণীকক্ষে আসবে, কোথায় শিক্ষার্থীরা বসবে, কোথায় Demonstration table থাকবে কোথায় কি চিত্র বা মানচিত্র রাখা হবে, কোথায় "মডেল" প্রভৃতি তৈরীকরার সরঞ্জাম থাকবে, সময় রেখা কোথায় কি ভাবে রাখা হবে,—এই রকম খুঁটিনাটি বহু জিনিস ইতিহাস শ্রেনণীকক্ষ সম্বন্ধে আছে। সেগুলি আর এখানে আমরা আলোচনা করলাম না। কোনো অভিজ্ঞ পরামর্শ মত সেগুলি করে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

স্থানীয় ইতিহাস :—

ইতিহাস পঠন-পাঠনে এবং শিক্ষার্থীর জীবনে স্থানীয় ইতিহাসের প্রভাব প্রতুল এবং নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। এই প্রভাবকে পঠন-পাঠনে কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাতে সুস্পষ্ট হয় তার জন্যে আলোচনার দরকার স্থানীয় ইতিহাস বলতে আমরা কি বুঝি এবং সেই স্থানীয় ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের স্কুল পাঠ্যক্রমের সম্পর্ক কি এবং কতটুকু? দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় ইতিহাস শিক্ষার্থীর জীবনে এবং শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনে কেমন করে প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয়তঃ স্থানীয় ইতিহাসের প্রভাবকে আমরা কি উপায়ে ইতিহাস পঠন-পাঠনে কাজে লাগাতে পারি।

"স্থানীয় ইতিহাস" কথাটির মধ্যে স্থান কথাটি নিঃসন্দেহে ব্যবহৃত হয়েছে যে স্থানে বিদ্যালয় অবস্থিত তাকে কেন্দ্র করে আশেপাশের স্থান সমূহ এই অর্থে। যেটি নিকট পরিবেশ, স্থানীয় পরিবেশ, যে সব স্থানের সাথে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ পরিচিতি আছে, কিংবা যে সব স্থানের সাথে তার নিকট পরিচিতি ঘটবার অনুকূল অবস্থা আছে, অর্থাৎ নিজের গ্রাম, ইউনিয়ন বা জিলা,—এইগুলির ইতিহাস হচ্ছে স্থানীয় ইতিহাস।

কিন্তু আমাদের দেশে এই গ্রাম ইউনিয়ন বা জিলাগুলির কি ধারাবাহিক কোনো লিখিত ইতিহাস আছে যে শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব গ্রাম ইউনিয়ন বা জিলার ইতিহাস পড়তে দিতে পারা যাবে? যে স্থানীয় পরিবেশ এবং তার ইতিহাস আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সাথে ধারাবাহিক ভাবে সংশ্লিষ্ট সে রকম স্থানীয় পরিবেশ একান্ত বিরল। মহাকালের খতিয়ানে যে সব অজস্র ঘটনার ভিড় সেইগুলিই আছে ইতিহাসের বুকে। তাই স্থানীয় পরিবেশের এমন কোন ঘটনা বা স্থান খুঁজতে হবে যেটি আমাদের জাতির ইতিহাসের সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত আছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে পলাশীর যুদ্ধ বা যুদ্ধক্ষেত্র; শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, মারাঠা 'ডিচ' ফোর্টউইলিয়ম দুর্গ প্রভৃতি। কিন্তু এতেও কিছু অসুবিধে আছে, কারণ জাতীয় ইতিহাসের মূল ধারার সাথে এইগুলির সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন নয়। তার অভাব রয়ে গেছে যথেষ্ট।

আর সেই জন্তেই স্থানীয় ইতিহাস পঠন-পাঠনে অসুবিধে। তাছাড়া স্থানীয় ইতিহাসের আর অন্য কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা না থাকায় এই দুএকটি ঘটনার আলোচনার সময় এদের উপরই জোর দেওয়া হয় বেশী এবং তিলকে তাল করে দেখবার, সামান্য ঘটনার উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব দেবার প্রয়াস ও লক্ষ করা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় ইতিহাস কি বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, বা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায়, স্থানীয় ইতিহাস কেবল মাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুএকটি প্রধান প্রধান ঘটনা ও তথ্য হয়েই দাঁড়ায়। না থাকে তার মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা, না থাকে তার সামগ্রিক রূপ!

ইতিহাস আবার কেবল মাত্র প্রধান প্রধান ঘটনার সমষ্টি মাত্রই নয়। সামগ্রিক এবং ধারাবাহিক ভাবে মানুষের কথাই আছে ইতিহাসের পাতায়। তাই আপনার স্কুলের স্থানীয় পরিবেশে বাস করে যে সব লোক, তাদের সুখ দুঃখের কথা, আচার আচরণের কথা, তাদের আহার, পরিধেয়, চাষবাস, শিল্পকলা, ব্যবসা বানিজ্য, ধর্মসমাজ,—এককথায় স্থানীয় মানুষের কথা বলবে আপনার স্কুলের স্থানীয় ইতিহাস। সেই জন্যে আপনার স্কুলের ছাত্রদের স্থানীয় ইতিহাসের সাথে পরিচয় সাধন করবার জন্যে আপনার স্কুলের চারপাশে যে সব স্থান আছে এবং সেখানে যে সব লোক বাস করে তাদের বর্ত্তমান ও অতীতকে আপনার ছাত্রদের চোখের সামনে রাখতে হবে। মানুষের জীবনের ধারা চলেছে অব্যাহত গতিতে। আজ যে বর্ত্তমানকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেতো অতীতেরই অবদান। আজকের যে সমাজ-জীবন তাতো অতীতের সমাজ জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত। তাই আপনার স্কুলের পরিবেশের ঐতিহ্য সমন্বিত কোনো স্থান বা বংশের কথা, কোন মন্দির, মসজিদ বা গির্জ্জার ঐতিহ্য, সেখানের বিখ্যাত কোন কুটীর শিল্প এবং তার প্রস্তুত করবার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান, কোন মেলা পরিদর্শন, চলিত প্রবাদ, লোক সংগীত, লোক-নৃত্য, গাথা, আলিম্পন, চিত্র, পট, প্রভৃতির আহরণ সঙ্কলন এবং তাদের মধ্যে দিয়ে যে জীবনের অভিব্যক্তি আজ বর্ত্তমানে ক্রমে ক্রমে পরিণতি লাভ করেছে তার সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে। বস্তুতঃ এগুলির সামগ্রিক রূপই তো মানুষের জীবন-আলেখ্য। এর মধ্যেই তো মানুষের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু মুস্কিল এই যে এই ধরনের স্থানীয় ইতিহাসের চিত্র আমাদের নাগালের বাইরে। আমাদের প্রচেষ্টা পরিকল্পনাও বিশেষ কিছু এ ব্যাপারে এখনও পর্য্যন্ত নেই। কাজে কাজেই শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবার মত সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ এই স্থানীয় ইতিহাস পাব কোথায়?

অথচ স্থানীয় ইতিহাসের এই সামগ্রিক রূপটি নিঃসন্দেহে অতি প্রয়োজনীয়। ইতিহাসের সাথে শিক্ষার্থীর পরিচিতির সময় তার সামনে এটি উপস্থাপিত হবার দাবী রাখে। ইতিহাস পঠন-পাঠনে স্থানীয় ইতিহাসের সব থেকে বড়ো অবদান হ'ল এই যে এটি ইতিহাস পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে। বাল্যে ও কৈশোরে নিজের আশেপাশের জিনিসের সাথে পরিচয়ের জন্যে যেমন মনে থাকে আগ্রহ তেমনি থাকে নিজের এবং চার পাশের লোকেদের অতীত সম্বন্ধে জানবার এক অদম্য কৌতূহল। স্থানীয় ইতিহাস এই কৌতূহল জাগিয়ে তুলে শিক্ষার্থীর মনে ইতিহাস পাঠে আগ্রহই শুধু সৃষ্টি করেনা একে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে এমন এক পর্য্যায়ে নিয়ে এসে হাজির করে যে সেই অবস্থার মধ্যে ইতিহাস পাঠ বাস্তবিকই সার্থক হয়ে উঠে। তাছাড়া স্থানীয় ইতিহাস আর একটি খুব বড়ো কাজ করে। বাস্তবের সাথে শিক্ষার্থীর সোজা-সুজি মুখোমুখী সংযোগ সাধন করে দিয়ে ইতিহাস পাঠকে প্রাণবন্ত করে তুলে। ইতিহাস তখন আর ইতিহাস বই-এ ছাপার অক্ষরের গল্পকাহিনী, অপ্রাকৃত রূপে থাকেনা, বাস্তব রূপে শিক্ষার্থীর কাছে এসে হাজির হয়। তাই স্থানীয় ইতিহাসের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পটভূমিকায় তার থেকে কিছু সুনির্ব্বাচিত তথ্যতাবাস,—যেগুলির জাতীয় ইতিহাসের সাথে পারম্পর্য্য ও সংযোগ আছে,—যদি শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনে কাজে লাগানো যায় তাহলে ইতিহাস পাঠ কানায় কানায় ভরে উঠে। সাক্ষাৎ এবং প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জাদুস্পর্শে তা অভিরাম হয়ে উঠে অপূর্ব্ব অভিনবত্বে। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন কালে উপস্থাপিত তথ্য-রাজির সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় সাধনের জন্যে অনায়াসেই শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐতিহ্য সমন্বিত বা ইতিহাসের ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত স্থানগুলিতে যাওয়া যায় আর তার ফলে যাকে বা যে গুলিকে অবলম্বন করে ইতিহাস রচিত হয়েছে বা যে গুলি রচিত ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে তাদের চাক্ষুষ পরিচয় মেলে। স্কুল ঘরের ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডী একঘেয়েমীতে হাঁফিয়ে উঠেনা আর। এতে আসে প্রাণ, বৈচিত্র্য, প্রত্যক্ষ পরিচয়।

নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় আর গবেষণায় আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার ক্রমবর্দ্ধনশীল। অনুসন্ধিৎসা আর জিজ্ঞাসা ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ে আলোক সম্পাত করে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আর নবলব্ধ জ্ঞানে আবার নতুন করে হয় ইতিহাসের রচনা। বিশেষ করে স্থানীয় ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে আবার নতুন করে রচিত হচ্ছে। যে যে অধুনাপ্রাপ্ত তথ্যের এবং উপকরণের উপর নির্ভর করে ইতিহাসের এই নব রচনা সেই উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারলে অনেক

সুবিধে হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের চোখের সামনে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছে। গরুর গাড়ীর সাথে পাশাপাশি উড়োজাহাজকে রেখে, পুরানো আমলের সাজ পোষাক, অলঙ্কারাদির সাথে হালফ্যাসানের অলঙ্কারাদির ও সাজপোষাকের তুলনা করে, আমাদের সমাজের প্রাচীনাদের সাংসারিক কাজের সাথে নবীনাদের কাজের তুলনা করে, হাতে চালানো তাঁত আর যন্ত্রচালিত কাপড়ের কলের চাক্ষুষ পরিচয় পাশাপাশি স্থাপন করে, আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস যে নতুন ভাবে, নতুন পর্য্যায়ে রচিত হচ্ছে সে সম্বন্ধেও শিক্ষার্থীদের সম্যক অবহিত করা যেতে পারে। আর একাজ প্রত্যক্ষ বাস্তবের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে এবং শিক্ষার্থী-দের চোখের সামনে উপস্থাপিত করা যায় বলে,—এর মাধ্যমে তাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায়।

জানা জিনিসের উপর ভিত্তি করে অজানা জিনিস আমরা শিখি। 'জানা থেকে অজানা' 'শিক্ষাতত্ত্বের একটি অতি আবশ্যকীয় কথা। এটি ইঙ্গিত পূর্ণ। শিক্ষার্থী নতুন জিনিস শেখে তার জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, তার সাথে নতুন অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধন করে। স্থানীয় ইতিহাসের উপযোগিতা সে দিক থেকে প্রচুর; কারণ স্থানীয় ইতিহাস তো শিক্ষার্থীর ঘরেপাশের ইতিহাস। তাই এর মাধ্যমে ইতিহাসের সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় সহজ হয়, নিবিড় হয়, ফলপ্রসূ হয়। বিশেষ করে "Lines of development" পদ্ধতি অনুসরণ করলে ইতিহাস খুব সহজভাবে ও স্পষ্ট করে উপস্থাপিত করা যায় স্থানীয় ইতিহাসের মাধ্যমে।

স্থানীয় ইতিহাসের অবদান আর একদিক থেকে যথেষ্ট মূল্যবান। আমরা স্বাধীনতা পাবার পর থেকেই গণতান্ত্রিক ছাঁচের সমাজ গড়ার কাজে সচেষ্ট। এই গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার কাজে শিক্ষার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নিজ নিজ জেলায় কিকি ঐতিহ্য মণ্ডিত জিনিস আছে, কিকি ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত স্থান আছে সেগুলি জানার মূল্য নেহাৎ কম নয়। কিন্তু আমাদের দেশের এই ভাবে প্রতিটি জেলা ধরে ঐতিহ্য মণ্ডিত বস্তু বা স্থানের অনুসন্ধান-কাজ ব্যাপক ভাবে করা হয়নি। এ সম্বন্ধে কোনো নির্ভর যোগ্য বিবরণও নেই বললেই চলে। আমরা অবশ্য আশা করবো ধীরে ধীরে একাজ হবে।

স্থানীয় ইতিহাস বলতে আমরা কি বুঝি এবং ইতিহাস পঠন-পাঠনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করার পর আর একটি কথা স্বাভাবিক ভাবেই

এসে পড়ে। সেটি হচ্ছে এই যে আমরা ইতিহাসের শিক্ষকেরা কি উপায়ে এই স্থানীয় ইতিহাসকে শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠনে কাজে লাগাবো। এ কথাটি বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে; কারণ শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনে আমরা কেউই স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারিনা, অথচ স্থানীয় ইতিহাসের কোনো নির্ভর যোগ্য এবং প্রামাণ্য বই, বিবরণ ও নেই। একদিকে যেমন স্থানীয় ইতিহাসের নির্ভর যোগ্য ও প্রামাণ্য বই, বিবরণের অভাব, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষক মশায় স্থানীয় ইতিহাসের যেমনটি এবং যতটুকু পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে চান তা করবার ক্ষমতাও তাঁর হাতে নেই।

অবস্থা যে প্রতিকূল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবস্থা প্রতিকূল বলেই শিক্ষকমশায়ের ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে গুরু দায়িত্ব। প্রাথমিক স্তরে (৬ থেকে ১১ বছরের শিক্ষার্থীদের) পরিবেশ পরিচিতির কালে সমাজ শিক্ষার মধ্যে ইতিহাস ও ভূগোল একসঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া যায়। কোথাও কোথাও এই স্তরে পশ্চিম বাংলার সব জেলাগুলির বিবরণ পড়াবার ব্যবস্থা আছে। এই সময় নিজ জেলার কথা একটু বিস্তৃত ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। দর্শনীয় স্থানগুলিতে উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর পরের স্তরে যদিও পাঠ্যক্রমে স্থানীয় ইতিহাস বলতে বিশেষ কিছু নেই তবু কুশলী শিক্ষক নিজ সুবিধামত পাঠ্যক্রমের বিন্যাস সাধন করে স্থানীয় ইতিহাস শিক্ষার্থীদের পড়াবার বা জানাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। ১১—১৪ বছর বয়েসের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম শিক্ষক মশায় নিজ সুবিধামত সাজিয়ে নিতে পারেন। "Lines of development" অনুসরণ করলে খানিকটা সুবিধে হবে। এই সময় থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা বেশ কিছু পরে হবে, কাজে কাজেই এই স্তরে, কি শিক্ষক কি শিক্ষার্থী, কারো মনে পরীক্ষা ভীতি জাগেনি, স্থানীয় ইতিহাসের সাথে সম্যক পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়ার এবং স্থানীয় ইতিহাসের মাধ্যমে ইতিহাস পড়ানোর এটি উপযুক্ত সময়। এই তিন বছরে যদি অসুবিধে হয় তো আরো এক বছর নিন। তা ছাড়া সব বয়েসের শিক্ষার্থীদের স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে নানা ভাবে তাদের কৌতূহল জাগিয়ে তাদের উৎসাহিত করা যায়। স্কুলে 'ম্যুজিয়ম' করুন। তার জন্যে স্থানীয় দর্শনীয় জিনিস সংগ্রহ করুন। স্থানীয় চলতি প্রবাদ, ছড়া, ব্রতকথা, পুরানো পুঁথি, পট, আলিম্পন, পুরানো সূচী-শিল্পের নিদর্শন প্রভৃতি সংগ্রহ করুন। আপনার স্কুল যে জেলায় অবস্থিত তার দর্শনীয় স্থান, পুরানো মন্দির, মঠ, মসজিদ, গির্জা প্রভৃতির এবং আরো

দর্শনীয় দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করুন এবং সেটি সযত্নে স্কুল ম্যুজিয়মে রেখে দিন। প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে যে সব মেলা, আর সেই মেলা যে সব স্থানে বসে, তাদের কাহিনী সংগ্রহ করুন। জেলার বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম ও জন্মস্থান, প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত বংশের তথ্য সংগ্রহ করুন। স্থানীয় কুটীরশিল্প, স্থানীয় পরিবেশে যে সব পাল-পার্ব্বন ও উৎসব হয় সেগুলির নামের তালিকা (পালন করবার সময় সহ), আপনার স্কুলকে কেন্দ্র করে আশে পাশে কোন্ কোন্ জাত বাস করে তাদের জীবিকা কি—এই সমস্ত সংগ্রহ করুন। আপনার জেলায় কি কি জিনিস বিশেষভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারও তালিকা প্রস্তুত করুন। তার পর একদিকে চলুক সংগ্রহের কাজ, আর একদিকে চলুক শিক্ষাভ্রমণ, কিংবা দুটিই এক সাথে। দর্শনীয় স্থানের দ্রষ্টব্য জিনিষের আলোক চিত্র নিন এবং সেগুলি ম্যুজিয়মে সাজিয়ে রাখুন। এ কাজগুলি সবই করতে হবে কিন্তু শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সহযোগিতায় আর আপনার নির্দ্দেশে। স্কুলের টাইমটেবলে এসব কাজের জন্যে হয়তো আপনার স্কুলের প্রধান শিক্ষক-মশায় সময় দিতে পারবেন না, তাঁর পক্ষে সময় দেওয়া সম্ভবও নয়। স্কুলের সময়ের পর এসব কাজ করতে হবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

এসবের বাস্তব রূপায়ণে অনেক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে জানি। কিন্তু তবু আশা করা যায় যে ইতিহাস শিক্ষক-মশায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, প্রধান শিক্ষক-মশায়ের সহানুভূতিতে ও স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিগুলির কর্ম্মতৎপরতায় স্থানীয় ইতিহাসের যথাযথ অধ্যয়নের অবকাশ আমাদের মিলবে।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে সমধর্ম্মী পুস্তক অধ্যয়ন (Collateral Reading) :—

সমাজ ছাড়া শিক্ষা নয়, শিক্ষা ছাড়া সমাজ বন্ধ্য। প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি নিয়ম, ব্যবস্থা, আচার পদ্ধতি আবহমান কাল ধরে চলে এসেছে। সেগুলি যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে তেমনি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাধারা, শিক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতিকেও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এগুলি "tradition"। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে এ "tradition" বিভিন্ন। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি পরিবেশই এই ভিন্ন ভিন্ন "tradition"-এর মূল উৎস।

ইউরোপের দেশসমূহের নানা পরিবেশে যে "tradition" গড়ে উঠেছে তাতে শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনে শিক্ষকমশায়ের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। সেখানে পাঠ্যপুস্তককে শ্রেণীকক্ষে অনুসরণ করা

হয়, গুরুত্ব বেশী দেওয়া হয় না। কিন্তু আমেরিকায় "tradition" অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের উপরই নির্ভর করা হয় বেশী, শিক্ষক-মশায়ের উপর কম। পাঠ্যপুস্তকে আবৃত ও বিন্যস্ত বিষয়-বস্তুগুলি সমধর্মী পুস্তক অধ্যয়নের সাহায্যে সেখানে সহজবোধ্য করার চেষ্টা হয়। আমেরিকাবাসীদের বিশ্বাস, পাঠ্য-পুস্তকে সন্নিবেশিত বিষয়-বস্তু ছাড়া সমধর্মী পুস্তকের অনুরূপ অধ্যয়ন অধিকতর তথ্যের প্রাচুর্য্য সম্ভারে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত করে। আমেরিকার স্কুলের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-মশায়ের ভূমিকা সর্ব্বগ্রাসী নয়। সমধর্মী পুস্তক অধ্যয়ন (collateral reading) সেখানে এত গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে বসে আছে যে সেখানে সমধর্মী পুস্তক অধ্যয়ন (collateral reading) ছাড়া ইতিহাস-পাঠ সম্ভব নয় বলেই সাধারণ ধারণা। তাই অনেক সময় বলা হয়ে থাকে "it is as impossible to teach history without reference book, as it is to teach chemistry without glass and rubber tubing."।

ইউরোপ আমেরিকার কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের দেশের পরিবেশে আমাদের স্কুলের শ্রেণীকক্ষে আমরা সমধর্মী পুস্তকের অধ্যয়ন (collateral read-nig) থেকে কতখানি উপকৃত হতে পারি তাই দেখা যাক্। আমাদের উদ্দেশ্য শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পাঠ সাবলীল ও প্রাণবন্ত করে তুলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত করা। একাজে সমধর্মী পুস্তকের অধ্যয়ন আমাদের কি ভাবে কতোখানি সাহায্য করতে পারে তাই দেখতে হবে। এই প্রসঙ্গে এটি উল্লেখ-যোগ্য যে ইতিহাসের সমধর্মী পুস্তক পাঠে যে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটবে, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত বিষয়-বস্তুগুলি এরূপ অধ্যয়নের ফলে যে শিক্ষার্থীর মনে পরিচিতির পাকা স্বাক্ষর রাখবে সে, বিষয়ে বিশেষ কিছু সন্দেহ পোষণ করবার নেই।

ইতিহাসের সমধর্মী পুস্তকের তালিকায় নানা ধরনের পুস্তক অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যে পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীকক্ষে অনুসরণ করবার জন্যে নির্ব্বাচিত হয়েছে সেটি ছাড়া অন্য ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক, ইতিহাসের সাথে যুক্ত কাব্যকাহিনী, গল্পউপন্যাস, নাটক, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রাচীন কালের কোনো পর্য্যটকের বিবরণী প্রভৃতি এই পর্য্যায়ে পড়বে। এই সব পুস্তকগুলি আবার কোথাও মূল উপাদান সম্বলিত হতে পারে। আবার কোথাও মূল উপাদানকে কেন্দ্র করে কিছু কল্পনার রঙ্ মিশিয়েও রচিত হতে পারে। এখন কথা উঠতে পারে যে এই ধরনের পুস্তক পড়ার আবশ্যকতা কেন উপলব্ধি করা হয়ে থাকে? একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে—

"Collateral Reading ছাড়া শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠন একেবারে সম্ভব নয়"—এটি একটি চূড়ান্ত মতবাদ। কেন, একখানা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক ভাল করে পড়ে, শিক্ষকমশায়ের নিজ সঙ্কলনের সাহায্যে, দুরূহ অংশের বা অধ্যায়ের অংশ বুঝে নিয়ে কি ইতিহাস পাঠ সার্থক এবং সফল হয় না? এসম্বন্ধে অধিকাংশ অভিজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষকের দৃঢ়মত হ'ল "হয় বৈকি।" তবে একথাও ঠিক যে একখানা পুস্তক খুব ভাল করে পড়ে তার সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক ভাবে সমধর্ম্মী পুস্তক পাঠের সাহায্য নিলে আরও ফল পাওয়া যায়,—বিষয় জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। অনেক বই পড়তে গেলে খুব ভাল করে সব জিনিস পড়া সম্ভব হয় না। খানিকটা ভাসা ভাসা ভাবে পড়াটা হয়ে থাকে। তখন একটা জটিল প্রশ্ন অনেকে করে বসেন, "অনেক বই ভাসা ভাসা পড়া ভালো, না একখানা বই শিক্ষকমশায়ের সাহায্যের উপর নির্ভর করে খুব ভালো করে পড়া ভালো?" প্রশ্নটি কূট, কাজেই বিতর্কমূলক। দুটি পক্ষেই কিছুনা কিছু বলবার আছে। কিন্তু আমাদের এখানে যা প্রশ্ন তা এই দুপক্ষের একটি ও পক্ষাঘাতে জর্জ্জরিত হচ্ছে না। আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা একখানা পাঠ্যপুস্তক ভালো করে নিখুঁত ভাবে পড়াবো, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু সাথে সাথে যদি পাঠ্যপুস্তক হতে এবং শিক্ষকমশায়ের কাছ থেকে আহৃত জ্ঞানের ব্যাপ্তি পাকাপাকিভাবে শিক্ষার্থীর মনে প্রসারিত করবার জন্যে সমধর্ম্মী পুস্তক কিছু ভাসাভাসা ভাবে পড়াবার আশ্রয় নি, তাতে ক্ষতি কি?

একখানা পাঠ্যপুস্তক খুব ভাল করে পড়বার সময় পাঠের প্রাসঙ্গিক অঙ্গ হিসেবে যদি আরো কতকগুলি সমধর্ম্মী পুস্তক থেকে কিছু কিছু পড়ানো যায় শিক্ষকমশায়ের তত্ত্বাবধানে, তাতে লাভ হবে। শিক্ষণ কাজে শিক্ষক মশায়ের যে গুরু দায়িত্ব তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, কোনো যুক্তিও নেই। শিক্ষক মশায় যদি অনবরতই মৌখিক আলোচনা, ব্যাখ্যা, টীকা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে ব্যস্ত থাকেন তাতেও শিক্ষার্থীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। পঠন-পাঠনে একঘেয়েমী আসবে। বৈচিত্র্য থাকবে না। পাঠ হবে বিস্বাদ, নীরস। কিন্তু সমধর্ম্মী পুস্তকের অধ্যয়নের ফলে, সাহিত্যের রসে, কাহিনীর কল্পনার রঙে, কাব্যের ইন্দ্রজালে ইতিহাসের তথ্যের একটানা প্রবাহ প্রাণ পাবে। এদের মধ্যে থেকে সত্য তথ্য বেছে নিতে পারলে আর ক্ষতি হবে না। সত্য তথ্য বেছে নেবার জন্যে তো সব সময়েই আছে শিক্ষকমশায়ের নির্দ্দেশ আর পাঠ সমাপনান্তে শ্রেণীকক্ষে আলাপ আলোচনা।

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে, দুটি চূড়ান্ত মতের মধ্যপন্থা অনুসরণ করে, ইতি-

হাস পঠন-পাঠনে সমধর্ম্মী পুস্তক অধ্যয়নের সাহায্য নিলে কি ধরনের উপকার আমরা পাবো তাই দেখা যাক।

পাঠ্যপুস্তকে সাধারণতঃ যে সব তথ্য সন্নিবেশিত থাকে নানা কারণে তাদের পরিমাণ সীমিত। কোনো বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যদি শিক্ষকমশায় মনে করেন যে আরো কিছু বেশী তথ্য শিক্ষার্থীদের জানার প্রয়োজন আছে তখন তিনি নানা পুস্তক থেকে আহরণ সঙ্কলন করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন; কিংবা দুএক কথায় তার সারমর্ম্ম বলে দিয়ে দুএকখানি বই-এর দুএকটি অধ্যায় বা পৃষ্ঠা পড়ার কথা বলে দিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে শ্রেণীকক্ষে অনুসরণ করার জন্যে নির্ব্বাচিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সম মানের পাঠ্যপুস্তক পড়বার কথা বলতে পারেন অবশ্য যদি তাতে অধিকতর তথ্য থাকে। এছাড়াও অন্য পুস্তকের নামও করতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশে শেষোক্ত ধরনের বই-এর সংখ্যা এতই বিরল যে তাদের তালিকা প্রস্তুত করবার সময় কোনো বই-এর নাম খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। সমধর্মী পুস্তকের পাঠ হবে সব সময়েই প্রাসঙ্গিক। এটি শিক্ষক মশায়ের নির্দ্দেশে হবে। এতে লাভ হবে এই যে শিক্ষার্থীদের যদি ধারণা থাকে তারা যে পাঠ্যপুস্তক পড়ছে, তার মধ্যেই ইতিহাসের সব তথ্য আছে,—আর কোথাও নেই, তো সে ভুল ভেঙে যাবে। তাছাড়া তথ্যের প্রাচুর্য্যে তাদের জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটবে। তথ্যের প্রাচুর্য্য আনতে গিয়ে যেন এধরনের বই পড়াটা শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

ইতিহাস বিষয়টি এমনিই যে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে তার ব্যবধান অগাধ। এই ব্যবধানকে দূর করে পঠন-পাঠনে বাস্তব সংস্পর্শ আনবার জন্যে শিক্ষক মশায় নানা প্রকারের সাহায্য,—ম্যাপ, মডেল, গ্রাফ, শিক্ষা ভ্রমণ,—প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে থাকেন। সমধর্ম্মী পুস্তক অধ্যয়নের সাহায্য অনুরূপ ভাবেই নিতে পারা যায়। কোনো ঐতিহাসিক নাটক, উপন্যাস, কাহিনী, আত্মচরিত প্রভৃতি পাঠের মধ্যে দিয়ে সুদূর অতীতের অগম্যতীরে হাজির হবার অথবা অদূর অতীতকে যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। কল্পনায় ভর করে প্রাচীন পাটলিপুত্র, তক্ষশীলা, নালন্দার সাথে পরিচয় হবার পথ প্রশস্ত হবার সুযোগ হতে পারে। অবশ্য এই ধরনের পুস্তককে যথাযথ ইতিহাস বলা চলবে না। ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কল্পনার রঙ মিশিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি এগুলি। কিন্তু ইতিহাস পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি ও মন তৈরী করার জন্তে তারও প্রয়োজন আছে।

ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত সাহিত্য পড়বার আর একটি উদ্দেশ্যও এর সাথে সফল হয়ে উঠবে। কোন্ লেখকের কি কি পুস্তক, কি ধরনের পুস্তক, কি প্রকৃতির ঐতিহাসিক তথ্য সেগুলির মধ্যে আছে, এগুলি অনুরূপ অধ্যয়নের ফলে শিক্ষার্থীদের জানার নাগালে আসবে। এরকম ক্ষেত্রে অবশ্য লেখকের নাম, কোন্ সময় সে লেখক জীবিত ছিলেন এবং তাঁর লেখা পুস্তকের নাম, পুস্তকে আধৃত তথ্যের প্রকৃতি কিরূপ, তথ্যের মূল উৎস কোথা—এই সব বিষয়ের উপরও জোর পড়বে বেশী।

বাস্তবের সাথে সম্পর্কহীন বলে শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস অনেক সময় নীরস নিরানন্দময় হয়ে দাঁড়ায়। তাকে জীবন্ত করে তোলবার জন্যে অনেক সময় এই সমধর্ম্মী পুস্তক পাঠের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ভারতের ইতিহাসে মুঘল আমল পড়াচ্ছেন। মুঘলের সাথে রাণাপ্রতাপের অভিনব সংগ্রামের দিকটি আপনার ছাত্রদের মনে দাগ ফেলতে পারবে তখনই, যখন শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়েও রাণা প্রতাপের স্বাধীনতায় অবিচল নিষ্ঠাটি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারবেন। এতে দরকার হবে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে যে বর্ণনাতীত দুঃখের সম্মুখীন হয়েও তিনি উঁচু মাথা মুঘলের পায়ে নোয়ান নি, তার নিখুঁত চিত্রটি ছাত্রদের মনশ্চক্ষে ফুটিয়ে তোলা। এটি সম্ভব হবে রাণা প্রতাপের অনন্যসাধারণ বীরত্বকে কেন্দ্র করে যে সব গল্প কাহিনী লিখিত হয়েছে তার কিছু কিছু শিক্ষার্থী-দের পড়তে দিলে। তার জন্যে সমধর্ম্মী পুস্তক পাঠের প্রয়োজন আছে। এতে ইতিহাস পাঠে ছাত্রদের মধ্যে একটা বাস্তবতা বোধ, একটা মানবিক স্পর্শ আসবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের এতে কল্পনা শক্তির স্ফুরণ হবে, কৌতূহল সৃষ্টি হবে। অবশ্য ঐতিহাসিক তথ্য ও ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য তাদের ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

কার্য্যকারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণ, তার জন্যে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ভঙ্গি, সংস্কার মুক্ত মনের কাঠামো, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা, বিচারবুদ্ধির তুলাদণ্ডে সত্যটিকে ওজন করে নেওয়া প্রভৃতি ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্যের তালিকার মধ্যে আপন আপন আসন করে নিয়েছে। সেগুলির সম্যক বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠবে যদি মূল উৎস সম্বলিত কোনো ঐতিহাসিক দলিল, শিলালিপি বা স্তম্ভলিপির অনুবাদ, বা কোনো ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি যেগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ইতিহাস রচিত হয় সেগুলি শিক্ষার্থীদের পড়বার সুযোগ মেলে। হয়তো পাঠ্যপুস্তকের কোনো সিদ্ধান্তের সাথে মূল দলিলের তথ্যের মিল হবে না, কেন মিল হ'ল না তার কারণ অনুসন্ধান করবে শিক্ষার্থী। মূল দলিলের কতকগুলি তথ্য পাঠ্যপুস্তকে

স্থান পেয়েছে আর কতকগুলি তথ্য স্থান পায়নি কেন শিক্ষার্থীরা তার কারণ হৃদয়ঙ্গম করবে। যুক্তির বিন্যাসে আর বিচারের মানদণ্ডে ওজন করে শিক্ষার্থী জানবে কেমন করে ইতিহাসের রচনা হয়ে থাকে।

ইতিহাস পাঠে এই সমধর্ম্মী পুস্তক অধ্যয়নে আর একটি খুব বড় লাভ হয়ে থাকে। এতে শিক্ষার্থীদের পড়ার অভ্যাস হয়। অনেক পড়ে তার মধ্যে থেকে সারাংশ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি বেছে নেবার সামর্থ্য হয় শিক্ষার্থীদের। কাব্য গল্প কাহিনীর সাথে ঐতিহাসিক সত্য-তথ্যগুলির পার্থক্য নির্ণয় করবার কাজে সাহায্য করে থাকে এরূপ অধ্যয়ন। বহু মিথ্যার ভেজাল থেকে আসল সত্যের রূপটি চিনে নিতে ক্ষমতা হয় এরূপ অধ্যয়নের মাধ্যমে।

সমধর্ম্মী পুস্তক অধ্যয়ন সম্বন্ধে কতকগুলি মূলনীতি আমাদের মনে রাখতে হবে। সমধর্ম্মী পুস্তকের অধ্যয়ন শিক্ষক মশায়ের নির্দ্দেশ মত হবে। শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তক পাঠের পাশাপাশি এটি হবে, যাতে করে এটি প্রাসঙ্গিক হয়। তাছাড়া এলো মেলো অগোছালো হলে তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই ধরনের পাঠ যেন শিক্ষার্থীদের বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। সব বিষয়ে নজর রেখে, অন্যান্য বিষয় পড়বার অবকাশ বা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে, এই পাঠের পরিমাণ ঠিক করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের সময়ের অভাব যেন না হয়। শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে কেবল ঐতিহাসিক গল্পগাথা, ঐতিহাসিক নাটক উপন্যাসই যেন শুধু না পড়ে। সমধর্ম্মী পুস্তক পাঠ যে শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন নয়। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবার জন্যে, শ্রেণীকক্ষে বিশেষ কোনো পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্যে, শিক্ষক মশায় নিজেও সমধর্ম্মী পুস্তক থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে কিছু পড়ে শিক্ষার্থীদের শোনাতে পারেন। শিক্ষক মশায় যদি ভালো পড়তে পারেন তো তিনি নিশ্চয়ই পড়বেন। এতে পঠন-পাঠনে নাটকীয় আবেদন আসে। শিক্ষার্থীদের যেগুলি পড়তে বলে দেওয়া হবে সেগুলি তারা পড়ছে কিনা তা ঠিকভাবে দেখবার জন্যে আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে শ্রেণীকক্ষে, নির্দ্দিষ্ট পাঠ শেষ করার পর। কোন্ শিক্ষার্থীর উপর সমধর্ম্মী পুস্তক পাঠ কি রকম প্রভাব বিস্তার করছে তার পরিচয় পাবার জন্যে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে দেবার সুযোগ থাকবে। যে যে পুস্তক বা অধ্যায় বা কাহিনী বিদ্যার্থীদের পড়তে হবে সেগুলি যেন তাদের পক্ষে যথোপযুক্ত হয়। তাদের মনীষার মান অনুপাতে সেগুলি যেন খুব দুরূহও না হয়, আবার খুব সহজও যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের স্কুলের শ্রেণীর মান ও মনীষার বিকাশ অনুসারে ইতিহাসের যথাযথ সমধর্ম্মী পুস্তক নির্ব্বাচন করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি নানা কারণে সুকঠিন। আমাদের দেশে বিশেষ করে এ কথাটি প্রযোজ্য এই জন্যে যে এই ধরনের পুস্তক এখানে বিরল। আমাদের দৃষ্টি এই ধরনের পুস্তক সৃষ্টির দিকে আজও বিশেষ পড়েনি। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও এই ধরনের পুস্তকাদি পড়ার সময় করে নেওয়াও শিক্ষার্থীর কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। স্কুলের "টাইমটেব্‌লে" এর জন্যে সময় করাটাও আর এক সমস্যা। এই ধরনের পুস্তক কেনার জন্যে অর্থ ও সদিচ্ছা থাকা চাই। স্কুলে ভাল গ্রন্থাগার ও উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক থাকাও এর জন্যে প্রয়োজন নিশ্চয়ই হবে।

এগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি প্রশ্ন এই ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে। এই ধরনের পাঠ কোনো একটি শ্রেণীতে অধ্যয়নরত সব শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন হবে, কি, কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী এর থেকে বাদ পড়বে; যাদের এ ধরনের বই পড়তে বলা হবে তারা সকলেই এক ধরনের বই পড়বে, না, তার মধ্যে তারতম্য থাকবে; এই রকমের অধ্যয়ন অল্প কয়েকখানি বইএর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, না, তা সীমাবদ্ধ না থেকে যতো পারা যায় ততো বই পড়ানো হবে—এই রকমের নানা প্রশ্ন এবং সমস্যা আছে। এ সবের সমাধান অবশ্য ইতিহাসের শিক্ষক মশায় প্রধান শিক্ষক-মশায়ের সাথে যুক্তি করে, স্থান কাল পাত্র বিচার করে, স্কুলের আর্থিক সঙ্গতি, গ্রন্থাগারের সুবিধে অসুবিধে বিচার করে,—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন। সমধর্ম্মী পুস্তক অধ্যয়ন (collateral reading) আসলে কি এবং কি তার উদ্দেশ্য আর কি করে তার থেকে কি কি উপকার পাওয়া যায় এ ধারণা স্পষ্ট থাকলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কোনো অসুবিধে হবে না এ আশা আমরা করতে পারি।

ইতিহাস পাঠ ও শিক্ষার্থীর জীবন অভিজ্ঞতার—সাথে তার সংযোগ (Learning by doing in history teaching) :—

শুধু ইতিহাসের কেন, যে কোনো বিষয়েরই পাঠ্যবস্তু হোকনা কেন, শিক্ষার্থীর জীবন-অভিজ্ঞতার সাথে সেটির সংযোগ সাধন না হলে শিক্ষা যথাযথ হয় না। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হয়েই যে কোনো বিষয়ের শিক্ষা সার্থক হয়, শিক্ষার সাঙ্গীকরণ হয়। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগের অভাবে সফল ইতিহাস পঠন-পাঠনের হাজারো চেষ্টা নিরর্থক, শিক্ষক মশায়ের বক্তৃতা, হাতমুখ নাড়া সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়। সেটা তখন বাইরে থেকে চাপানো ভূতের বোঝার সামিল। তর্জ্জনে গর্জ্জনে, ভয়ে

লজ্জায় সে বোঝা শিক্ষার্থীরা হয়তো সাময়িক ভাবে বয়; কিন্তু মন তাতে সায় দেয় না। তাই সময় পেলেই সে বোঝা মনের অন্তঃপুরের প্রবেশ পথে না নিয়ে গিয়ে তার বহির্গমনের পথে ধুলায় নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর মন তা গ্রহণ করে না।

আজকে শিক্ষা বিজ্ঞানের গোড়ার কথা তাই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা। শিক্ষার্থী নিজেই শেখে তার জীবন-অভিজ্ঞতার সাথে নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত করে। শিক্ষক মশায় তাকে সাহায্য করেন মাত্র। অভিজ্ঞতা আসে কাজের মাধ্যমে। কোনো জিনিস দেখলে আর শুনলে সেগুলি যথাক্রমে উদাহরণ ও উপদেশের পর্য্যায়ে পড়ে, হাতে নাতে কাজ করলে হয় অভিজ্ঞতা। দেখে শেখার থেকে কাজ করে শেখা অনেক পাকা শেখা। কাজের মধ্যে দিয়ে শেখা (Learning by doing) তাই শিক্ষা বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার নামান্তর মাত্র।

আমরা আমাদের শ্রেণী কক্ষের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করে তারা কাজ-পাগল। তারা যখন কোনো কাজ পায় তখন চোখে মুখে উদ্যমের দীপ্তি চক্‌মক্ করে, কর্ম্মচাঞ্চল্যে আর ঐকান্তিক অভিনিবেশে শ্রেণী-কক্ষের পঠন-পাঠন ভরে উঠে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন হয় প্রাণোচ্ছ। কাজের অনুপস্থিতিতে শিক্ষার গতি হয় শ্লথ, শিক্ষকমশায়ের একটানা বলা আর শিক্ষার্থীদের শোনার পালা, তাতে পঠন-পাঠন ঝিমিয়ে পড়ে। শিক্ষক-মশায়ের জলদগম্ভীর কণ্ঠও তাকে জাগিয়ে রাখতে পারে না। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে কিছু শিখতে সাহায্য করতে হলে তাদের যে কাজ দিতে হবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য।

এই কাজ নিছক মানসিক হতে পারে, আবার কায়িক হতে পারে। কায়িক কাজের সাথে মানসিক কাজ যুক্ত হয়ে মানসিক-কায়িক হতে পারে। আমরা যে ধরনের কাজের কথা এখানে বলতে চাইছি সেটি নিছক কায়িক পদবাচ্য হতে পারে না,—তার সাথে কিছু না কিছু মানসিক কাজ যুক্ত থাকবে। একটির উপর অন্যটির অপেক্ষা জোর (Emphasis) দেবার তারতম্যের উপর ভিত্তি করেই আমরা এই দুটি মোটামুটি ভাগ করবার কথা বলছি। ইতিহাস পঠন-পাঠনে কি ধরনের কাজ আমরা দিতে পারি, কি ধরনের কাজ ফলপ্রসূ হতে পারে? শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনের সময়ের দিকে চেয়ে, শিক্ষার্থীদের কাজ দেবার জন্যে আবশ্যকীয় উপকরণ সরঞ্জাম, স্কুলের পরিবেশ, শিক্ষার্থীর মনীষার মান প্রভৃতি সব দিক বিচার

করে আমাদের স্কুলগুলিতে কি ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা ইতিহাস পঠন-পাঠন সার্থক করে তুলতে পারি সেই কথাই আমরা এখানে বিবেচনা করে দেখবো। এই প্রসঙ্গে আমরা যেন ভুলে না যাই যে বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ স্কুলেই কাজ করবার পালা শিক্ষকমশাইরা নিজেদের ঘাড়েই নিয়ে থাকেন। শিক্ষার্থী সেথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব শ্রোতা এবং দর্শক। পঠন-পাঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ শিক্ষার্থীর নেই। বিশেষ করে ইতিহাস পঠন-পাঠনের বেলায় এটি আরও বেশী করে প্রকট। ইতিহাস পঠন-পাঠনে তো বক্তৃতাই একমাত্র পদ্ধতি যেটি ইতিহাসের শ্রেণী কক্ষে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শিক্ষকমশায়ের বক্তৃতার মধ্যে শিক্ষার্থীর নিজের কাজ করার অবকাশ কোথায়?

শিক্ষার্থীদের বয়েসের হিসেবে বা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষার বিভিন্ন স্তর হিসেবে, যথা—প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক (দশম মান পর্য্যন্ত স্কুলগুলিকেও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ধরে), ভাগ করে, সেই সেই স্তরে কি ধরনের কাজ আমরা শিক্ষার্থীদের করতে দিতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা করলে আলোচনার সুবিধে হবে। এখানে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কি কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে তাই আমরা দেখবো।

প্রাথমিক স্তর ঃ—

প্রাথমিক স্তরে ইতিহাস উপস্থাপনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কি হবে তার উপর নির্ভর করবে উপস্থাপনের বিষয়বস্তু। কি প্রকৃতির বিষয় বস্তু উপস্থাপিত হবে, তার সাথে কি ধরনের কাজ এই স্তরে শিক্ষার্থীদের করতে দেওয়া হবে সেটি নির্ভরশীল। প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস উপস্থাপনকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম ভাগে শিক্ষার্থীর পরিবেশ পরিচিতি এবং তার সাথে ইতিহাস এই বিষয়টির প্রতি অনুরাগ সঞ্চার ও পরিচয় করবার কাজ (এই প্রসঙ্গে "ইতিহাসের উপস্থাপন" এই অধ্যায়ে, প্রাথমিক স্তরে ইতিহাস উপস্থাপন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)। দ্বিতীয় ভাগে ইতিহাসের পঠন-পাঠন শুরু। কি ধরনের বিষয়-বস্তু এখানে উপস্থাপিত হবে সেটি "ইতিহাসের উপস্থাপন—প্রাথমিকস্তর" এই আলোচনা থেকে দেখে নেওয়া ভাল।

এই স্তরে সাধারণতঃ শিক্ষার্থী চঞ্চল। তার মনে এই সময় আছে বিস্মিত কৌতূহল আর কল্পনার রঙ্। এ দুটিকে কাজে লাগিয়ে পাঠে তার উৎসাহ সঞ্চার করা যায়, অভিনিবেশ ও আনা যায়; কিন্তু সে অভিনিবেশকে জিইয়ে রাখা দুরূহ। মানুষের মনে অভিনিবেশ ঘন ঘন বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে। এই সময়

শিক্ষার্থীর মনে দল বেঁধে, একজোটে কাজ করবার আগ্রহ থাকে একান্ত প্রবৃত্তিগত ভাবে। কাজের মধ্যে দিয়ে পাঠে অভিনিবেশকে জিইয়ে রাখা যায়। তাই এই সময় শিক্ষার্থীকে অপরাপর শিক্ষার্থীর সাথে দল বেঁধে কাজ করতে দিতে পারলে ফল ভাল হয়। কিন্তু দল বেঁধে কি কাজ করতে দিতে পারা যায়?

দলবেঁধে কাজ করবার কথা মনে হলেই ছোটো খাটো প্রোজেক্টের কথাই মনে আসে। এই সময়ে শিক্ষার্থী যা পড়ে, যে যে বিষয়ের গল্প শোনে সেই সব বিষয় সংক্রান্ত জিনিস আঁকার কাজ, মডেল তৈরী করার কাজ প্রভৃতি দিতে পারা যায়। প্রথমেই পরিবেশ পরিচিতির সময় স্থানীয় ইতিহাস বা শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশ থেকে যথাযোগ্য কিছু কিছু বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করে সেগুলির থেকে এই কাজ করতে দিতে পারা যায়। শিক্ষার্থী একটু বড় হলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন মানবের সম্পর্ক যুক্ত নানা ধরনের জিনিস আঁকতে পারে, তাদের মডেল তৈরী করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ গুহা-মানুষের আবাসস্থল, মানুষের যানবাহন, অলঙ্কার, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, নানারকমের পুতুল, তীরধনু, ঢাল তলোয়ার, বর্শা, দুর্গ, মন্দির গির্জ্জা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। যেখানে মডেল তৈরী করার সুবিধা আছে সেখানে মডেল তৈরী করা, যেখানে আঁকা সম্ভব সেখানে আঁকা। এ কাজে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উৎসাহ থাকে।

সংগ্রহ করার কাজটিও মূল্যবান। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের জিনিসের ছবি সংগ্রহ করা, সেটি একটি ভাল খাতায় আঠা দিয়া আটকে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। বিভিন্ন দেশের মানুষের ছবি, তাদের সাজ-পোষাক, যানবাহন, পুতুল, গৃহপালিত ও বণ্য পশু, পাখী প্রভৃতির ছবি সংগ্রহ করা খুব ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে অনেকে বিভিন্ন দেশের ডাক টিকিট সংগ্রহের কথাও বলে থাকেন। এই কাজগুলি সুসংবদ্ধ ভাবে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই আঁকা, মডেল তৈরী করা প্রভৃতি কাজে ইতিহাসের Developmental approach অনুসরণ করা অনেকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে থাকেন।

এছাড়া শ্রেণীকক্ষে গল্প বলার কাজও অনেক সময় করা যায়। কোনো বিষয়ের সম্বন্ধে শিক্ষকমশায় হয়তো গল্প বলেছেন, কি শিক্ষার্থী হয়তো কিছু পড়েছে,—এই সব বিষয়ের গল্প শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে দিয়ে মাঝে মাঝে বলানো যেতে পারে। সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থী গল্প বলবে। একই গল্প যেন একটির পর একটি শিক্ষার্থী পুনরাবৃত্তি না করে। পৃথক গল্প

বলবে পৃথক শিক্ষার্থী। এই কাজের মধ্যে দিয়েও যথেষ্ট প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয় শ্রেণীকক্ষে। তবে একাজ করা সম্ভব যখন কিছুটা পড়াশোনা শ্রেণীকক্ষে এগিয়ে গেছে। প্রয়োজন হলে শিক্ষকমশায় গল্প নির্ব্বাচিত করে দিতে পারেন। হাতে সময় দেখে গল্পের সংখ্যা ঠিক করে নিতে হবে। সব ছাত্রকেই যে একদিনে বলতে হবে এমন কোনো অর্থ নেই। কার কবে বলার পালা হবে সেটি শিকক্ষমশায় ঠিক করে দেবেন।

নাটকাভিনয়ের একটি বিশেষ অবদান শিক্ষাপদ্ধতিতে আছে। দল বেঁধে কাজ করবার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। এটি অবশ্য আগে থেকে ভেবে চিন্তে সুপরিকল্পিত ভাবে করা যায়, আবার শ্রেণীকক্ষে হঠাৎ তার রূপদেবারও ব্যবস্থা করা যায়। আগে থেকে ভেবে চিন্তে সুপরিকল্পিত ভাবে নাটকাভিনয় করাটার মধ্যে শিক্ষার্থী কাজ করবার, নিজেকে তৈরী করবার অধিকতর সুযোগ পায়। অনেক সময় এই ধরনের নাটকাভিনয়ে, মঞ্চ, মঞ্চসজ্জা, দৃশ্য, সাজপোষাক প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসই শিক্ষার্থীরা শিক্ষকমশায়ের তত্ত্বাবধানে করে থকে। এতে তাদের দলবেঁধে কাজ করবার শিক্ষা হয় ও শক্তি বাড়ে, আর কাজটি সুপরিকল্পিত ভাবে করবার অবকাশ পায় বলে সেটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

দল বেঁধে কাজ করার তালিকায় শিক্ষা ভ্রমণ (স্থানীয় পরিবেশে, কি ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত কোনো স্থানে, কি জাদুঘরে বা সংগহশালায়,) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এতে শিক্ষার্থীরা প্রাণ পায় আর পঠন-পাঠনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

দল বেঁধে কাজ করা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও শিক্ষার্থীকে এই সময়ে কিছু কিছু কাজ দেওয়া যায়। এই ব্যক্তিগত ভাবে করার জন্যে অনেকে শিক্ষার্থীর "নোট বুকের" কথা বলে থাকেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটি নোট বুক থাকবে। তার একদিকে থাকবে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু, কখনো গল্পের আকারে কখনো বর্ণনার আকারে,—আর একদিকে থাকবে বিষয় সংশ্লিষ্ট ছবি, শিক্ষার্থীর নিজ হাতে আঁকা।

এছাড়া মানচিত্র অাঁকাও অনেকের মতে এই সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে ভাল। শিক্ষার্থীর কাছে পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষের "out line map" থাকবে। ম্যাপে রঙ দিয়ে বিভিন্ন দেশের অবস্থান বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক বিভাগ, রাজনৈতিক ভাগ, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি সে চিত্রিত করবে। এই স্তরের দ্বিতীয়ভাগে শিক্ষার্থীকে কিছু লিখতে দিতে পারা যায়। কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ,

কোনো ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণ করবার নিজের অভিজ্ঞতা, এই সব জিনিস শিক্ষার্থীকে লিখতে দিতে পারা যায়। কেউ কেউ এই স্তরে শিক্ষার্থীদের "ডায়েরী" লেখবার কথাও বলে থাকেন।

নিম্নমাধ্যমিক স্তর :—

এই স্তরে শিক্ষকমশায়ের হাতে তিন বছর। কি ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হবে, কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে এই সব আলোচনার জন্যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের উপস্থাপন এই অধ্যায়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে আমাদের স্কুলের অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কি ধরনের কাজ দেওয়া যেতে পারে আমরা সেইটিই দেখবো।

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কাজ।—এই স্তরে যে শিক্ষার্থীরা পড়ে তাদের বিচার শক্তির কিছু কিছু উন্মেষ ঘটেছে। তারা কিছু তথ্য চায়। কোনো ঘটনার কারণ সম্বন্ধে তাদের মনে জিজ্ঞাসা জাগে। তাদের মনের দিগন্ত দ্রুত প্রসারিত হয় অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে। তাই তাদের মনের চাহিদা মিটিয়ে ইতিহাসের বিষয় বস্তুর সাথে পরিচয় সাধন করবার জন্য এই সময় পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সমধর্ম্মী পুস্তক পাঠ শিক্ষার্থীদের করতে দিতে পারা যায়। সমধর্ম্মী পুস্তক অবশ্য কার পক্ষে কোন্‌টি যথাযথ হবে সেটি ঠিক করে দেবেন শিক্ষকমশায়। সমধর্ম্মী পুস্তকপাঠ যেন এলোপাথাড়ি না হয়, এই ধরনের পুস্তক নির্ব্বাচন যেন সুপরিকল্পিত ও যথাযথ হয় সেদিকে শিক্ষকমশায় দৃষ্টি রাখবেন।

এই স্তরে অনেকে ইতিহাসের উপাদান সম্বলিত ও তথ্য-যুক্ত পুস্তকও শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবার পক্ষপাতী। যে উপাদান থেকে ইতিহাসের রচনা সেই সব উপাদান এবং তাদের ব্যাখ্যা এবং পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করলে যে উপায়ে ইতিহাসের সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেটির সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটবে, তাদের মনের উপস্থিত কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাবে, তাদের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে তুলবে।

এই স্তরে শিক্ষার্থীদের কিছু কিছু লিখতে দিতেও পারা যায়। লেখা রচনামূলক হবে। লেখায় মননশীলতার ছাপ থাকবে। লেখা যাতে করে বিশ্লেষণাত্মক হয় তার দিকে শিক্ষকমশায় দৃষ্টি দেবেন। এর আগের স্তরে ছিল শিক্ষার্থীদের মনে অসংলগ্ন চিন্তার ভিড়, অথচ প্রকাশের তীব্র আকাঙ্খা। সেই অসংবদ্ধ চিন্তাকে সুসংবদ্ধ ভাবে প্রকাশ করবার যেমন শিক্ষা হবে একদিকে, অন্যদিকে নিজেকে প্রকাশ করবার আনন্দে শিক্ষার্থীর মন ভরে উঠবে।

নানা রকমের হাতের কাজের মধ্যে মডেল তৈরী করাটা এই স্তরে যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। মডেল তৈরী করা ছাড়াও ছবি আঁকা, মানচিত্র আঁকা, বিভিন্ন ধরনের লেখ তৈরী করা (সময় রেখা, চার্ট, ডায়াগ্রাম প্রভৃতি) এই স্তরের শিক্ষার্থীদের এক দিকে যেমন শিক্ষাপ্রদ অন্যদিকে তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুভূতি।

নোট নেওয়া, নোট তৈরী করা, এবং শিক্ষার্থীদের নোট বুক সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র (মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস উপস্থাপন এবং ইতিহাস পঠন পাঠনে কয়েকটি বাস্তব কথা এই অধ্যায়ে নোট নেওয়া ও নোট তৈরী করা এই শিরোনামায়) বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তাই সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের দল বেঁধে কাজ করা (co-operative work)—

এই ধরনের কাজের জন্যে আমরা তর্ক ও আলোচনা, নাট্যাভিনয়, শিক্ষা-ভ্রমণ, নানা জিনিসের সংগ্রহ, স্কুলে ইতিহাস ক্লাব সংগঠন এবং তার মাধ্যমে বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, ইতিহাস-বুলেটিন প্রভৃতি প্রকাশ করা, স্কুলে প্রদর্শনী করা, প্রভৃতি কাজের নাম উল্লেখ করতে পারি। এগুলি ছাড়াও নানা রকম ঐতিহাসিক বিষয় সংশ্লিষ্ট জিনিসের মডেল তৈরী করার প্রোজেক্ট নিতে পারা যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত কিছু কিছু বিষয় বস্তুর ক্রমবিবর্তন দেখিয়ে সেগুলি আঁকার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে—যেমন যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র, সাজপোষাক, গৃহ প্রভৃতি। এ ছাড়া ঐতিহাসিক চিত্র দেখে সেগুলি আঁকবার কথাও অনেকে বলে থাকেন।

উচ্চমাধ্যমিক স্তর ঃ—

এই স্তরেও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কাজ এবং দল বেঁধে, সমবায়ের ভিত্তিতে যে সমস্ত কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেগুলির সম্বন্ধে "উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস উপস্থাপন" এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সে আলোচনা তাই এখানে পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে আমাদের বলার কথা এই যে খোলা মন, ঐকান্তিকী ইচ্ছা, এবং পেশাগত দায়িত্ব নিয়ে এই কাজে এগিয়ে এলে শিক্ষকমশায় নিজেই দেখতে পাবেন যে কতো রকমের কাজ আছে যেগুলি হাজারো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দিয়ে করানো যেতে পারে। আর এই সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়েই পাঠ্য বিষয় বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর জীবন-অভিজ্ঞতার সংযোগ করা সম্ভব হবে, ইতিহাস পাঠের যা উদ্দেশ্য সেটি এই সব কাজের মধ্যে দিয়েই সাধিত হবে, কাগজে কলমে ইতিহাস-পাঠ্যক্রমের যা পরিকল্পনা তা বাস্তবে পরিণত করতে পারা যাবে, আর শ্রেণীকক্ষে ইতিহাসের রূপায়ণ সম্ভব হবে।

শ্রবণ-দর্শন গ্রাহ্য "টিচিং এইড" সমূহ (audio visual aids) :—

"Audio visual aids" বলতে সঠিক কি বুঝায় সে সম্বন্ধে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। অনেকে আছেন যাঁরা এগুলির সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন। ইংরাজী শব্দগুলির অবিকল অনুবাদ করবার ভুল প্রয়াসে অনেকে মনে করে থাকেন যে এই "টিচিংএইড" গুলি একসঙ্গে শ্রবণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। ব্যাপক ভাবে ধরলে "audio-visual aids" শিক্ষক মশায়ের বক্তৃতা থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক, ব্ল্যাকবোর্ড এবং অপরাপর যাবতীয় টিচিংএইড, যেগুলির সাহায্য ইতিহাস পঠনপাঠনে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সবগুলিকেই বুঝায়। এমনি ব্যাপক ভাবে না নিয়ে কেউ কেউ এগুলির অর্থ কিছুটা সীমিত করে নেবার পক্ষপাতী। তাঁরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধরনের "টিচিংএইডের" মধ্যেই এই ধারণাটি সীমাবদ্ধ রাখতে চান। তাঁদের মতে আধুনিক কালের উদ্ভাবিত কয়েকটি বিশেষধরণের টিচিংএইড যেমন চলচ্চিত্র, "ফিল্মষ্ট্রীপ" "টেলিভিসান" "রেডিও" "রেকর্ড" নানারকম চার্ট ডায়াগ্রাম লেখ প্রভৃতি, মডেল, শিক্ষা ভ্রমণ, নাট্যরূপায়ণ, এই সবগুলিই andio visual aids এর তালিকাভুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত।"Audio visual aids" এর অনূদিত অর্থ শ্রবণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য "এইড" সমূহ ; একসঙ্গেই যে এগুলিকে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ও দর্শনইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এখন এগুলিকে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করবেন কি অধিকতর আধুনিক কালের উদ্ভাবিত অনুরূপ "এইড" এর মধ্যে ফেলবেন কিংবা শিক্ষাবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সংস্কৃত এবং নবায়িত টিচিংএইড গুলির গণ্ডিতে সীমায়িত রাখবেন সেটির বিচার নিজেরাই করে নিতে পারবেন।

বলাবাহুল্য যে পঠনপাঠন ফলপ্রসূ করতে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন সহজ সাবলীল ও প্রাণময় করে তুলতে এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যাআহরণ সাফল্য মণ্ডিত করতে এই সাহায্যগুলি শিক্ষকমশায় গ্রহণ করে থাকেন। রূপে রসে বর্ণে-গন্ধে সমৃদ্ধ এই পৃথিবীর পরিবেশ, তার সঙ্গে পরিচিতি মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। যে কোনো জিনিসের সম্বন্ধেই ধারণা আমাদের হয় অমোদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই নানা পরীক্ষা চলছে কতো সহজে, কতো দ্রুত, কোনো বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে ধারণা শিক্ষার্থীদের মনে গড়ে তুলতে পারা যায় সেই সম্বন্ধে। সেই জন্যেই পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীর একাধিক ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষায় নানা

তথ্যও আমরা জানতে পেরেছি। এই সম্পর্কে Joseph J. Weber সাহেবের একটি পরীক্ষার কথা (Comparative Effectiveness of some Visual aids in Seventh Grade Institution) উল্লেখযোগ্য। এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যে সমস্ত ধারণা আমাদের মনে গড়ে উঠে তার ৪০% দর্শন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, ২৫% শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, ১৭% স্পর্শের দ্বারা, ১৫% বিবিধ অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদির অনুভূতির মাধ্যমে, এবং ৩% আঘ্রাণে আর আস্বাদনে। এই পরীক্ষা থেকে শ্রবণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দর্শনইন্দ্রিয় গ্রাহ্য "টিচিংএইডস" সমূহের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

দেখার মধ্যে দিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা আসে, কোনো বিষয়ের নতুন প্রতিরূপ মনে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু শোনায় পূর্ব্ব অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বস্তুর ধারণা থাকে অনড়, নতুন ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে পারেনা। মধ্যযুগের কোনো দুর্গ, কি প্রাচীন কালের মনুষ্য ব্যবহৃত কোনো তৈজস পত্র দেখলে যেমন তাদের সম্বন্ধে ধারণা সহজ হয়, নতুন প্রতিরূপের গতিশীলতা অভিজ্ঞতার মাধ্যম্যে ধারণায় স্বচ্ছতা আনে, শোনায় সেটি হয় না। দেখার পর বর্ণনায় আরো বেশী কাজ হয়।

এখানে আমাদের আলোচনা দীর্ঘতর না করে "টিচিং এইডস-এর সাধারণ ধারণা" ও "ইতিহাস পঠন-পাঠনের টিচিংএইড্‌স্" এই দুটি আধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ইতিহাসের উপস্থাপন

ইতিহাসের পাঠ্যক্রমকে ইতিহাস পড়ানোর আদর্শের প্রতীক বলা হয়ে থাকে। পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের বিষয় বস্তুর নির্ব্বাচন ও বিন্যাসের মধ্যেই ইতিহাস পড়ানোর আদর্শের একটি মূল কাঠামোর সংশ্লেষ। পাঠ্যক্রমে তাই পড়ানোর উদ্দেশ্য প্রতিফলিত। সেই আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের রূপায়ণ হয় পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত-বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের মাধ্যমে। "থিওরীর" সুদূর প্রসারী অভিক্ষেপ আধৃত থাকে কাগজে কলমে পাঠ্যক্রমের সংবিন্যাসে' আর উপস্থাপনে হয় তার বাস্তব রূপায়ণ। পাঠ্যক্রম আদর্শে পৌছানোর পরিকল্পনা, উপস্থাপন তার বাস্তবে প্রয়োগ। উপস্থাপন তাই পাঠ্যক্রমের বাস্তব রূপায়ণ এবং পদ্ধতির প্রায় সবটুকুই জুড়ে বসে আছে।

পদ্ধতির সম্বন্ধে সাধারণভাবে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করলেও উপস্থাপন সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। প্রয়োজন আছে অবশ্য নানা কারণে। যে বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর ক্রমিক পরিণতি ঘটে, শিক্ষার্থীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলির সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়ে, তাদের প্রভাব প্রাদুর্ভাবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ইতিহাসের উপস্থাপন শিক্ষার্থীর কাছে সংসাধিত হলে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য লাভ সুগম হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থী তার জীবনের কতখানি সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবার জন্যে থাকবে অর্থাৎ কত বছর তার স্কুলের জীবন চলবে তার উপর যেমন পাঠ্যক্রম রচনা নির্ভর করে তেমনি উপস্থাপনও নির্ভর করে। পৃথিবীর সবদেশে শিক্ষার্থীদের স্কুলের জীবন সমান দীর্ঘ নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি নানাবিধ কারণে তা ভিন্ন। যেখানে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের জীবন দীর্ঘ সেখানে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপস্থাপন হবে একরকম, আর যেখানে তার বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব সেখানে উপস্থাপন হবে অন্যরকম।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের দেশের অবস্থার দিকে চেয়ে আমরা ইতিহাস উপস্থাপন করবার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা পরিকল্পনা ও বাস্তবে প্রয়োগক্ষম উপায়গুলির কথা চিন্তা করে দেখবো। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ত্তমান কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা-

কালটি প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এই তিনটি স্তরে বিভক্ত এবং শিক্ষার্থীর সতের বছর বয়েস পর্য্যন্ত প্রসারিত। ছয় থেকে এগার বছর বয়েস অবধি প্রাথমিক, বারথেকে চোদ্দো বছর পর্য্যন্ত নিম্নমাধ্যমিক, পনর থেকে ষোল-সতর বছর পর্য্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক। আমাদের সংবিধানে চোদ্দো বছর বয়েস পর্য্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করবার কথা বলা হয়েছে। এখনও নানা কারণে তা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। বর্ত্তমানে ১১+ বছর পর্য্যন্ত শিক্ষাকে আবশ্যিক করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা কিন্তু এখানে এই বিষয়টির উপর বিশেষ কিছু গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (অষ্টম মানের পর থেকেই শিক্ষা কালকে উচ্চমাধ্যমিক ধরে) এই তিনটি স্তরে ইতিহাসের উপস্থাপন কেমন হবে সেই বিষয়ই আলোচনা কোরবো।

ইতিহাসের উপস্থাপন

প্রাথমিক স্তর

শিক্ষার্থীর জীবনে ছয় থেকে এগারো,—এই কয়টি বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবনে অসীম প্রভাব, জীবনের এই অধ্যায়ের সূচনার কয়টি বছরের। ইতিহাস শিক্ষককে সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে তিনি শুধু ইতিহাসই শিক্ষা দিচ্ছেন না, তিনি শিক্ষার্থীকে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষালাভে সাহায্য করছেন। তাই তাঁর নিজের বিষয়কে যেমন তিনি ভুলবেন না, তেমনি তিনি ভুলবেন না শিক্ষার্থীকে। শিক্ষার্থীর এই বয়েসের মনের অবস্থা তাঁকে সম্যক জানতে হবে। তাঁর নিজের জীবনে এই ক'টি বছরের কথা তাঁর নিজের পক্ষে মনে করা শক্ত। তাই তাঁকে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের গবেষণা লব্ধ ও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় উপনীত সিদ্ধান্তগুলি মনে রেখে তাঁর শিক্ষক জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করে নিতে হবে। শিক্ষার্থীর জীবনের এই সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলির সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না থাকলে তাঁর পক্ষে কর্ত্তব্য সমাধা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাঁকে জানতে হবে কি ধরনের আবেগ প্রক্ষোভের দোলায় দুলে দুলে এই সময় মনের পরিণতি সাধিত হতে থাকে। কৌতূহলের কোন্ অতলস্পর্শী সাগর উদ্বেল হয়ে উঠে শত তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, প্রশ্নের পর প্রশ্নে; কল্পনার কোন্ পক্ষিরাজ রথে চড়ে শিক্ষার্থীর মন ক্ষণে ক্ষণে পার হয়ে যায় তেপান্তরের মাঠ; কতোশতো বাঁধনহীন, সংগতিহীন, চিন্তার ভিড় ঠেলে প্রকাশহীন ভাবের অ-গোছালো আত্মপ্রকাশের চেষ্টা। এগুলির সংবাদ রাখা এবং এগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলা যে শক্ত কাজ তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। অথচ একাজ ইতিহাসের শিক্ষককে করতেই হবে। তা না হলে তাঁর কাজ হবে অর্থহীন। ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে আমরা বলতে পারি যে শিক্ষার্থীর জীবনে এই কটি বছরের ইতিহাস পঠন-পাঠনের একটি বিশেষ অবদান আছে, আত্যন্তিক প্রয়োজনে উদ্ভাবিত একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তাই এই সময়ে ইতিহাস শিক্ষকের কাজ একদিকে যেমন দুরূহ, অন্য দিকে তেমনি দায়িত্বপূর্ণ। ইতিহাস-শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবার সুযোগ আছে, আবার গুরু দায়িত্ব পালনের দুরূহ সমস্যাও আছে এখানে! তাই এই স্তরে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের ধারা সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু জানা থাকলে

ইতিহাস-শিক্ষকমশায়ের গুরু দায়িত্ব পালন সহজ হয় এবং শিক্ষার্থীর জীবন ভোর শিক্ষার যে ভিত্তি গড়ে দেবার সুযোগ তিনি পান তার সদ্ব্যবহার তিনি করতে পারেন।

প্রাথমিক স্তরে ইতিহাস উপস্থাপনকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম ভাগ ছয় থেকে আট, দ্বিতীয়টি নয় থেকে এগার (পঞ্চম মানকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের অন্তর্গত ধরে)। প্রথম ভাগে শিক্ষার্থীর পরিবেশ-পরিচিতি এবং সাথে সাথে ইতিহাস এই বিষয়টির প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা হবে। শিশুর নিকট পরিবেশের প্রভাব তার জীবনে প্রতুল। যে অদম্য কৌতূহল বালক বিদ্যার্থীর মনে উদ্বেল হয়ে উঠে এই সময় সেটিকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশ পরিচিতির মাধ্যমে ইতিহাসের সাথে তার পরিচয় সংসাধিত করতে হবে। এই পরিবেশ পরিচিতির সার্থক রূপায়ণ হবে ইতিহাসের প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ উদ্দীপনে। কল্পনার তুলি ধরে প্রকৃতি এ সময় শিশুমন রঙে রঙে ভরিয়ে দেয়। তার জের টেনে শিক্ষার্থীর মনে আঁকতে হবে মানুষ জাতের সামগ্রিক একত্বের ছবি। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনে তার চার পাশে মানব সভ্যতার যে নিদর্শন নিচয় সে দেখে, সেগুলি যে যুগ যুগ ধরে মানুষের ক্রমিক এবং ক্রমাগত চেষ্টার ফল, আর সে চেষ্টালব্ধ ফল যে যুগ পরম্পরায় সমগ্র মানবজাতির সমন্বিত অবদানে গঠিত এ ধারণা শিক্ষার্থীর মনে এই সময়েই করে দিতে হবে। দ্বিতীয় ভাগ থেকে অবশ্য যথার্থ ইতিহাসের পঠন-পাঠন। ইতিহাস হেথা শুরু। প্রথম ভাগে যে যে কাজ শুরু করা হয়েছে তার জের টেনে সুষ্ঠু, সুনির্ব্বাচিত ইতিহাসের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত হবে। সুনির্ব্বাচিত এই ইতিহাসের বিষয় বস্তুর মধ্যে শিক্ষার্থীর নিজের দেশের ইতিহাস নিশ্চয়ই থাকবে। বিষয় বস্তুর নির্ব্বাচন নিয়ে অবশ্য মতভেদের অবকাশ আছে। মতভেদের কারণ বিশ্লেষণের গোলকধাঁধার মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি যে জাতীয় ইতিহাসের মোটামুটি কাঠামোটি, ক্রমানুগ পদ্ধতিতে এ সময় উপস্থাপিত করবার প্রয়োজন আছে। মানুষের সামগ্রিক একতার ও উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ইতিহাসটি উপস্থাপিত করবার কথা বলা হয়েছে। এই সূত্রে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই যে দুটি ভাগ প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস উপস্থাপন কালে করা হয়েছে এটি যে সব সময়েই,—এমন কি সাত হাত ছাড়া বজ্রপাত হলেও,—মেনে চলতে হবে এমন কোনো কথা নয়। দেশের ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচন ও উপস্থাপনের স্তর বিভাগ করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত

প্রাথমিকস্তর :—প্রথম ভাগ :—

শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের প্রথম ভাগে (ছয় থেকে আট বছর বয়েসে) তার ইতিহাসের সাথে পরিচিতি এবং ইতিহাস পাঠে উৎসাহ সঞ্চার করবার ব্যাপারে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা প্রায় সর্ব্বজনস্বীকৃত। তার উপায় তাই খুঁজে বের করতে হবে। শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশের কাহিনী, তার বর্ত্তমান কথা এবং অব্যবহিত অতীতের কথা, তার কাছে উপস্থাপন করাটা সব থেকে সোজা রাস্তা। সেই দিক থেকে বিচার করে দেখলে স্থানীয় ইতিহাস, শিক্ষার্থীর নিজ বংশের ইতিহাস, শিক্ষকমশায়ের উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট কাজে লাগবে। এই উপস্থাপনের বাস্তব দিকটাও বেশ অনুকূল। বালক বা কিশোর যে পরিবেশে খেলায় ধূলায়, যাতায়াতে, ভ্রমণ পর্য্যটনে দিনদিন বেড়ে উঠছে তার সাথে তার পরিচয় প্রত্যক্ষ। তার এই প্রত্যক্ষ পরিচিত স্থানগুলির বর্ত্তমান রূপ সে দেখছে। কোথাও দেখছে ভাঙা মন্দির, মস্‌জিদ কি গির্জ্জা; কোথাও দেখছে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিখা, কোথাও বা বিরাট শ্যাওলা দীঘির চারপাশ জুড়ে বছরের একটি সময়ে বহুলোকের সমাগমে 'মেলা'। এসব কেন হয়েছে? কে বা কারা করেছে? কখন এগুলি করা হয়েছে? উঁকি এসব প্রশ্ন শিক্ষার্থীর মনে। বাবা কি ঠাকুরদাদা, মা কি ঠাকুরমা কিংবা কোনো প্রাচীন বা প্রাচীনার মুখে শুনুক সে সব কথা। এসবে অভিজ্ঞতার সাথে কাহিনীর পরিচয় সাধন হয়। স্থানীয় পরিবেশের কাহিনী ছাড়াও শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বংশের কথা জানার মধ্যে দিয়েও তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাথে অতীতকে সংযুক্ত করবার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থী তার বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে অতীতের তুলনা করে তার যাথার্থ্য খুব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এ পন্থা অবলম্বিত হ'লে ইতিহাস আর বই-এ লেখা কাহিনী মাত্র থাকেনা। তাকে কল্পনায় রাঙানো গল্প বলে মনে হয় না। সেটি একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনা বাস্তব জিনিস বলে মনে হয়।

শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশের বা তার বংশের কথা ছাড়াও মানুষের ইতিহাসের সুদূর অতীতের কথা এই সময়ে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে বিদ্যার্থী এই বয়সে আদিম যুগের গুহা মানব এবং তার জীবন যাত্রা সম্বন্ধে জানবার জন্যে স্বভাবতই কৌতূহলী। কল্পনাপ্রবণ বালকের মনে পৃথিবীর আদিম মানবদের কথা জানবার এক দুর্নিবার আকর্ষণ থাকে। শিক্ষার্থী তার কল্পনার রথ ছুটিয়ে চলে

কত শত যুগ পার হয়ে মানব সভ্যতার উন্মেষের প্রথম অধ্যায়ের পটভূমিকায়। নাজানার অবগুণ্ঠন উন্মোচনে তার কৌতূহলী মনে আসে কৌতূহল নিরসনের সার্থকতা। বিশেষ এই আবেদনের জন্তে এই সময় শিক্ষার্থীর কাছে মানুষের আদিম অবস্থার কথা উপস্থাপিত করবার ব্যবস্থা। এই ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার মাধ্যমে ইতিহাস পড়ানোর আর একটি কাজও পরোক্ষ ভাবে হয়ে যায়। মানুষের আদিম অবস্থার কথা তো জাতীয় ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমিত হয়নি। সীমিত হয়নি এইজন্তে যে তখন কোনো দেশের জাতীয় ইতিহাস লেখা হয়নি। তাই এই ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবার মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রাচীন ইতিহাস, সব মানুষের পূর্ব্বপুরুষদের কথা শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। এই উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে এ ধারণা সুস্পষ্ট হয় যে পৃথিবীর সবদেশের সব মানুষেরই অতীত এই একই প্রকারের। এই সাধারণ ও সার্ব্বজনীন উত্তরাধিকারের সহজ সূত্রটি ধরে শিক্ষার্থীর পেলব মনে আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে তোলার কাজটিও সহজ হয়।

এই বয়েসের শিক্ষার্থীরা গল্প ভাল বাসে। তাই তাদের কাছে গল্পের রসে ইতিহাস ভাল জমে। এই গল্পের জাল যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে ঘিরে বোনা যায় তাহলে গল্প আর কল্পনায় রাঙানো অবাস্তব রূপকথা থাকেনা, সেটি জীবন—রসে ভরপুর হয়ে বাস্তব ও বাস্তবধর্ম্মী হয়ে উঠে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে থেকে এমন সব ব্যক্তি চরিত্র সঙ্কলন করে নিতে হবে, তা সে অতীতের হোক কি বর্ত্তমানের হোক, যেগুলির মধ্যে সরস ও সহজ গল্প জমাবার উপাদান আছে; কিংবা যে সব চরিত্রগুলি ঐ সব বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের অনেকখানি অধিকার করে বসে আছে। এই ধরনের গল্পের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের প্রতি সাধারণ কৌতূহল অসাধারণ সাফল্যে জাগিয়ে দেওয়া যায়। এই গল্পগুলির নায়ক যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে থেকে সঙ্কলিত হয়েছে সেই হেতু শুরু থেকেই শিক্ষার্থীর নিজ দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমিত না করে তার মনোভাবকে সারা বিশ্বের পটভূমিকার ঔদার্য্যে আন্তর্জাতিক করে গড়ে তোলবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

আজকে আমাদের দেশে 'ইলেকট্রিক লাইট' হয়েছে, ট্রাম, মোটর, বাস, রেলগাড়ী, এরোপ্লেন হয়েছে। আগে এগুলি ছিল না। শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অতীতে এগুলির প্রচলন ছিল না। বর্ত্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারা অতীতের জীবন ধারার থেকে অনেক পরিবর্ত্তিত,

ভিন্ন। শিক্ষার্থীর প্রাত্যহিক জীবনে যে সব বস্তু নিচয়ের সাথে পরিচয় ঘটে তাদের মধ্যে থেকে প্রধান প্রধান কতকগুলি নির্ব্বাচিত করে তাদের পরিচিতির মাধ্যমে মানুষের বর্ত্তমান জীবন যাত্রা যে অতীতের থেকে পৃথক সেই ধারণা শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা ছাড়া বর্ত্তমান কালের যে মানুষের জীবনধারা, যেটি অতীতের জীবনধারা থেকে বহু ভাবে পৃথক এবং পরিবর্ত্তিত, সেটি যে এক আধ দিনে হয়নি, ঐ পরিবর্ত্তিত জীবনধারা আসতে কেটে গেছে কত শত যুগ সেটিও শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। অতীতে ও বর্ত্তমানে মানুষের এই জীবন ধারার পার্থক্য আর শতশত যুগের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে তার এই বর্ত্তমান পরিণতি সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারা যাবে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবন সম্পর্কিত দুএকটি বিষয়ের উদাহরণ নিয়ে এবং তাদের ক্রমবিবর্ত্তনের কাহিনী নানা ধরনের "Teaching aids" এর সাহায্যে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরলে। এই সম্পর্কে মানুষের খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, যানবাহন, চাষবাস, আমোদ প্রমোদ, লিখন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়গুলির নাম করা যেতে পারে। এই ধরনের কাজের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে যে আমাদের দেশে উপযুক্ত পুস্তক, যাতে এই ধরনের কাহিনীগুলি অনুরূপ ভঙ্গিতে সাজানো আছে এবং "Teaching rids" যে গুলির মাধ্যমে এই কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করতে পারা যাবে, একেবারে নেই বললেই চলে। আমাদের এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। একথা বলা ছাড়া এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলবার নেই।

আমরা পশ্চিম বাংলার লোক যে ভাষায় কথা বলি মাদ্রাজের লোক বা পাঞ্জাবের লোক সে ভাষায় কথা বলে না। শুধু বাক্‌ধারা কেন, আহার্য্য, পোষাক পরিচ্ছদ, পালপার্ব্বন প্রভৃতিরও পার্থক্য আছে তাদের মধ্যে। শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এই পার্থক্য, পৃথিবীর বহুদেশের সাথে বহুদেশের, বহুজাতের সাথে বহুজাতের, আচার আচরণে, বাক্‌ধারায়, সাজে পোষাকে, আহার পানীয়ে নানা রকমের পার্থক্য। এগুলিও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপস্থাপনে বিদ্যার্থীর কাছে পরিষ্কার করে দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে। এ ধারণা পরিষ্কার থাকলে শিক্ষার্থী জানবে যে এই সব পার্থক্য অনেক দিন থেকেই আছে, আর এই সব পার্থক্যের জন্যে মানুষের কোন ক্ষতি সাধিত হবে না, এই পার্থ্যক্যগুলি মানুষের সাথে মানুষের মৈত্রীর ও সৌহৃদ্যের সম্পর্ক সংস্থাপনে কোনো বাধার সৃষ্টি করে না।

শিক্ষার্থীর সাথে ইতিহাসের পরিচয় সংসাধিত করার কালে ইতিহাসের প্রতি

তার অনুরাগ ও কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার প্রসঙ্গে যে যে বিষয়গুলি যে ভঙ্গিতে তার কাছে উপস্থাপিত করা হবে সে কথা বলবার পর এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি ছাড়াও ইতিহাসের সাথে শিক্ষার্থীর পরিচিতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে, ইতিহাসে তার অনুরাগ ও কৌতূহল জাগাতে, শিক্ষক মশায় ইচ্ছা করলে উপযুক্ত বিষয় নিজে নির্ব্বাচন করে নিতে পারেন। তবে বিষয়গুলি যেন যথাযথ হয় এবং উদ্দেশ্য সাধনে যেন সফল হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

এখন আমাদের দেখতে হবে কি উপায়ে শিক্ষকমশায় ইতিহাসের বুকে যে অনাদি অতীত আবৃত সেই অতীতের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটাবেন? কি পদ্ধতি অনুসরণ করে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করবেন যাতে করে এই পরিচিতির মাধ্যমে অতীত সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর কৌতূহলের উদ্দীপন হবে আর এক এবং অখণ্ড মানব সভ্যতার বর্ত্তমান রূপ যে নানা জাতের, নানা দেশের বিচিত্র অবদানে সংগঠিত এই ধারণার সূত্রপাত হবে তার মনে? আমরা জানি যে এই বয়েসের শিক্ষার্থীরা গল্প ভালবাসে। শিক্ষকমশায় এই সময় গল্পের মাধ্যমে বিষয়-বস্তুর উপস্থাপন করতে পারলে ফল ভাল পাবেন। যদি তিনি ভাল গল্প জমাতে পারেন তাহলে তো কথাই নেই। শিক্ষকমশায়কে মনে রাখতে হবে যে তিনি মানুষের অতীত সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে পড়াচ্ছেন না, অতীত সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর কৌতূহল উদ্দীপিত করছেন, অতীতের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করছেন, অতীতের সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় সাধন করছেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বিষয় বস্তুগুলি উপস্থাপিত করছেন সেটিও সব সময়ে তাঁর স্মরণে থাকবে। কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে অন্য দেশের মানুষের সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য শিক্ষার্থীর মনে বিরুদ্ধ মনোভাব দৃঢ়মূল করে দিতে পারে।

এই সময়ে শিক্ষার্থী থাকে একদিকে যেমন প্রাণচঞ্চল অন্যদিকে তেমনি কর্ম্মচঞ্চল, তাই তাকে কাজও এই সময়ে করতে দিতে হবে। কাজের মধ্যে তাকে আঁকতে ও তার আঁকা ছবি রঙ্ করতে উৎসাহিত করা হবে। কিছু কিছু "মডেল" তৈরী করতে দেওয়া, কোনো দৃশ্যের বা অতীতের কোনো ঘটনার বর্ণনা করতে দেওয়াও অনেকে অনুমোদন করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা সময়ের ক্রমকে অনুসরণ করছে কি না তা নিয়ে মাথা ঘামানোর বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই এখানে। শিক্ষকমশায় নিজে সময়ের ক্রম অনুসরণ করবেন বিষয় বস্তুর উপস্থাপনে, তাহলেই যথেষ্ট হবে। অতীতের সম্বন্ধে কৌতূহল ও অনুরাগ সৃষ্টি করা অর্থে যে অতীতের মনোজ্ঞ, বীরত্বপূর্ণ বা রোমাঞ্চকর

কাহিনীর প্রতি কৌতূহল ও অনুরাগ সৃষ্টি নয় এই সহজ সত্যটি শিক্ষকমশায় মনে রাখবেন।¹ যুগযুগ সঞ্চিত মানুষের অভিজ্ঞতায় আর জ্ঞানে, অগণিত মানুষের শ্রম ও গবেষণায়, সংগঠিত মানবকৃষ্টির বিচিত্রসুন্দর অভিব্যক্তির প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরক্তি জাগরিত হবে শিক্ষার্থীর মনে এই সময়।

প্রাথমিক স্তর—দ্বিতীয় ভাগ :—

প্রাথমিক স্তরের দ্বিতীয় ভাগে যথাযথ ইতিহাস পাঠের এবং ইতিহাসের যথাযথ পাঠ শুরু করতে হবে। এই সময় শিক্ষার্থীর বয়েস দশ থেকে বার বছরের মধ্যে থাকবে। এই বয়েসের শিক্ষার্থীকে ইতিহাস সার্থকভাবে পড়াতে গেলে এই বয়ঃসীমার মধ্যে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষার্থীর জীবনে একান্ত ভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলির সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকতে হবে শিক্ষকমশায়কে। এই সময় শিক্ষার্থীরা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; এই বৃদ্ধি দৈহিক এবং মানসিক। কৌতূহল তার মনকে করে উদ্বেল, অশান্ত ; তাই তার জানবার আগ্রহ আগেকার গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রসারিত হয় নানা নতুন নতুন বিষয়ের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে। কাজ করবার শক্তি তার এই সময়ে নবীন উদ্যমে জাগে। সে হয়ে উঠে কর্মচঞ্চল। ভাষার উপর অধিকার পেয়ে বহু জিনিস আয়ত্ত করবার সুযোগ সে পায়, তার সৃজনী প্রতিভা সৃষ্টির নেশায় উদ্বেল হয়। ভাল মন্দ বিচার করে নিজেকে পরিচালিত করবার ক্ষমতা সে কিছু লাভ করে। তার নিজের কাজের পরিকল্পনা করবার, নিজের কাজ নিজে করবার, স্বাধীনতা, নিজের কাজের মূল্যায়ন করবার অবসর, তাকে এই সময় দেওরা ভাল। তারুণ্যের তিলক ধারণ করার প্রাক্কালে দুঃসাহসের এবং রোমাঞ্চের প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে শিক্ষার্থী এই বয়েসে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যা প্রভেদ (individual difference) তা এই সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাই এই সব দিকগুলি বিচার বিবেচনা করে ইতিহাস পঠন-পাঠন এই সময় যথাযথ ভাবে পরিচালিত হলে ইতিহাস পাঠের যা অবদান, শিক্ষার্থীর জীবনে তা কার্য্যকরী হয়। এই স্তরে ইতিহাস পাঠের যা বিশেষ আবেদন আছে সেই আবেদনে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সাড়া দিতে পারলে ইতিহাস পাঠ সার্থকতায় ভরে উঠে। তাই শিক্ষার্থীর বয়েসের বৃদ্ধি অনুযায়ী, তার চাহিদা অনুযায়ী ইতিহাস পাঠ পরিচালিত করতে হবে। কখনও তাদের ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে, তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে তাকিয়ে, কখনও শিক্ষকমশায়ের নিকট সান্নিধ্যে এনে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সংযোগ সংস্থাপিত করে, ইতিহাস পাঠ পরিচালনা করবার কথাই বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন।

প্রাথমিক স্তরের এই ভাগে শিক্ষার্থীর উপযুক্ত পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করাও কম বিবেচনা সাপেক্ষ নয়। বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচন যে ধরনেরই হোক না কেন এই সময়কার ইতিহাস পাঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে বর্ণনামূলক হবে সে সম্বন্ধে প্রায় অধিকাংশ ইতিহাস শিক্ষকই এক মত। কিন্তু কেবলমাত্র বর্ণাঢ্য বর্ণনায় গা ভাসিয়ে দেওয়াটার মধ্যেও পূর্ণ সার্থকতা মিলবে না। এগার বছর বয়েস থেকেই শিক্ষার্থীর মধ্যে সাধারণতঃ বিচার বিবেচনার অঙ্কুর উদ্গম হয়ে থাকে; তাই এখানে কিছু কিছু, একেবারে প্রাথমিক অবস্থার, কার্য্যকারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করাটা একেবারে নিরর্থক হবে না। তবে একথা ঠিক যে এই সময় বিস্তৃত বিশ্লেষণে লাভের থেকে ক্ষতিই বেশী হয়। আমরা পূর্ণবয়স্করা যে ইতিহাস পাঠ করি এবং যে পদ্ধতিতে তা করি তার থেকে নিশ্চয়ই পৃথক হবে এই বয়েসের ইতিহাস পাঠ। আর এই সময় শিক্ষার্থীকে নিষ্ক্রিয় না রেখে যতটা সম্ভব সক্রিয় রাখতে হবে।

এই স্তরে ইতিহাস পঠন-পাঠনে উপস্থাপন করবার মত বিষয়বস্তু ঠিক করাও সহজ কাজ মোটেই নয়। যদিও এটি প্যঠাক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাপার তবুও পুনরাবৃত্তি হলেও দুএকটি কথা এ সম্পর্কে বলা আমরা সমীচীন বলেই মনে করি। এই পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন করাটা শিক্ষার্থীর বিস্থালয় জীবনের হ্রস্বতা দীর্ঘতার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর বিস্থালয়-জীবনের হ্রস্বতা দীর্ঘতা আবার নির্ভর করে শিক্ষার্থীর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর। কাজেকাজেই এটি যে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন হবে সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। আমাদের দেশে আমরা ১১+বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের বিস্থার্জ্জন বাধ্যতামূলক করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। কাজে কাজেই জাতীয় ইতিহাসের একটা মোটামুটি ধারনা যাতে শিক্ষার্থীদের এই সময়ের মধ্যে হয় সেই দিকে লক্ষ রেখে বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করতে হবে। কারণ এখন না পড়লে জাতীয় ইতিহাস তাদের অধিকাংশরই আর কোনও দিনই পড়া হবেনা। জাতীয় ইতিহাস যদি না পড়া হয় তাহলে ইতিহাস পড়াই নিরর্থক হবে। যতটুকু সাধারণ শিক্ষা বিদ্যার্থী পাচ্ছে সেটুকুও অর্থহীন হয়ে পড়বে।

জাতীয় ইতিহাস প্রধান পাঠ্য বিষয়বস্তু হলেও সেটিকে পড়াতে হবে কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। বিশ্ব ইতিহাস খুব বড় কথা। এ সময় বিশ্ব-ইতিহাস পড়ানোর কথা চিন্তা না করাই ভাল। আমাদের দেশের স্কুলগুলির অবস্থা, শিক্ষকমশায়দের পেশাগত প্রস্তুতি, স্কুলে "Teaching aids"-এর সুবিধে অসুবিধে,—এসব কথা চিন্তা করে দেখলে শুরু থেকে বিশ্ব ইতিহাসের পঠন-পাঠন অবাস্তর এবং অবাস্তব বলেই প্রতীয়মান হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই

জাতীয় ইতিহাসই আমরা এই সময় পড়াবো। জাতীয় ইতিহাস পড়াবো বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। আর সব সময় চেষ্টা করবো যাতে করে শিক্ষার্থীর আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে উঠে।

এছাড়া স্থানীয় ইতিহাস ও আমরা, সম্ভব হলে, পড়াবার ব্যবস্থা রাখবো। কিন্তু এই দুবছরের মধ্যে কতো জিনিস পড়াবো? সময়ের স্বল্পতা অবশ্য অনেক সময় যথোচিত পাঠ্য বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়; তবু এই স্তরের প্রথমভাগে অমরা যে যে বিষয়গুলির পাঠ শুরু করেছিলাম সেইগুলিরই জের টেনে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগ স্থাপন করে স্থানীয় ইতিহাসের কিছু, কি Developmental approach অনুসরণ করে শিক্ষার্থীর জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত আরও দুএকটি বিষয়বস্তু তাদের কাছে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করতে পারি। কোনো কোনো অভিজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষক, যাঁরা অবশ্য ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে তোলার ব্যাপারে একটু বেশী উৎসাহী, বলে থাকেন যে বিশ্বইতিহাসের মধ্যে থেকে কিছু অত্যন্ত আবশ্যকীয় তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী ঘটনা—যেগুলি মানুষের ইতিহাসের গতিকে করেছে নিয়ন্ত্রিত,—নির্ব্বাচন করে, গল্পের আকারে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। কিন্তু এমনিতরো শত ঘটনায় ও তথ্যে আস্তীর্ণ মানুষের ইতিহাস। কোন্‌গুলিকে তার মধ্যে থেকে বাদ দেওয়া হবে, আর কোনগুলিকে নির্ব্বাচিত করা হবে? এ সম্পর্কে শেষ কথা আমরা তাই মনে রাখবো যে জাতীয় ইতিহাস আমরা এই সময় শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করবো, যদি সময পাই তাহলে স্থানীয় ইতিহাস Lines of development অনুসরণ করে শিক্ষার্থীর জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুএকটি বিষয়বস্তু, কিংবা বিশ্বইতিহাসের যুগান্তকারী কিছু ঘটনা ও তথ্য শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করবো। সময় যেমন হাতে থাকবে সেইমত ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন কি করে হবে? আসুন সেইটাই আলোচনা করা যাক। এটা অবশ্য আমরা ধরে নিতে পারি যে ইতিহাস শিক্ষক এই সময়কার শিক্ষার্থীদের ইতিহাস পাঠ্যক্রম কি তা নিশ্চয়ই জানেন। এই পাঠ্যক্রমটি তাঁকে কতটুকু সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে সেটিও তাঁর অজ্ঞাত নিশ্চয়ই নয়। হাতে কতটুকু সময় আছে সেটি চিন্তা করে, পাঠ্যবিষয়-বস্তুর ব্যাপ্তি বিচার করে, তিনি আগে থাকতেই একটি পরিকল্পনা ঠিক করে নেবেন। এটি তাঁর সাধারণ এবং সামগ্রিক পরিকল্পনা। যাতে করে যথাসময়ে পাঠ্যক্রমের সমস্তটুকু শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করতে তিনি সক্ষম হন তার

জন্যে এ পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। এই সাধারণ পরিকল্পনা ছাড়া পাঠ্যক্রমের এক একটি অধ্যায় বা একত্র সংযুক্ত কটি বিষয় প্রয়োজন মত তিনি কয়েকটি পরস্পর বিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ পাঠ 'য়ুনিটে' ভাগ করে নেবার ও পরিকল্পনা নেবেন। এক্ষেত্রে এক একটি বিচ্ছিন্ন পাঠ 'য়ুনিট' ভাগ করে নেবার চেয়ে কয়েকটি পাঠ "য়ুনিটের" সমষ্টিতে সাজিয়ে নেওয়া অপেক্ষাকৃত ফলপ্রসূ হবে এই জন্যে যে এই প্রক্রিয়ায় এই পাঠ য়ুনিটগুলির পরস্পরের সম্পর্কগুলির সূত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে, আর ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এতে বাধা প্রাপ্ত হবে না।

উপস্থাপনের পদ্ধতি এই স্তরে আদৌ বিশ্লেষণাত্মক হবে না, সামগ্রিক ভাবে এবং সমন্বিত রূপে (Synthetic and not analytic) এই সময়ে ইতিহাসের পঠন-পাঠন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উপস্থাপনের ভঙ্গি বর্ণনামূলক হলে কার্য্যকরী হবে। এই সময়ে গল্পের আবেদন শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষভাবে থাকে। গল্পের আবেদন থাকে এই কারণে যে কল্পনা এই সময় শিক্ষার্থীর মন নিপুণ তুলিতে রাঙায়। তাই কথা দিয়ে ছবি আঁকতে পারলে আর সেগুলি বাস্তবে সম্ভব স্থলে আসল চাক্ষুষ ছবি দিয়ে বা কোনো প্রতীক চিহ্ন দিয়ে উপস্থাপিত করতে পারলে শিক্ষার্থীর মনে খুব সহজেই দাগ ফেলে।

নাটকের আবেদনও এই সময় শিক্ষার্থীর মনে বড় কম নয়। তাই ইতিহাস শিক্ষকের ভঙ্গি যদি নাটকীয় হয় তাহলে তিনি নিজেই অভিনয়ের ভঙ্গিতে পাঠ্যসূচী হতে সুবিধেমত বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করলে অনেক কাজ হয়। তাঁর আবেগ কম্পিত কণ্ঠস্বরে, চোখ মুখের ব্যঞ্জনায়, ভাবের সুষ্ঠুপ্রকাশে বিষয়-বস্তুর উপস্থাপন শুধু মনোজ্ঞই হয় না, সেটি সহজ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় আর শিক্ষার্থীর মনে সেটি সাড়া জাগায় এবং শিক্ষার্থীরও এতে সাড়া পাওয়া যায়। সম্ভব হলে শিক্ষকমশায়ের নেতৃত্বে নাটিকা রচনা করে সেটির অভিনয় করা-যায় বা ইতিহাস পঠন-পাঠনে অন্যান্য যে সব নাট্যরূপের ব্যবস্থা আছে সেগুলির সাহায্য নেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইতিহাস পঠন-পাঠনে "টিচিং-এইডস্" এই অধ্যায়ে ইতিহাস পঠন-পাঠনে নাটক এই শিরোনামায় আলোচিত অংশটি দ্রষ্টব্য।

প্রাথমিক স্তরের প্রথম ভাগেই শিক্ষার্থীর ইতিহাসের সাথে পরিচয় সাধন করার সময়ে ইতিহাস সম্বন্ধে তার কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ভাগটিতে সেই কৌতূহলের উপর ভিত্তি করেই পাঠ্যবিষয়-বস্তুর সম্বন্ধেও কৌতূহল শিক্ষার্থীর মনে উদ্দীপ্ত করে পাঠে তার অভিনিবেশ

আনবার পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অভিনিবেশ এনে সেটিকে জিইয়ে রাখবার জন্যে শিক্ষার্থীদের একজোটে বা দলবদ্ধভাবে কাজের মধ্যে দিয়ে ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করতে হবে। দলবদ্ধভাবে কাজ করবার জন্যে এই বয়েসের শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত ছোটোখাটো কতকগুলি 'প্রোজেক্ট' নিতে পারা যায়। এই সব 'প্রোজেক্টের' মধ্যে নানা ধরনের বিভিন্ন জিনিসের মডেল তৈরী করা, ছবিআঁকা, মানচিত্র তৈরী করা, নাটক অভিনয় করা, শিক্ষা ভ্রমণ করা, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব কাজ করতে গেলে অনেক-ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের কাঁচা হাতের এবং অনভিজ্ঞ মনের পরিচয় প্রতিপদে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

একজোটে দলবদ্ধভাবেই শুধুমাত্র কজ করবার ব্যবস্থা কেন, কর্ম্মচঞ্চল শিক্ষার্থী একক ও স্বতন্ত্রভাবেও অনেক কাজ হাতে কলমে করতে পারে। হাতে-কলমে কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার সাঙ্গীকরণ হয়। কাজ সুপরিকল্পিত ও সৃজনমূলক হলে শিক্ষার্থীর সৃজনীপ্রতিভার উদ্বোধন হয়, আর নতুন কিছু সৃষ্টি করার আনন্দে তার প্রচেষ্টা অভিষিক্ত হয়, তার কাজ করার প্রেরণা জাগে। এখানে অবস্থা অনুসারে, শিক্ষার্থীদের মনীষার মান অনুসারে, স্থানীয় পরিবেশ অনুসারে, শিক্ষকমশায়ের সামনে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ এলাকা। তিনি স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে, নানা ধরনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। এখানে তাঁর সুযোগ প্রচুর, আবার দায়িত্বও যথেষ্ট।

বহু প্রকারের কাজ তিনি শিক্ষার্থীদের এককভাবে, পৃথক ভাবে করতে দিতে পারেন। পুরানো বই, পত্রিকা প্রভৃতি দেখে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি সংগ্রহ করতে বলতে পারেন। এই সময় কোনো জিনিস সংগ্রহ করবার একটা অদম্য স্পৃহা শিক্ষার্থীর থাকে। এই ধরনের ছবি ছাড়াও দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট, পুরানো চিঠি, বংশের কুলজি, পুরানো অস্ত্রশস্ত্রের বা তৈজস পত্রের বা যানবাহনের ছবি, পোষাকপরিচ্ছদ বা অলঙ্কারাদির ছবি সংগ্রহ করতে বলতে পারেন। কিছু কিছু লেখার কাজও এ সময় শিক্ষার্থীকে দিতে পারা যায়। লেখার কাজ মানে ইতিহাসের প্রশ্ন লেখার বা ঐতিহাসিক রচনা লেখার কাজ নিশ্চয়ই নয়। শিক্ষার্থী যা করছে, যা পড়ছে, যা শিক্ষা ভ্রমণ করছে তার মধ্যে থেকে নির্ব্বাচন করে কোনো বিষয় সে লিখবে। এই লেখার জন্যে থাকবে "রেকর্ড বুক" ধরনের একটি খাতা। শুধু লেখার কাজই নয় আঁকার কাজও চলবে সাথে সাথে। লেখার কাজে যেমন শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হবে তেমনি আঁকার কাজেও তার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে।

এই সময়ে নানা ধরনের ভাব এবং চিন্তা প্রকাশের পথ খোঁজে শিক্ষার্থীর মনে। লেখার মধ্যে দিয়ে, আঁকার মধ্যে দিয়ে, মডেল প্রভৃতি তৈরী করার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পায়। এগুলি ছাড়া বলার মধ্যে দিয়েও শিক্ষার্থী নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। বলবার বিষয়-বস্তু পূর্ব্বাহ্নে ঠিক করে নিয়ে শিক্ষার্থীর এ বিষয়ে প্রস্তুতির পর বলবার ব্যবস্থা থাকবে। যে শিক্ষার্থী একটু লাজুক প্রকৃতির তাকে দিয়ে বলানোর যে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে সেটি সহজেই অনুমেয়। বলার মধ্যে দিয়ে, লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সুষ্ঠুভাবে, সম্বদ্ধ ভাবে এবং সাবলীল ভাবে কোনো কিছু প্রকাশ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে। যে শিক্ষার্থী কোনা ঐতিহাসিক ঘটনা বা গল্প শ্রেণীকক্ষে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সামনে বলে, তার বর্ণনা অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বেশ মন দিয়ে শুনে থাকে। বর্ণনা যদি ভাল হয়, যদি সেটি শিক্ষক মশায়ের প্রশংসা অর্জ্জন করে, তাহলে অন্যান্য শিক্ষার্থী অনুরূপভাবে কিছু বলতে উৎসাহিত হয়। এই বলার কাজ যে শুধু সুষ্ঠুভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার অবকাশই শিক্ষার্থীকে দেয় তাই নয় এটি শিক্ষার্থীর লজ্জা সঙ্কোচ জড়তা কাটিয়ে দেয়, শ্রেণীকক্ষের অপরাপর শিক্ষার্থীকে ও বলার ব্যাপারে উৎসাহিত করে থাকে।

এই স্তরে উপস্থাপনের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেখতে হবে যেন ইতিহাসের বিকৃতি না ঘটে। সত্যের প্রতি, প্রকৃত তথ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হবে এই স্তরে। গল্পের মোহে, নাটকের মোহে, বর্ণনার মোহে, বা বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়োজনে কি হাস্যরসের (humour) অবতারণা করতে গিয়ে ইতিহাসের এতটুকু বিকৃতি যেন না ঘটে সেদিকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতি ইতিহাস-শিক্ষকের দৃষ্টি খুব সহজেই আকৃষ্ট হবার কথা। সেটি হচ্ছে ইতিহাস পঠন-পাঠনে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থাপন করবার ব্যাপার। এখানে আমাদের বলার কথা হচ্ছে যে ইতিহাসের তথ্যতাবাসের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘোষণা করে যেটি সত্য তাকে পরাজিত করে অসত্যের উপস্থাপন যেন না ঘটে। যেটি সত্য এবং প্রকৃত তথ্য সেটির যথাযথ উপস্থাপনের মধ্যে ইতিহাস-শিক্ষকের কিছু অসুবিধে না হওয়ারই কথা। কোনো রকমের ভাবাবেগ, Sentiment রাগদ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, যা যথাযথ সেটিকেই উপস্থাপিত করতে হবে। যুদ্ধবিগ্রহের সর্ব্বনাশা পরিণামের দিকটা ফুটিয়ে তুলতে হবে যুদ্ধের বিধ্বংসী দিকটির উপর বেশী জোর দিয়ে।

সময়ের ক্রম, এসময়েও, শিক্ষার্থী বুঝতে পারছে কি না এবং অনুসরণ করছে কি না এ নিয়ে খুব বেশী একটা মাথা ঘামাবার আবশ্যক নেই, তবে শিক্ষকমশায় নিজে সব সময়েই ক্রম যথাযথ অনুসরণ করবেন। এই সময় থেকে শিক্ষার্থীর সময়ের ধারণা গড়ে তোলবার দিকে কিছু দৃষ্টি দিতে হবে।

ইতিহাসের উপস্থাপন

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর

নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের এই কয়টি বছরের প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনে অসামান্য। বাল্যের অবোধ অস্থিরতা স্তিমিত হয়ে কৈশোরের বিকাশে কিছুটা স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয় তার চরিত্রে এই সময়ে। বয়ঃসন্ধিক্ষণের উদ্দামতা আসবার প্রাক্কালে শিক্ষার্থীর মনের প্রস্তুতি চলে এই সময় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত জীবনের পটভূমিকা রচনায়। শিক্ষার্থী এই সময় দ্রুত গতিতে বাড়ে। এই বৃদ্ধি শিক্ষার্থীর জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাপ্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। ব্যাপ্তির জন্যে আর বৃদ্ধির জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই। মনের এই বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার ভার মূলতঃ শিক্ষক-মশায়ের, বিশেষ করে ইতিহাস শিক্ষকমশায়ের। ইতিহাস বিষয়টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর পঠন-পাঠনও সম্ভাবনাময়। তাই এই বিষয়টির পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে ইতিহাস শিক্ষকের ইচ্ছা থাকলে এবং যোগ্যতা থাকলে অনেক কিছু করতে পারেন তিনি। এই সময় শিক্ষার্থীর বিচিত্র ব্যবহারে, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণে, তার প্রবণতার প্রকাশে শিক্ষকমশায় সময় সময় অভিভূত হয়ে পড়েন। শিক্ষার্থীর জীবনের এই অধ্যায়ে ইতিহাস শিক্ষকের করবার অনেক কিছুই আছে। ইতিহাসের যে আসল শিক্ষা তার শুরু শিক্ষার্থীর জীবনের এই স্তর থেকে।

কিন্তু, কি ধরনের বিষয়বস্তু এই সময় শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করা হবে? কি ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করা সহজ হবে, বা কি ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হলে শিক্ষার্থীরা লাভবান হবে সেটি ঠিক করে নেবার অবকাশ বা ক্ষমতা আমাদের দেশে ইতিহাস শিক্ষকদের হাতে বিশেষ নেই কারণ পাঠ্যক্রম রচনা করবার সময়ই মুখ্যতঃ সে কাজটি সমাধা হয়ে থাকে। শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যক্রমটি পড়িয়ে শেষ করার কাজই থাকে প্রধানতঃ শিক্ষকমশায়দের হাতে ন্যস্ত। তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপস্থাপন প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে লাভ কি?

এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে এই জন্যে যে এই স্তরে কি ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হলে শিক্ষার্থীরা লাভবান হবে এবং শিক্ষকমশায়ের কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি হবে না সেটি শিক্ষকমশায়ের জানা থাকলে

ভাল হবে। "ইতিহাসের পাঠ্যক্রম"—এই অধ্যায়ে কোন্ কোন্ বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচন হবে, কি ভাবে সে নির্ব্বাচন সমাধা হবে সে বিষয়ে সাধারণ ভাবে এবং সামগ্রিক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে শিক্ষার্থীদের বয়সাঙ্কের কোন্ স্তরে কি ধরনের বিষয়বস্তু থাকবে সেটির আলোচনা করা হয়নি। তাছাড়া পাঠ্যক্রম যাই থাকুক না কেন, পাঠ্যক্রমকে বাস্তবে চালু করার জন্যে, পাঠ্যক্রমটিকে বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ, তথ্যবহুল ও জীবন্ত করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। আর সেই জন্যেই আবশ্যক আছে পাঠ্যক্রমের ধরাবাঁধা গণ্ডির বাইরে আনাগোনা। তাই বিষয়বস্তুর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকমশায়ের গতায়াতে শুভ ফল হবে সেটির সম্বন্ধে ধারণা থাকা ভাল।

এই স্তরে কি ধরনের বিষয়বস্তু ইতিহাস পঠন-পাঠন কল্পে নির্ব্বাচিত হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ইতিহাস শিক্ষকেরা এই স্তরে জাতীয় ইতিহাস অর্থাৎ শিক্ষার্থীর নিজের দেশের ইতিহাস পড়বার পক্ষেই মত দেন। তাঁদের এই মতের স্বপক্ষে যুক্তির সারবত্তা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের স্কুলের বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীই এই স্তরের পর আর স্কুলে লেখা পড়া করবার সুযোগ পায় না। কোথাও কোথাও আবার এই স্তর থেকে বা এর পরের স্তর থেকে অনেক শিক্ষার্থী অন্য ধরনের শিক্ষা পেয়ে থাকে। সেখানে হয়তো ইতিহাস পাঠ্যক্রমান্তর্গত নয়। সুতরাং শিক্ষার্থীরা যদি এই স্তরে নিজের দেশের ইতিহাস পড়বার সুযোগ না পায় তাহলে তারা নিজের দেশের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জেনেই তাদের স্কুলের শিক্ষা, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা শেষ করতে বাধ্য হবে। এটা বিশেষ ভাল নয়। পশ্চিম বাংলার স্কুল সমূহে ইতিহাস পাঠ্যক্রমটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। নিজের দেশ এবং পৃথিবী—এ দুটির মধ্যে নিঃসন্দেহে পৃথিবী বড়। জাতীয় মনোভাব এবং আন্তর্জাতিক মনোভাব—এ দুটির মধ্যে আন্তর্জাতিক মনোভাব নিঃসংশয়রূপে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশকে বা জাতীয়তাকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর ধারণা বা আন্তর্জাতিক মনোভাব অবাস্তব এবং অসম্ভব কল্পনা।

এই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে প্রশ্ন আসবে 'পৃথিবীর ইতিহাস কি এই স্তরে পড়ানো হবে?' 'এই স্তরে না পড়ানো হলে শিক্ষার্থীরা কখন বিশ্বইতিহাস পড়বে? পৃথিবীর ইতিহাস সামগ্রিক ভাবে না পড়লে শিক্ষার্থীর আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব হবে কি করে? আজকের দুনিয়ায় তাহলে শিক্ষার্থীর আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে তোলার কোনো ব্যবস্থাই থাকবে না? এগুলি খুবই

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এই স্তরের ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের মূল সমস্যাটিই এই প্রশ্নগুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের যে নিজ নিজ দেশের ইতিহাস পড়তে হবে এ কথা যেমন স্বীকার্য্য তেমনি আন্তর্জাতিক মনোভাব শিক্ষার্থীদের মনে গড়ে তুলতে হবে সে কথাটিও যুক্তিশুদ্ধ। কিন্তু এই স্তরে আমাদের হাতে সময় মাত্র তিন বছর। তাই এটি একটি সমস্যা।

এই সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আমরা আর একটি কথা স্মরণ করতে বাধ্য হই। সেটি হচ্ছে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সে অবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বয়সাঙ্কের হিসেবে শিক্ষালাভের সময়কাল বা স্থায়িত্ব। আমরা জানি যে বর্ত্তমানে অর্থাৎ আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা ১১+বছরের বয়েসের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক করবার চেষ্টা করছি। আমাদের সংবিধানে ১৪+বছর বয়েসের সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আবশ্যিক করবার কথা বলা হয়েছে। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার সময়কাল আরও এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব বিষয়গুলির প্রভাব অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষার ইতিহাস-পাঠ্যক্রম রচনায় বিশেষভাবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও তার পাঠ্যক্রমের উপর সামগ্রিক ভাবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে। ভবিষ্যৎ হয়তো নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা আর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সাধারণভাবে এবং ইতিহাস পাঠ্যক্রমে বিশেষভাবে সংস্কার সাধন করবে। কিন্তু সেটি ভবিষ্যতের হাতে। আজকের দিনে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমরা সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাবো যে এই স্তরে নিজের দেশের ইতিহাস শিক্ষার্থীদের পড়ানোর কথাটা প্রয়োজন একাধিক কারণেই আছে। তাই জাতীয় ইতিহাস পড়ানোর কথাটা আন্তর্জাতিক মনোভাবের বন্যায় একেবারে ভাসিয়ে দেওয়া যায়না। অপরপক্ষে আবার আজকের দুনিয়ায় নানা কারণে আন্তর্জাতিক মনোভাব শিক্ষার্থীর মনে গড়ে তোলবার পরিকল্পনাটা বাতিল করে দেওয়াটাও যুক্তিযুক্ত নয়। কোনো কোনো মহলে এ সমস্যার সমাধান করবার কথা বলা হয়ে থাকে এইভাবে যে জাতীয় ইতিহাস আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে পড়ানো হলে বিশেষ কিছু অসুবিধে হবে না। কিন্তু সেখানেও কিছু কিছু জিজ্ঞাস্য থেকে যায়। জাতীয় ইতিহাস সব অধ্যায়েই কি বিশ্ব ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে পড়ানো সম্ভব? বিশ্ব ইতিহাসের সামগ্রিক যে রূপ সেটি কি জাতীয় ইতিহাসের কোনো কোনো অধ্যায়ের সাথে খণ্ডও বিক্ষিপ্তভাবে বিশ্বইতিহাসের সামগ্রিক ধারার সাথে যুক্ত

করলে আন্তর্জাতিক মনোভাব যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর মনে গড়ে তোলা সম্ভব হয়? বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ইতিহাস পড়ানো দুরূহ কাজ। একাজ সম্পাদন করার মত শিক্ষক এবং তাঁদের শিক্ষাগত ও পেশাগত প্রস্তুতি, এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করবার সহায়ক হিসেবে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতির অভাব একান্তভাবেই প্রকট।

তাই, এই স্তরের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে যে সমস্যার সম্মুখীন আমরা হই সেটি হচ্ছে এই যে জাতীয় ইতিহাস পড়ানো এবং আন্তর্জাতিক মনোভাব শিক্ষার্থীর মনে গড়ে তোলা,—এই দ্বিবিধ কাজ নিম্নমাধ্যমিক স্তরে, এই তিন বছরের মধ্যে কি করে সম্পাদন করা সম্ভব হবে। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তিনটি বিষয় এই প্রশ্নটির সাথে জড়িয়ে আছে। প্রথমটি হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসের বা অন্যান্য দেশের ইতিহাসের কতটুকু অংশ আমরা এই স্তরে পাঠ্যক্রমান্তর্গত করবো দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসের বা অন্যান্য দেশের ইতিহাসের কোন্ কোন্ ধরনের তথ্য পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবো। তৃতীয়টি হচ্ছে কি উপায়ে জাতীয় ইতিহাস অন্যদেশের বা বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পড়ানো হবে।

"বিশ্ব ইতিহাসের বা অন্যান্য দেশের ইতিহাসের কতটুকু এই স্তরের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে"—এই প্রশ্নটি এমন কতকগুলি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে এ সম্পর্কে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে হাজির হবার কোনো উপায় নেই। বাস্তব এবং অত্যন্ত জরুরী বিষয়ের বিচার বিবেচনার উপর এটির সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল। শিক্ষক মশায়ের হাতে সময়, স্কুলের সময় তালিকায় (Time table-এ) ইতিহাস পড়ানোর সময় করে নেওয়া, পাঠ্যপুস্তক, টিচিং এইড্স্, ইতিহাস শিক্ষকমশায়ের বিষয়গত জ্ঞান ও পেশাগত প্রস্তুতি প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে এটির যথাযথ সিদ্ধান্তকে। তাছাড়া কোনো দেশবিশেষের জাতীয় ইতিহাসের প্রকৃতি ও তার বৈশিষ্ট্য, তার পাশাপাশি দেশগুলির সাথে সম্পর্ক, জাতীয় ইতিহাসের উপর বহির্বিশ্বের ইতিহাসের ও বহির্বিশ্বের ইতিহাসের উপর জাতীয় ইতিহাসের পারস্পরিক প্রভাব, প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে যুক্তিপুষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তবে একথা ঠিক যে বিষয়বস্তুটিকে যথাসম্ভব সরল সহজ করে, অন্যান্য দেশের সাথে নিজ দেশের দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর সামনে বিশেষভাবে উপস্থাপিত করতে হবে।

"বিশ্বইতিহাসের বা অন্যান্য দেশের ইতিহাসের কোন্ কোন্ ধরনের বিষয়বস্তু পাঠ্য ক্রমান্তর্গত করা হবে"—এপ্রশ্নটিও পূর্ব্বপ্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বাস্তব

বিষয়গুলির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই এপ্রসঙ্গে সেগুলিও বিবেচনা করতে হবে যেমন, তেমনি মনে রাখতে হবে যে মানুষের সাধারণ উত্তরাধিকারের যে মূল সূত্র সেটি বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। মানুষের বর্ত্তমান সভ্যতার যে সামগ্রিক চিত্র, তার রূপায়ণে যে প্রায় সব দেশের সব মানুষেরই কিছু না কিছু অবদান আছে এসত্যটি যাতে সহজ হয়ে উঠে শিক্ষার্থীর মনে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। মানুষের সামাজিক জীবন, সামাজিক রীতিনীতি, তার শাসন ব্যবস্থা, তার অর্থ-নৈতিক অবস্থা, ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতির মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ও মূলগত ঐক্য বিদ্যমান তা যেন প্রতিভাত হয় শিক্ষার্থীর কাছে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে অনেকে সুনির্ব্বাচিত ও যথোপযুক্ত কতকগুলি বিষয় "Topical approach"—অবলম্বন করে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলে থাকেন।

আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ইতিহাস পড়ানো এমন একটি কাজ যেটি অনেকখানি নির্ভর করে ইতিহাস শিক্ষকের উপর। এই কাজে ইতিহাসের যেটি মূলভাব (Spirit) সেটি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করে বহুধাবিভক্ত ইতিহাসের ধারার মধ্যে যে একটি সার্ব্বিক একাত্মতা, বহু-বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ মানবসংস্কৃতির মূলে যে একটি অবিভাজ্য সংহতির পটভূমিকা বিদ্যমান, সেটিকে সুষ্ঠুরূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীর মনে, শিক্ষকমশায়ের অস্মিতার নৈর্ব্যক্তিক প্রতিফলনে। অন্ধ গোঁড়ামি আর বৃথা জাত্যাভিমানকে যেমন পরিহার করতে হবে, সত্য তথ্যের সঙ্কলনে আর যুক্তিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের বিন্যাসে, তেমনি নিজদেশের ইতিহাস যে মহাকালের অভিক্ষেপের কোনো অধ্যায়েই আপন ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে, একক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠেনি, গড়েউঠা সম্ভব নয়, সেটিও শিক্ষার্থীর কাছে পরিষ্কার করে দিতে হবে তথ্যের সঙ্কলনে আর যুক্তির বিন্যাসে ও বিশ্লেষণে। আর ইতিহাসের যে সব অধ্যায়ে নিজ দেশের সাথে হয়েছে বহির্বিশ্বের সংযোগ, আর সেই সংযোগে জাতীয় ইতিহাস বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে অন্য দেশের প্রভাবে, বা নিজ দেশ প্রভাবিত করেছে অন্য দেশকে, সেটিও শিক্ষার্থীর মনে আঁকতে হবে নিপুণভাবে।

এই স্তরে শিক্ষার্থীর কাছে কি ধরনের ইতিহাস উপস্থাপিত হবে সে নিয়ে যে মত ভেদ আছে সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই স্তরে উপস্থাপন করবার জন্যে ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করবার ক্ষেত্র

হিসেবে যে সব সুপারিশ করা হয়ে থাকে তার মধ্যে আছে জাতীয় ইতিহাস, বিশ্বের ইতিহাস, মানুষের জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলকারী কতকগুলি বিষয় (Topics), নিজ-দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক সভ্যতা সংস্কৃতিযুক্ত দেশের ইতিহাস। এই সব সুপারিশগুলি আলাচনা করতে গিয়ে সময়ের স্বল্পতা ও পাঠ্যক্রমান্তর্গত বিষয়বস্তুর অতি বিস্তৃতির জন্যে যদি এগুলিকে অবাস্তব বলে মনে হয় তাহলে সেটি অস্বাভাবিক হবেনা মোটেই। এই স্তরে আমরা সময় পাচ্ছি মোট তিন বছর, স্কুলের 'টাইমটেবলে' ইতিহাস পড়ানোর ঘণ্টা সপ্তাহে তিনটি, আর ইতিহাস পড়বার বিষবস্তু!!

এই সব আলোচনা, মতভেদ, সুপারিশ প্রভৃতি থেকে একটা জিনিস বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। সেটি হচ্ছে যে এই স্তরে জাতীয় ইতিহাস পড়ানো এবং শিক্ষার্থীর মনে আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে তোলার কাজ এই দুটিই সংসাধিত করতে হবে। জাতীয় ইতিহাস নিয়ে বিশেষ হাঙ্গামা নেই। হাঙ্গামাটা বেশী হয় আন্তর্জাতিক মনোভাব নিয়ে এবং সেই প্রসঙ্গেই বিশ্বইতিহাস, নিজেদেশের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক-ঐতিহ্য সমন্বিত দেশের ইতিহাস, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত আবশ্যকীয় "Topic" প্রভৃতির পঠন-পাঠনের কথা উঠে থাকে। এখন বিচার করে দেখা যাক এই হাঙ্গামার ঝঞ্ঝাট কিছুটা কম করা যায় কিনা। অবশ্য একথা ঠিক যে এটি একটি বিতর্কমূলক বিষয়। বিতর্কমূলক বিষয় সম্বন্ধে কিছু সুপারিশ করতে গেলেই তার বিপক্ষে কিছু না কিছু বলবার থাকবেই। সুপারিশ সম্বন্ধে সমালোচনার এই সীমারেখা জেনেই বিবেচনা করে দেখবার জন্যে আমরা বলি যে এই স্তরের তিন বছরের সময়ের মধ্যে প্রথম দু বছর জাতীয় ইতিহাস পড়িয়ে, সেটিও অবশ্য উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, আর শেষের একবছর আন্তর্জাতিক মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্যে একটি সুচিন্তিত ও সুপরি-কল্পিত পাঠ্যক্রম পড়ানো। আমরা জানি দু বছর সময়ের মধ্যে সমগ্র জাতীয় ইতিহাস, তাও আবার আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তদনুরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়ানো দুরূহ; আবার একবছরের পাঠ্যক্রম, হাজার সে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত হোকনা কেন, আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে তোলবার পক্ষে একেবারেই অপর্য্যাপ্ত। কিন্তু তবু এই প্রস্তাব এই জন্যে যে সব জিনিস একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে কিছু না হওয়ার চেয়ে এব্যবস্থা আমরা ভাল বলে মনে করি।

ইতিহাস পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু এই স্তরে যাই থাকুক না কেন ইতিহাসের শিক্ষককে এই স্তরে ইতিহাস পঠন-পাঠন সফল করে তোলবার জন্যে পাঠ্যক্রমান্তর্গত বিষয়বস্তুর সীমা ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করতে হবে। ইতিহাস এমনি একটি বিষয় যে এর পঠন-পাঠনে বিষয়বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা প্রায় অসম্ভব। মানুষের জীবন বিচিত্র। ইতিহাসের পরিধিও বহুদূর বিস্তৃত, নানা ঘটনা আস্তীর্ণ। ইতিহাস আবার ধারাবাহিক। ইতিহাস পঠন-পাঠন শ্রেণীকক্ষে সার্থক করে তুলতে হলে তাই বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র হতে নানা বিচিত্র তথ্যের সঙ্কলন ও বিন্যাস যেমন অপরিহার্য্য, তেমনি যুক্তিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণকরে শিক্ষার্থীর জীবন অভিজ্ঞতার সাথে সেগুলির সংযোগ সাধনও বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে ইতিহাস পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির সংযোগ সাধন করতে হ'লে শিক্ষার্থীর দিকে তাকাতে হবে। এই স্তরে যে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস পড়ছে তাদের মনের দিগন্ত ক্রমবর্ধমান। নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের জীবনে আসছে নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ। তাদের কৌতূহল নানা অনুসন্ধিৎসায় বিশ্লেষণমুখী। তাদের জীবনের নবায়ণ হয়ে গেছে শুরু। দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রগতি জীবন-পরিণতির দিকে। নানা ধরনের ব্যক্তিতার নির্মিতি শুরু হয়ে গেছে এই স্তরে তাদের মধ্যে, তাই ব্যক্তিগত বিভিন্নতা [individual difference) সুপরিস্ফুট তাদের জীবনে। শিক্ষার্থীর জীবনের এই বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে, তাদের মনের চাহিদা মেটাতে হ'লে বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ করে তুলতে হবে ইতিহাস পঠন-পাঠনকে। কার্য্যকারণ বিশ্লেষণ করতে শিখেছে শিক্ষার্থী এখন, তার মন বাস্তব সত্যাশ্রিত তথ্য খুঁজবে, নিজেরাই কোনো ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে ব্যাপৃত হবে, বর্ত্তমানের সাথে অতীতের পার্থক্য নির্ণয়ে তৎপর হবে। তাই এই সময় ইতিহাস-শিক্ষক মশায়ের দায়িত্ব ঠিক ঠিক পালন করতে গেলে, সেটি যথেষ্ট-গুরু। শিক্ষার্থীর কৌতূহল মেটাতে হবে নানা তথ্যের সরবরাহে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে হবে মানুষের বিচিত্র ইতিহাসের সাথে পরিচয় সাধন করিয়ে দিয়ে, উদার দৃষ্টি ভঙ্গির পটভূমিকা রচনা করতে হবে দেশে দেশে, মানুষে মানুষে, গভীর নৈকট্যের সূত্রগুলি শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করে। ইতিহাস-শিক্ষকের কাজ এই সময়ে যেমন দায়িত্বপূর্ণ, তেমনি বহু। ইতিহাস যে কেবল যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানির মধ্যে সীমিত নয় এই কথাটি যাতে শিক্ষার্থী এই সময় থেকেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ইতিহাস বলতে কেবল রাজারাজড়া, মন্ত্রী সেনাপতি, আর বিখ্যাত ধনী বা রাজনীতিবিদের কাহিনী সমষ্টি নয়। ইতিহাস মানুষের কথা, মানুষের বিচিত্র জীবনের বিবর্ত্তনের কথা

নানা ভাঙাগড়া, উঠানামার মধ্যে দিয়ে চলে আসা তার জীবন অভিজ্ঞতার কথা, তার সমাজ সংস্কৃতির কথা। কাজে কাজেই তা বিচিত্র। এর তথ্য বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে আস্তীর্ণ।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে শিক্ষকমশায় যখন নানা কারণে পাঠ্যক্রমান্তর্গত বিষয়-বস্তুগুলির যথাযথ উপস্থাপন কল্পে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করবেন তখন তিনি আর একটি দায়িত্ব পালন করবার সুযোগ পাবেন। সে দায়িত্বটি আর কিছুই নয়, সেটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনে আন্তর্জাতিক মনোভাব সৃষ্টি করা। এই স্তরে ইতিহাস পঠন-পাঠনের বেলায় তাই কতকগুলি বিষয়ের উপর একটু সজাগ দৃষ্টি যদি শিক্ষক মশায় রাখেন তাহলে ইতিহাস উপস্থাপনের মাধ্যমে ইতিহাস পড়ানোর যেটি অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য সেটি সফল হয়।

প্রথমতঃ, এই স্তরে ইতিহাস উপস্থাপনের সময় রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর এবং সেই সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের কৌশলের উপর, রাজারাজড়াদের কাহিনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে মানুষের সমাজ জীবনের উপর এবং সামাজিক ইতিহাসের উপর জোর একটু বেশী দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। সামাজিক জীবনের উপর জোর দেওয়ার সময় অর্থনৈতিক দিকটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়বে এবং সেই সূত্রে কোনো মানুষ, কোনো দেশ, এককভাবে, পৃথকভাবে, অন্য মানুষের থেকে ছিন্ন হয়ে, অন্য দেশের থেকে বিভিন্ন হয়ে, বসবাস করতে পারেনা, বাঁচতে পারেনা,—একে যে অন্যের উপর নির্ভরশীল এই কথাটি শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে হবে। আজকের দুনিয়ার মানুষের উপর মানুষের, এক দেশের উপর অন্যদেশের নির্ভরশীলতার কথা শিক্ষার্থীর অবিদিত নয়। জগৎ জোড়া ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে, একদেশ থেকে অন্যদেশে যাতায়াতের অতিদ্রুত ব্যবস্থা মানুষের করায়ত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে, অনন্ত সম্ভাবনা-ময় বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতিতে, আমরা যে যুগে বাস করছি সে যুগে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে পরস্পর নির্ভরশীলতার কথা প্রমাণ করবার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু এটি রাতারাতি হয়নি। এটি অতীতের আরব্ধ কর্ম্মের ক্রমপরিণতি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। তাই অতীতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সূত্র ধরে, অতীত কাল থেকে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে এই যোগাযোগ এবং তাদের পরস্পর নির্ভরশীলতার বিষয়টি শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষে মানুষে সহযোগিতা যে কোনো এক বিশেষ দেশের গণ্ডির মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, একটি দেশের বা দুটিদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে

বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত হয়ে তার আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে সেই কাহিনীটি ধারাবাহিক ভাবে, যথাযথ ভাবে, উপস্থাপিত করবার উপায় খুঁজতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা তো ইতিহাসের একটি অতিমূল্যবান তথ্য। এ তথ্য ইতিহাসের পাতায় বহুদিন থেকে অন্যান্য বহুতথ্যের সাথে লিপিবদ্ধ আছে। আজ সেটি নানাকারণে সমধিক গুরুত্ব অর্জ্জন করেছে বলেই এর উপর আমাদের নজর পড়েছে। আজ যেমন প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ এটির কথা বেশী করে স্মরণ করছে, তেমনি প্রয়োজনের তাগিদেই এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পটভূমি রচিত হয়েছিল। কিকি প্রয়োজনে. এটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল সেটি জানানো, বর্ত্তমানে কোন্ কোন্ কাজের মধ্যে দিয়ে, কোন্ কোন্ সংস্থার মাধ্যমে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে, এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে সেগুলিও শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করবার প্রয়োজন আছে। বয়স্কাউট, রেডক্রস, য়ুনো প্রভৃতি সংস্থাগুলির প্রকৃতি এবং তাদের মূলে আছে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মঙ্গলকর স্পর্শ সেটিও শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করবার কথা ভুললে চলবে না। তবে এটাও ঠিক যে এই সব সংস্থার সাংগঠনিক খুঁটিনাটি বা জটিল বিষয়গুলি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তাদের সংগঠনের মূলে যে প্রেরণা এবং তাদের কর্ম্মক্রমের যে শুভঙ্কর উদ্দেশ্য সেই দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে বেশী।

তৃতীয়তঃ ইতিহাসের শিক্ষকমশায় পাঠ্যক্রমান্তর্গত বিষয়বস্তুগুলির ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ রেখে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে, শান্তির পক্ষে মানুষের যে অবদান এবং অসহিষ্ণুতা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনাদি অতীত থেকে মানুষের যে সংগ্রাম তার দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারেন। ইতিহাসের পাতায় এ তথ্য বহু অছে। ঋষি সক্রেতিস্ থেকে শুরু করে বিংশ শতকের ইতিহাস পর্য্যন্ত শিক্ষকমশায় চলে আসবেন। এই পরিক্রমায় সত্যানুসন্ধিৎসুদের উপর নির্য্যাতনের কাহিনীটিই শুধু চিত্রিত হবেনা, মানুষের ন্যায়বুদ্ধি, বিচার যুক্তি যে কুসংস্কারকে আর গোঁড়ামিকে ভেঙে চুরমার করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, সেদিকটাও ভালকরে ফুটিয়ে তুলতে হবে। মানুষের স্বাধীন চিন্তার, নিঃসঙ্কোচ মত প্রকাশের, ব্যক্তি-স্বাধীনতার, স্বীকৃতি ক্রমশঃ লাভ করছে আজকের দুনিয়ায়। এই বিরাট স্বীকৃতির ক্রমিক অভিব্যক্তিটি উপস্থাপিত করতে হবে শিক্ষার্থীর কাছে কিছু সহজ, সরল করে। তাহলে এটি বোধগম্য হতে বাধা বিশেষ থাকবেনা।

চতুর্থতঃ, মানুষের মধ্যে যুক্তি আছে, মননশীলতা আছে, আছে নীতিবোধ

এবং শুভঙ্কর প্রেরণা। আর এসবের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় একটি নিরঙ্কুশ সার্ব্বজনীন মনোভাব। এই পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীতে যে প্রধান ধর্ম্মগুলি প্রচারিত হয়েছে, যে যে আন্তর্জাতিক আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলির মধ্যে যে সবস্থানের এবং সবকালের একটি সার্ব্বজনীন একাত্মতা বিদ্যমান সেটি অস্বীকার করবার কোনো উপায় 'নাই। তাছাড়া বিজ্ঞানের অনুশীলনে ও বিস্ময়কর উদ্ভাবনে, ঔষধপথ্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, এমনিতরো হাজারো জিনিসের উন্নতির মধ্যে দিয়ে, মানুষের যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাও কোনদিন দেশ বিশেষের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। এগুলির দিকে শিক্ষার্থীর মন আকৃষ্ট করতে হবে।

এখন কথা হচ্ছে কি পদ্ধতিতে ইতিহাসের উপস্থাপন হবে শ্রেণীকক্ষে? এটি সহজেই বুঝতে পারা যায় যে প্রাথমিক স্তরে যে উপায় এবং যে পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে বিষয়-বস্তুর উপস্থাপন করবার কথা বলা হয়েছে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইতিহাস উপস্থাপন করা এইস্তরে চলবেনা। পূর্ব্ব স্তরের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন পদ্ধতি যে অনুসরণ করতে হবে এসম্বন্ধে দ্বিমত নেই বোধহয় কোনো মহলে। তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে প্রণিধাণযোগ্য যে পদ্ধতি হঠাৎ, রাতারাতি পরিবর্ত্তন যেন না করা হয়; শিক্ষার্থী বেড়ে উঠে ধীরে ধীরে, তার মনের পরিবর্ত্তন হয় ক্রমে ক্রমে, ইতিহাস উপস্থাপন করবার পদ্ধতির পরিবর্ত্তনও হবে ক্রমে ক্রমে।

পদ্ধতি অনুসরণ করবার যা মূল কথা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ-করা, তার মনের ক্রমপরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখা,—সে কাজটি করতে হবে। এই কাজে হাত দিলেই ইতিহাস শিক্ষক মশায়ের প্রথমেই নজরে পড়বে যে এই স্তরের শিক্ষার্থীর পূর্ব্ব স্তরের শিক্ষার্থীর সাথে পার্থক্য অনেক। এই স্তরে শিক্ষার্থীর মনের খানিকটা পরিণতি লাভ করেছে। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার কাহিনীতেই সে শুধু সন্তুষ্ট নয়, ঐ কাহিনীর বিশ্লেষণ করতে, ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে, সে চায়। তার মনের কাঠামো 'কারণ অনুসন্ধান করবার মত ক্ষমতা অর্জ্জন করেছে। এই স্তরে নিছক কল্পনার রঙে রেঙে উঠে তার মনে সন্তুষ্টি আসেনা। সে তথ্য চায়। শিক্ষার্থীর ক্রমবর্দ্ধমান মনের পরিধিতে, পূর্ব্বস্তরে যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল তার বনেদ পাকা করে, ইতিহাস পঠন-পাঠনে তথ্যের বিশ্লেষণ করবার যে রীতি, তার প্রস্তুতি এই স্তরেই করে নিতে হবে। অধিকাংশ অভিজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষক মনে করেন যে এই স্তরে মৌখিক পদ্ধতি,—গল্পবলার উপর বেশী-

জোর না দিয়ে,—অনুসরণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মৌখিক পদ্ধতির সম্বন্ধে "ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি" এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি তাই এখানে বিস্তারিতভাবে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দেশের স্কুলগুলির বর্ত্তমান অবস্থায় (শিক্ষকমশায়দের পেশাগত প্রস্তুতি, টিচিংএইড্‌এর ব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক, গ্রন্থাগার, স্কুলের পরিবেশ প্রভৃতি বিষয় সমূহ বিচার করে) মৌখিক পদ্ধতি এই স্তরে অবলম্বন করা অধিকতর ফলপ্রসূ বলেই আমরা মনে করি। তবে দেখতে হবে যে মৌখিক পদ্ধতি যেন শুধু বক্তৃতায় পর্য্যবসিত না হয়। শিক্ষক মশায় বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল জাগিয়ে তুলবেন। শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীর প্রশ্নে, অভিজ্ঞতা বর্ণনায়, নোট ও সংক্ষিপ্তসার রচনায় এবং অন্যান্য উপযুক্ত কাজের মাধ্যমে পাঠে এই সক্রিয় অংশগ্রহণ সার্থক হয়ে উঠবে।

শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত কাজে বা পৃথকভাবে কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকবে, আবার দলবেঁধে, একজোটে কাজ করবার সুযোগ ও তাদের থাকবে। পৃথকভাবে কাজের জন্য শিক্ষার্থীরা এই স্তরের শেষের দিক থেকেই "নোট" তৈরী করার অভ্যাস আয়ত্ত করবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নোটবুক থাকবে। শিক্ষক মশায় সঙ্কলিত তথ্যের উপস্থাপন করবেন। ব্ল্যাকবোর্ডে বিষয়বস্তুর শিরোনামা (Heading) গুলি লিখে দেবেন। শিক্ষার্থী নিজের নোটবুকে সেগুলি টুকে-নেবে। পরে সেগুলির বিস্তার সাধন করবে। লক্ষ রাখতে হবে যে পঠন-পাঠন যখন চলছে তখন যেন শিক্ষার্থী নোট টোকার কাজে মন না দেয়। নিজ নিজ "নোট" বুকে শিক্ষার্থী ছবি, স্কেচ্, মানচিত্র, কার্টুন, সময় রেখা ও বিভিন্ন ধরনের লেখ, 'চার্ট', 'ডায়াগ্রাম' প্রভৃতি করবে। প্রয়োজন মত এই সব কাজে শিক্ষকমশায়ের তত্ত্বাবধান থাকবে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা পড়বে। শিক্ষকমশায় বই নির্দ্দিষ্ট করে দেবেন, বই-এর প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নির্ব্বাচিত করে দেবেন। শিক্ষকমশায়ের উপদেশ নির্দ্দেশমত ভ্রমণকাহিনী, কোনো ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা, কোন পর্য্যটকের ভ্রমণ কাহিনী, ডায়েরী প্রভৃতি শিক্ষার্থীরা লিখবে। এইসব কাজের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের রূপায়ণ হবে শ্রেণীকক্ষে।

কোনো কোনো মহলে মূল উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতির কথাও এই স্তরে অনুসরণ করবার জন্যে বলা হয়ে থাকে। যদিও ইতিহাস পড়বার এই বিশ্লেষণা-ত্মক পদ্ধতি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের পক্ষে কতোখানি কার্য্যকরী হবে সে বিষয়ে বহু অভিজ্ঞ শিক্ষক সন্দেহ পোষণ করে থকেন তবুও যাঁরা এই পদ্ধতি অনুসরণ

করবার কথা বলে থাকেন তাঁদের মতে এই পদ্ধতি অবলম্বনে নানা ধরনের তথ্য ও পরস্পর বিরোধী তথ্য থেকে প্রকৃত সত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার যে প্রক্রিয়া তার সাথে এই স্তরেই বিদ্যার্থীর পরিচয় হলে ভাল হয়। ইতিহাস পড়ানোর যে একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তারদিকে অন্ততঃ খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। এঁদের মতে তেরো চোদ্দো বছর বয়েসের শিক্ষার্থীর পক্ষে এপদ্ধতি অনুসরণ করার একটা দুরধিগম্য বাধা নেই। বিশেষকরে এই স্তরে অধ্যয়ন সমাপ্তির সাথে সাথেই বহু শিক্ষার্থীর স্কুলজীবন এবং অনেক ক্ষেত্রে স্কুলে পৃথকভাবে ইতিহাস পাঠ শেষ হয়ে যাবে, তাই এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা যুক্তি যুক্ত।

আমাদের দেশে কিন্তু এই স্তরে মূল উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করার পক্ষে কিছু অসুবিধে আছে। মূল উপাদান সম্বলিত বই (Source book) আমাদের দেশে একান্তভাবেই দুষ্প্রাপ্য। তাছাড়া ইতিহাস শিক্ষকমশায়দের বিষয়জ্ঞান এবং পেশাগত প্রস্তুতিও অধিকাংশক্ষেত্রে আশানুরূপ নয়, টিচিংএইড ও পর্য্যাপ্ত নেই, স্কুলের পরিবেশও সন্তোষজনক নয়, অধিকাংশ স্কুলে ইতিহাসের পৃথক শ্রেণীকক্ষের অভাব, এইসব কারণে এই পদ্ধতি কতোখানি ফলপ্রসূ হবে সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহ জাগবে। তবে পরীক্ষামূলক-ভাবে এটি অনুসরণ করে দেখতে পারা যায়। বিশেষকরে ইতিহাসের শিক্ষক-মশায় বিশেষ কেনো একটি পদ্ধতির উপরই তো নির্ভর করবেন না, তা করলে পদ্ধতির কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ থাকবে না, পদ্ধতির হবে অকাল মৃত্যু ; ইতিহাস পঠন-পাঠন নীরস, নিরানন্দময় হয়ে পড়বে, তার মধ্যে কোনো প্রাণ থাকবে না।

শিক্ষার্থীদের পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করবার ব্যবস্থা ছাড়া তাদের দল বেঁধে, একজোটে কাজ করবার ব্যবস্থাও এই স্তরে নিশ্চয়ই থাকবে। আমরা দেখেছি বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর মনঃসংযোগ আকৃষ্ট করে তাকে জিইয়ে রাখবার অন্যতম প্রধান কৌশল হচ্ছে শিক্ষার্থীর একজোটে কাজ করতে দেবার ব্যবস্থা করা। হাতে কলমে কাজ করবার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর সংযোগ যথাযথ হয়, পরিচয় নিবিড় হয়, বিষয়বস্তুর প্রতি বাস্তবতা বোধ জাগে। কাজের পরিসমাপ্তিতে আসে সৃজনী প্রতিভার স্ফুরণের সাথে সাথে সৃষ্টি করার আনন্দ। আর এই দলবেঁধে একজোটে কাজ করবার প্রবৃত্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের প্রকট থাকে এই সময়। তাই শিক্ষক মশায় ইতিহাস পঠন-পাঠনে এটিকে নানা ভাবে কাজে লাগাবেন।

যেসব কাজ এই উদ্দেশ্যে দেওয়া যায় তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জিনিসের মডেল তৈরী করা, চার্ট, ডায়াগ্রাম প্রভৃতি করা, এমনি নানাপ্রকারের কাজের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলির প্রোজেক্ট নিয়ে, সুপরিকল্পিতভাবে, শিক্ষক মশায়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে, এগুলি সম্পাদন করবার ব্যবস্থা থাকবে সেকথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। ইতিহাস-সমিতি স্কুলে স্থাপন করা, তার মধ্যে দিয়ে নানা রকমের আলোচনা সভা করা, নাটক, একাঙ্কই হোক বা দৃশ্য নাট্যই হোক, শিক্ষার্থীদের দ্বারা করানো, শ্রেণীকক্ষেই ইতিহাসের কোনো স্মরণীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে, ছোটো কোরে, কোনো দৃশ্যের নাটকাকারে রূপ দেওয়া; নাটকের সাজপোষাক থেকে আরম্ভ করে মঞ্চস্থ করা পর্য্যন্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি নিজেরাই শিক্ষক মশায়ের নির্দ্দেশে এবং সহায়তায় করে নেওয়া প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক স্থানসমূহে, জাদুঘরে, সংগ্রহশালা প্রভৃতিতে ভ্রমণে যাওয়া, কোনো উপাদান সংগ্রহ করা, স্কুলে ইতিহাস সংক্রান্ত প্রদর্শনী করা,—এমনি নানাধরনের কাজ আছে যেগুলি আমরা এই স্তরের শিক্ষার্থীদের করতে দিতে পারি আমাদের ইতিহাসের উপস্থাপন এইস্তরে সুষ্ঠু ও যথাযথ করবার জন্যে।

———

ইতিহাসের উপস্থাপন

উচ্চমাধ্যমিক স্তর

এই স্তরে ইতিহাস উপস্থাপনের কথা আলোচনা করার শুরুতেই প্রথমে যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেটি হচ্ছে যে এই স্তরে যারা স্কুলে অধ্যয়ন করতে আসে সাধারণভাবে তাদের সংখ্যার স্বল্পতা আর বিশেষভাবে যারা ইতিহাস অধ্যয়ন করবে তাদের সংখ্যাল্পতা। আর্থিক অভাব অনটন, সুযোগ সুবিধের অভাব, যতশীঘ্র সম্ভব সাংসারিক প্রয়োজনে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করবার তাগিদ বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করে থাকে এই স্তরে এসে বিদ্যালাভ করবার সৌভাগ্য থেকে। আবার ভবিষ্যৎ জীবনে নিজ নিজ পেশার প্রস্তুতির পটভূমিকা রচনা করবার জন্যে যে শিক্ষা তাও শুরু হয় এই স্তরে। সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাসকে বাদ দিয়েই পাঠ্যক্রম রচনা। এই স্তরে থাকে নানা ধরনের স্কুল, নানা ধরনের পাঠ্যক্রম তাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে। সাধারণ শিক্ষার স্কুলেও পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন ধারা। তাই দেখি এই স্তরে যে শিক্ষার্থীরা যথাযথ ইতিহাস পড়ে তাদের সংখ্যা নগণ্য। অথচ শিক্ষার্থীদের এই বয়সাঙ্কেই হয় প্রকৃত জীবনায়ন, এই বয়সাঙ্কেই তারা জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে মুখোমুখী প্রত্যক্ষ করে, সমস্যাস্তীর্ণ জীবনের রঙ্গমঞ্চে এই স্তরেই তাদের প্রবেশ। যুক্তির ব্যাপ্তিতে এবং বুদ্ধির বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থী এই স্তরে পরিণতির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছে। ইতিহাস পাঠের যা আদর্শ ও উদ্দেশ্য তা এই সময়েই পুষ্পিত হয়ে উঠবার অবকাশ পায়। অথচ অধিকাংশ শিক্ষার্থীই জীবনের এই স্তরে ইতিহাস পড়বার সময় পায় না বা সুযোগ পায় না। যাঁরা ইতিহাস পঠন-পাঠন নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরা অনেকে এই কারণে দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন।

আমাদের দেশের কথাই ধরুন। প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে এই স্তরে ছাত্র সংখ্যার অল্পতা বিশেষ ভাবেই প্রকট, আবার যারা এই স্তরে শিক্ষার্থী হয়ে এসেছে তাদের মধ্যে যারা ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হবার জন্যে বা চিকিৎসক হবার জন্যে তৈরী হচ্ছে তারা ইতিহাস বিশেষ পড়ে না। যে ছাত্র টেক্‌নিক্যাল কোর্স, কি কৃষিবিদ্যা, কি চারুশিল্প বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পড়বে সে ইতিহাস পৃথকভাবে পড়ে না। এমন কি যারা মানবিক বিষয়সমূহ পড়বে তারাও ইচ্ছে করলে ইতিহাস পৃথক বিষয় হিসেবে না পড়েও পারে। সমাজবিদ্যা অবশ্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমান্তর্গত এবং সমাজবিদ্যার মধ্যে ইতিহাসের

অংশও অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু পৃথকভাবে ইতিহাস পড়ার মত সেটি ফলপ্রসূ কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই স্তরে ইতিহাসের ছাত্রসংখ্যা যে অল্প হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই স্তরে ইতিহাস পড়ানোর সময় একটা কথা ইতিহাসের শিক্ষকমশায়কে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। এই স্তরের যে সব শিক্ষার্থী তারা অধিকাংশই ভবিষ্যৎ জীবনে সমাজের ও দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, নিয়ন্ত্রণ করবে দেশে দেশে মানুষে মানুষে সম্পর্ককে, গড়ে তুলবে দেশের তথা বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামো, রূপ দেবে সমাজ জীবনে,—নতুন পৃথিবীর। ভাবীকালের নেতা তারা। তারা বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ মানব সভ্যতার অধিকারী। চিন্তায় ও কর্ম্মে, নেতৃত্বে আর নিজ নিজ অবদানে আগামীকালে তারাই রচনা করবে মানব ইতিহাস। তাই এই স্তরে বিদ্যার্থীদের কাছে ইতিহাস উপস্থাপন করবার সময় ইতিহাসের যে আসল রূপ সেটি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যুগে যুগে যে চিন্তারাশি প্রভাবিত করেছে মানুষের জীবনকে, যে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে মানুষের কর্ম্মচাঞ্চল্য, যে সব কার্য্যাবলী রচনা করেছে নতুন জীবন প্রাচীনের আবহ বজায় রেখে—তাদের সম্যক বিচার বিশ্লেষণে গ্রহণ করতে হবে রাগদ্বেষহীন নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত। নানা তথ্যের মধ্য থেকে যুক্তি ও বিচারের নিক্তিতে ওজন করে আসল সত্যে উপনীত হবার পন্থাটি তাদের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিতে হবে। কোনো সিদ্ধান্ত, কোনো অবস্থা, কোনো বিষয়,—গ্রহণ করবার সময় যেন যুক্তিপূর্ণ জিজ্ঞাসা জাগে তাদের মনে। দেখতে হবে তারা যেন কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসায় হয়ে উঠে উন্মুখ। মন যেন তাদের "critical" হয়। এই স্তরে ইতিহাস পড়ানোর দায়িত্ব একদিকে যেমন বহু, অন্যদিকে তেমনি গুরু। মহাকালের পরিক্রমায় আজ পর্য্যন্ত যে বিরাট এবং সুদূর প্রসারী অতীত সৃষ্টি করেছে আজকের এই বিপুলা পৃথ্বী, তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমানের সাথে মানুষের বংশধর এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিচয় সাধন করানোর এই সুমহান সুযোগ ও বিরাট দায়িত্ব ইতিহাস শিক্ষকমশায়ের উপর ন্যস্ত।

এদায়িত্ব পালন করেন ইতিহাস-শিক্ষকমশায় পঠন-পাঠনে ইতিহাসের যথাযথ উপস্থাপনে। বিশ্লেষণ করলে তাঁর দায়িত্ব আমরা মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথমটি হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপস্থাপন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যথাযথভাবে ইতিহাসের উপস্থাপন। প্রথমটির ধারণা ইতিহাসের বিষয়-বস্তুর সমগ্রক্ষেত্র জুড়ে ব্যাপ্ত। দ্বিতীয়টি উপস্থাপনের ভঙ্গি বা ধরন। এটি পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত এবং শিক্ষকমশায়ের অস্মিতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্ক যুক্ত।

প্রথমে প্রথমটির আলোচনা করা যাক। ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ঠিক করে নেবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা, আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর অনেক দেশেই, যে শিক্ষক ইতিহাসের উপস্থাপন করে থাকেন শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠনে, তাঁর নেই। কারণ পূর্ব্ব-রচিত-পাঠ্যক্রমটি শিক্ষকমশায় শুধু অনুসরণ করে থাকেন শ্রেণীকক্ষে। অবশ্য একথাও ঠিক যে অনেক দেশে এই পাঠ্যক্রম রচনায় এই শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকমশায় কোনো অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় কোনো শিক্ষক-মশায় হয়তো অংশ গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু আমাদের সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে পূর্ব্ব রচিত ইতিহাস পাঠ্যক্রম শ্রেণীকক্ষে অনুসরণ করবার সময়ে এই স্তরে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করবার যোগ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকমশায়ের অবহিত থাকা ভাল। ইতিহাস উপস্থাপনের আদর্শ এবং উপযুক্ত বিয়বস্তুর কথা জানা থাকলে উপস্থাপন কার্য্য শিক্ষকমশায় সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারেন ; আর এতে বিষয়বস্তুকে তাঁর নিজের স্কুলের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুবিধে হয়। তা ছাড়া তাঁকে পাঠ্যক্রমের সীমিত গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ না থেকে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিস্তৃততর ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করতে হবে ইতিহাস উপস্থান করবার সময়। ইতিহাস এই বিষয়টির প্রকৃতিই এই স্বীকৃতির প্রমাণ। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিস্তৃততর ক্ষেত্রে সঞ্চরণ ইতিহাসের উপস্থাপনাকে প্রাণোচ্ছ ও বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ করে থাকে বলে অনেক অভিজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষক মনে করেন। তাই কি ধরনের বিষয়-বস্তু এই স্তরে উপস্থাপিত হবে সেটি জানা থাকলে ইতিহাস উপস্থাপনকে আমরা বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ করে তুলতে পারি।

পুরানো "Tradition"-এর উপর মোহ থাকে বলেই নয়, নিজের দেশের সম্বন্ধে মানুষের মনের গোপনে গৌরব বোধ থাকে বলেও নয়, পরিচিতের মাধ্যমে পরিচয় সহজ হয় বলেই বোধহয় সুপরিকল্পিত জাতীয় ইতিহাসের কাহিনী এই স্তরে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আজও পাঠ্যক্রমান্তর্গত। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় শুধুমাত্র জাতীয় ইতিহাসের অল্পপরিসরে শিক্ষার্থীর মন আবদ্ধ করে রাখা যুক্তি যুক্ত নয়। তাই যেখানে জাতীয় ইতিহাস পড়াবার পরিকল্পনা ইতিহাস পাঠ্যক্রমে নেওয়া হয়েছে সেখানে বিশ্বইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ইতিহাস পড়ার কথাই বলা হয়েছে। বস্তুতঃ কোনো দেশের ইতিহাসকে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে, বিচ্ছিন্ন করে আজকের জগতে দেখাটা শুধু অসঙ্গতই নয়, সেটা একটা বিরাট ভুল। বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ইতিহাসের

পঠন-পাঠনে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে থাকে। মানুষের মন সাধারণতঃ দুর্ব্বল। তাই জাতীয় শ্লাঘা ও মর্য্যাদা যেন অতিরঞ্জিত না হয়, এবং সেই লোভে ইতিহাসের বিকৃতি যেন না ঘটে; আমাদের দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির উপর অন্য দেশের যা অবদান তা অস্বীকার করবার, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার প্রলোভন যেন না আসে,—সেদিকে ইতিহাসের শিক্ষকমশায়কে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেটি সত্য সেটিকে সব সময় স্বীকার করে নিতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত ইতিহাস পঠন-পাঠনে বড় কথা।

যাতে ইতিহাস পাঠ যথাযথ হয় সেইজন্যে অনেকে এই স্তরে বিশ্বইতিহাস পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবার কথা বলে থাকেন। বিশ্বইতিহাস পাঠে একদেশদর্শীতার কোনো অবকাশ থাকে না। বিশ্বইতিহাস বলতে কিন্তু এদেশের ওদেশের সেদেশের কতকগুলি ঘটনার পরপর সংস্থাপন নয়। কালস্রোত যে প্রবাহে বহে এসেছে সারা পৃথিবীর সকল দেশের উপর দিয়ে আর তার ফলে সেই কালপ্রবাহের ক্রমকে অনুসরণ করে যে একটি সামগ্রিক ইতিহাস রচিত হয়েছে সমগ্র মানব জাতির, ইতিহাসের সেই সুসংবদ্ধ, তথ্যভিত্তিক ও ধারাবাহিক রূপটিই বিশ্বইতিহাসের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। কিন্তু পৃথ্বী বিপুলা আর কাল নিরবধি। বিশ্বইতিহাসের তথ্য তাই সংখ্যাতীত। এই অসংখ্য তথ্য রাজি থেকে তাই যথাযথ তথ্যের নির্ব্বাচন ও বিন্যাস প্রায় অসম্ভব।

সেই জন্যে অনেকে বলে থাকেন নিজের দেশের ইতিহাস পড়ার সাথে বিশ্বের ইতিহাসের দু'একটি বিশেষ বিশেষ অধ্যায় গভীর মনোনিবেশ সহকারে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করাটা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এই ধরনের অধ্যয়নে বিভিন্ন মূল উপাদান থেকে তথ্য সঙ্কলন এবং তার ব্যাখ্যা, সেই সব ব্যাখ্যা থেকে যুক্তিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে আসবার ভঙ্গি, এই ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের বিভিন্ন মতামত; বিভিন্ন মতবাদ ও যুক্তির ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত কিনা তার বিশ্লেষণ প্রভৃতি যেমন একদিকে ইতিহাস পাঠে বিশেষ উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগায় অন্যদিকে তেমনি একাগ্রচিত্তে নির্ভুল তথ্য আহরণ করবার অভ্যাস ও গড়ে তোলে। আর সেই অভ্যাসের ফলে মননশীলতার যে দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর তার দিকে প্রধাবিত হয় শিক্ষার্থীর মন।

কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের এই অধ্যায় নির্ব্বাচন নিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশ্বইতিহাসের কোন্ অধ্যায় বা কোন্ কোন্ অধ্যায় নির্ব্বাচিত হবে? অনেকে মনে করেন সমগ্র বিশ্বইতিহাসের দুটি অধ্যায় হিসেবে প্রাচীন গ্রীস ও

রোমের ইতিহাস পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে। এঁদের মতে বর্ত্তমান কালের বিশ্ব ইতিহাসের একটি দুটি অধ্যায় নির্ব্বাচন করলে অসুবিধে হবে এই জন্যে যে অপেক্ষাকৃত জটিল আবর্ত্ত সমাকীর্ণ আধুনিক কালের ইতিহাসের কোনো অধ্যায় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হলে শ্রেণীকক্ষে তার পঠন-পাঠন হবে সমস্যাসঙ্কুল। বহুভাবে বিচিত্র এবং বহুধা বিভক্ত আধুনিক ইতিহাসের ধারার কোন্‌টির উপর বেশীজোর দেওয়া হবে সেটি স্থির করা দুরূহ। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বলেন যে ঊনবিংশশতকের ইতিহাসের নির্ব্বাচিত অধ্যায়ের কোন্ বিশেষ দিকের উপর জোর দেওয়া হবে সেটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আদৌ সহজ নয়। নেপোলিয়নের গগনচুম্বী আকাঙ্খা আর তা পূরণের জন্যে তাঁর বিভিন্ন রাজ্য জয় আর তার ফলাফল কিংবা রাশিয়া বা এমেরিকার ক্ষমতার ক্রমিক প্রসার, কি যাতায়াতের, পথের বা যানবাহনের প্রভূত উন্নতি এবং শিল্পায়ন, কিংবা জাতীয় শ্লাঘার পরিতুষ্টি বিধানে উগ্রজাতীয়তার স্ফুরণ ও জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, এগুলি একদিকে যেমন জটিল অপর দিকে আবার শ্রেণীকক্ষে এগুলি উপস্থাপন করা দুরূহ, কারণ আধুনিক ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মনোভাবের দ্রুত এবং বলিষ্ঠ প্রকাশ এবং তার সঙ্গে উপরোক্ত এই বিভিন্ন দিকগুলির একটি সমতা রক্ষাকরা কষ্টকর। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্র, তার সমাজতন্ত্র, তার দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্যভাস্কর্য্য যা দিয়ে তার বলিষ্ঠ জীবন প্রবাহের নির্ম্মিতি,—তার মধ্যে এক দিকে যেমন আছে আজকের মানব সংস্কৃতির নির্ভুল প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে তেমন আছে শ্রেণীকক্ষে সেটির উপস্থাপন করবার সরলতার স্বীকৃতি। প্রাচীন রোমের ইতিহাসের পক্ষেও সেই কথাই প্রযোজ্য।

যদিও আধুনিক কালের ইতিহাস জটিল এবং নানা আবর্ত্ত সঙ্কুল তবু কেউ কেউ বিশ্বইতিহাসের অধিকতর আধুনিক কালের অধ্যায় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বিশ্বইতিহাস পাঠ্যক্রমে স্থান পাওয়া শুধু উচিতই নয় সেটির পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন একান্তভাবেই যুক্তিযুক্ত। তাঁদের এই মত পোষণ করবার কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন আজকের বিশ্বের যে ইতিহাস তার নির্ম্মিতি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে বিগত এই দুই শতকের ইতিহাস। যে ঘটনা প্রবাহ সোজাসুজি মানুষের জীবনকে এই বিংশ শতকে নিয়ে এসেছে, তার বহুধা বিভক্ত ধারার বাঁকে বাঁকে যে আবর্ত্তগুলি সৃষ্টি হয়েছে বহু ঘাত প্রতিঘাতে, সেগুলির তরঙ্গাঘাতেই তো নানা ভাঙাগড়ায় বর্ত্তমান ইতিহাসের পরিণতি। তাই সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের জানাতে

হবে। জটিল বলে সেগুলিকে পরিহার করে চললে বর্ত্তমান ইতিহাসের প্রকৃত রূপটি শিক্ষার্থীর কাছে প্রতিভাত হবে কি করে? তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রাপ্তবয়েসের জীবনকাল তো আগামী দিনের। যে দুর্ব্বার গতিবেগে আজকে বিংশ শতকের শেষার্দ্ধে মানুষের জীবন চলেছে অনন্ত কালের প্রবাহে, যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের সমাজে, রাষ্ট্রে, আর তার চিন্তাস্রোতে, তাতে যে শিক্ষার্থীর জীবন-কালে, আগামী দিনের ইতিহাস আরও জটিল ও আবর্ত্ত সঙ্কুল হয়ে উঠবে সেটি বেশ স্পষ্ট। তাই অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতকের ইতিহাসের যে আবর্ত্তে আর সমস্যায় পাক খেয়ে খেয়ে গড়ে উঠেছে আজকের ইতিহাস সেগুলি জানতে হবে আজকের ইতিহাসকে সম্যকভাবে জানবার তরে, আগামী কালের ইতিহাস রচনা করবার তরে। বরঞ্চ সুদূর অতীতের ইতিহাস বর্ত্তমানের ইতিহাস পড়ায়, বর্ত্তমানকে জানার প্রয়োজনে, বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। গ্রীস, রোম বা মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রভাব বিংশশতকের ইতিহাসের উপর অপ্রত্যক্ষ, কিন্তু অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের ইতিহাসের প্রভাব বর্ত্তমানের উপর প্রত্যক্ষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আজকের দুনিয়ার যেগুলি প্রধান সমস্যা এবং জরুরী প্রশ্ন যেমন নবজাগ্রত অফ্রিকার আশা আকাঙ্খা, পূর্ব্বপশ্চিমী জাতিগোষ্ঠীর চিন্তাপার্থক্য, রাশিয়া ও আমেরিকার পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ভীতি, অন্ধ-জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক মনোভাবের পটভূমিকা, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান সূচনা, চীন, জাপান ও জার্ম্মানীর সমস্যা সেগুলিকে সবইতো সাক্ষাৎ ভাবে সৃষ্টি করেছে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের ইতিহাস। তাই এই সমস্যাগুলির সামনে মুখোমুখী দাঁড়াতে গেলে অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের বিশ্বইতিহাস না পড়লে চলবে কেন?

আবার এমনও অনেক আছেন যাঁদের মতে আজকের দুনিয়ার কথা,—"সমসাময়িক ইতিহাস" ও পাঠ্যক্রমান্তর্গত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁরা বলে থাকেন যে বর্ত্তমানকে জানা এবং ভবিষ্যৎকে রচনা করা যদি ইতিহাস পড়ানোর একটি উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হয় তাহলে বর্ত্তমান দুনিয়ার ইতিহাসকে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাছাড়া ইতিহাস পড়তে পড়তে হঠাৎ একজায়গায় আমাদের "আজ" থেকে কিছু দূর আগে ইতিহাসের ধারাপ্রবাহে একটি পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আধুনিক কালের ইতিহাসকে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিলে এই অবস্থা হয়। এতে অধিকাংশ বিষয়ের সম্বন্ধেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করবার অবকাশ পায়না। ইতি-হাসের বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যে ক্রমিক পরিণতি, আজ পর্য্যন্ত তার যে সামগ্রিক রূপ,

তার অখণ্ডতা ও ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে ধারণা থেকে যায় অস্পষ্ট। গাড়ী চলতে চলতে গন্তব্য পৌঁছাবার কিছু আগে এসে থেমে গেছে, আর চলবে না। আরোহীরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবার নিজ নিজ ব্যবস্থা করে নেয় এরকম ক্ষেত্রে। ইতিহাস পড়তে পড়তে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ বা দ্বিতীয় বিশ্বমাহাযুদ্ধ অবধি এসে ইতিহাসের গতি পাঠ্যক্রমে থেমে গেল, বাকিটুকুর ব্যবস্থা কি হবে? শিক্ষার্থীরা কি তার ব্যবস্থা নিজে নিজে করে নেবে? পাঠ্যপুস্তকে কালের যাত্রাপথের যে জায়গায় এসে ইতিহাসের ধারা থেমে গেল তারপর থেকে আজকের বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ইতিহাসের যা পরিণতি সেটা কি শিক্ষার্থীদের অজ্ঞাত থেকে যাবে? ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্যের তালিকায় অনেক জিনিস অন্তর্ভুর্ক্ত করা হয়েছে। এই তালিকায় অন্তর্ভুর্ক্ত বহু বিষয়গুলির মধ্যেআছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার প্রণালী ও গণতন্ত্রের ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্যেদিয়ে তার বর্ত্তমান রূপের ধারণা লাভে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা, সমসাময়িক কালের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের জানবার সুযোগ করে দেওয়া—এমনিঅনেক জিনিসই এই তালিকায় স্থান লাভ করেছে। "সমসাময়িক কালের ইতিহাস" পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিলে এই উদ্দেশ্যগুলি সফল হওয়া সম্ভব হবেনা। তাই এঁদের মতে এটি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। যাঁরা এর বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন তাঁরা বলেন সমসাময়িক কালের ইতিহাস তো ঠিকভাবে রচিত ও বিন্যস্ত হবার সময় পায়নি। ধীর চিন্তায়, প্রজ্ঞাপূর্ণ অনুশীলনে, অনুসন্ধিৎসু বিশ্লেষণ,—যুক্তিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ,—এখনও তার সম্বন্ধে হয়নি। তাই সমসাময়িক কালের ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি এখনও পর্য্যন্ত উপসংহারহীন মতামতের, অনেক সময় বিরুদ্ধ মতামতের এবং যুক্তিতর্কের, বাণ্ডিলই থেকে যায়। মহাকালের অভিক্ষেপে ঘটনার আবর্ত্তসঙ্কুল পরিবেশে স্থির সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের স্বচ্ছ, স্পষ্ট মূর্ত্তিটি এখনও পরিস্ফুট নয়। সুতরাং এই ধরনের বিষয়ে আছে বিতর্ক, সংশয়, বাদপ্রতিবাদ। এগুলি শ্রেণীকক্ষে নিয়ে আসবার অর্থ হচ্ছে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে সংশয় এবং সন্দেহপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে এনে তাদের রাজনীতির আবর্ত্তে নিক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে আছে বিভিন্ন ধরনের যুক্তি-তর্কের অনিশ্চিৎ পদক্ষেপ; কাজে কজেই এখানে আসবে স্ব স্ব মতবাদের প্রচার, প্রোপাগ্যাণ্ডা, অপরিণত মন শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ মতবাদে দীক্ষিত করার প্রতিযোগিতামূলক প্রয়াস। সেই জন্যে সমসাময়িক কালের ইতিহাসের পঠন-পাঠনে শ্রেণীকক্ষে একটি অশুভ এবং অস্বাস্থ্যকর

পরিবেশের রচনা হয়ে থাকে। পাঠ্যক্রমে এটির অন্তর্ভুক্তি তাই বিচার সম্পৃক্ত নয় বলেই এঁদের মত।

সমসাময়িক কালের ইতিহাস শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর অসুবিধে আছে, না পড়ানোরও অসুবিধে আছে। এটির পঠন-পাঠনে যে সব ঘটনাগুলি এখনও পরিণত রূপ নেয় নি, যাদের প্রবাহ রয়ে গেছে এখনও অসম্পূর্ণ সেই সব ঘটনাশ্রিত বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের মধ্যে যেমন সিদ্ধান্তের অনিশ্চয়তা আছে তেমনি আছে বিতর্কমূলক বিষয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের টেনে আনা। এটি না পড়ালে বর্ত্তমানের ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর পরিচয় যথাযথ হবে না, অনেক বিষয় থেকে যাবে তাদের অজ্ঞাত। আর তার ফলেই কোনো আবাঞ্ছিত প্রভাব তার চিন্তা এবং কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবার অবকাশ পাবে। নিজস্ব ব্যক্তিতা ও মতামত সুগঠিত হবার আগেই সে কোনো রাজনৈতিক মতবাদের কুক্ষিগত হয়ে যেতে পারে। এ সমস্যার সমাধান অনেকে করবার চেষ্টা করে থাকেন ইতিহাস পাঠ্যক্রমের মধ্যে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে নয়, চলতি দুনিয়ার খবর বা "Civics" নামে স্বতন্ত্র একটি বিষয়ের পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে।

ইতিহাসের পাঠ্যক্রমান্তর্গত হয়ে ইতিহাস-শ্রেণীকক্ষেই হোক, আর Current affairs" বা "Civics" নাম দিয়ে পৃথক শ্রেণীকক্ষেই হোক, সমসাময়িক ইতিহাসের পঠন -পাঠন নির্ভর করে প্রধাণতঃ শিক্ষকশমায়ের নিজের অধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসের উপর পড়াশোনা, এই ইতিহাসের তথ্যগুলি যথাবথভাবে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, বিতণ্ডা এড়িয়ে চলে, উপস্থাপন করবার ক্ষমতা, এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির উপর। শিক্ষকমশায় ছাড়াও শিক্ষার্থীদের মনীষার মান, ইতিহাসে তাদের জ্ঞান, হালদুনিয়ার খবরাখবর জানবার জন্যে তাদের আগ্রহ ও কৌতুহল, তাদের গৃহের ও স্কুলের পরিবেশ প্রভৃতি চিন্তা করতে হবে। এসব বিষয়গুলি চিন্তা করেই শিক্ষক মশায় নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এই বিষয়টি পঠন-পাঠন সম্বন্ধে। এই বিষয়ান্তর্গত যে সব বিশেষ বিশেষ বিয়য়বস্তুর সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য থাকবে, নির্ভরযোগ্য উপকরণ থাকবে, সেই সব বিষয়বস্তুগুলির উপস্থাপনই শ্রেণীকক্ষে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেগুলির সম্বন্ধে এসব মিলবে না, সেগুলির পঠন-পাঠন চলবে না।

এই স্তরে উপস্থাপিত হবার জন্যে ইতিহাসের বিষয়বস্তু কি ধরনের হবে সেটি পর্য্যালোচনা করে দেখবার পর স্বভাবতই কি উপায়ে বিষয়বস্তুগুলির উপস্থাপন কার্য্য শ্রেণীকক্ষে সম্পাদন করা হবে সেটির সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। এই কাজটি ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতির দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। পদ্ধতি

আবার শিক্ষকমশায়ের অস্মিতার সঙ্গে বিশেষভাবে এবং আরও কতকগুলি বিষয়ের সাথে সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট। "ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি"—এই অধ্যায়ে পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তবে সে আলোচনাটি সাধারণ-ভাবে করা হয়েছে। এখানে এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সাঙ্কের দিকে নজর রেখে কি ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করলে ইতিহাসের উপস্থাপন ফলপ্রসূ হবে আমরা সেই কথাই বিবেচনা করে দেখবো।

পড়ানোর পদ্ধতি পড়ানোর উদ্দেশ্যের সাথে গভীর সম্পর্কে যুক্ত। ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য একটি নয়। দেশ, কাল, সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতির চাহিদা অনুসারে উদ্দেশ্য সেথা নিয়ন্ত্রিত তাই সেটি একাধিক ও ভিন্ন ভিন্ন। বলা বাহুল্য এ উদ্দেশ্যকে আদর্শ উদ্দেশ্য বলা যায় না। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার উপরই পদ্ধতির প্রকৃতি কি হবে সেটি নির্ভর করবে। কোথাও হয়ত চাহিদা এই যে শিক্ষার্থী এই স্তরের যেটি সাধারণ পরীক্ষা সেটি উত্তীর্ণ হয়ে যাক, আবার কোথাও বা শিক্ষার্থীর স্বচ্ছ চিন্তা এবং অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলার উপরই জোর দেওয়া হয় বেশী। স্বাভাবিক কারণেই পরীক্ষা পাশ করানোর জন্যে যে পড়ানোর পদ্ধতি অবলম্বিত হবে সেটি শিক্ষার্থীর স্বচ্ছ চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলার জন্যে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তার থেকে পৃথক হবে। তেমনি আবার কোথাও ইতিহাসের ঘটনা সম্পর্কে তথ্যযুক্ত জ্ঞান (factual knowledge) লাভ করবার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়, কোথাও বা বিশ্লেষণাত্মক বিচারে শিক্ষার্থীর মনটিকে "Critical" করে গড়ে তোলার দিকে ঝোঁকটা থাকে বেশী; কোথাও বা এই স্তরের পর কলেজ যাবার জন্যে প্রস্তুতি হয়, আবার কোথাও বা এই স্তর থেকে সরাসরি কর্ম্মক্ষেত্রে নানা ধরনের চাক্‌রীর মধ্যে প্রবেশলাভ করবার আয়োজন। তাই এই সব বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদ্ধতিও হবে ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া আমরা দেখেছি যে নানা কারণে এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাবে ইতিহাস পড়ানোর (শুধু ইতিহাস পড়ানোর নয়, এটি সব পদ্ধতির সম্বন্ধেই বলা চলে) একটি সর্ব্বজন স্বীকৃত এবং সর্ব্বকালে গৃহীত একটি পদ্ধতি,—একটি বাঁধা ছক, একটি সিদ্ধান্তকৃত ফরম্যুলা, ঠিক করে নেওয়া যায় না। তাই এখানে এই স্তরে কি ধরনের পদ্ধতি সাধারণতঃ অনুসরণ করলে সেটি কার্য্যকরী হবে সেই কথা আমরা বিচার করে দেখবো মাত্র।

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুলেই মৌখিক পদ্ধতিটিই সাধারণতঃ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যে যে কারণে অন্যান্য বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এবং অধুনা প্রবর্ত্তিত বিশেষ ধরনের পদ্ধতিগুলি আমাদের স্কুলগুলিতে অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনা

সেগুলি আমাদের কাছে অবিদিত নয়। মৌখিক পদ্ধতি, গল্পবাদ দিয়ে, এবং একেবারে একনাগাড়ে বক্তৃতা না হলে, এই স্তরে বিশেষ ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা রাখে। শিক্ষার্থীদের মন পাঠাভিমুখী করে পূর্ব্বজ্ঞানের পটভূমিকায় নতুন বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করা এবং টিচিংএইডস যথাযথ ব্যবহার করে, ব্ল্যাকবোর্ডে সংক্ষিপ্তসার লিখে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়ে, তাদের প্রশ্ন করে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর আদায় করে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে,—বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের কাজটি শিক্ষকমশাই প্রাণ-প্রাচুর্য্যে এবং বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তুলতে পারেন এই পদ্ধতির অনুসরণে। এই স্তরের শেষের দিকে শিক্ষার্থীদের কিছু কিছু বলবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করে থাকেন শিক্ষকমশায়। তাছাড়া, কোনো নতুন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মন পাঠাভিমুখী করবার জন্যে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে আহৃত তথ্যগুলি উপস্থাপিত করবার জন্যে মনোজ্ঞভাবে বলবার মূল্য আছে বৈকি। অনেক অভিজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষক এই স্তরে মাঝে মাঝে নিছক বক্তৃতা দেওয়ার ও পক্ষপাতী! তাঁদের মতে ষোল সতেরো বছর বয়সের শিক্ষার্থী বক্তৃতা থেকে যথেষ্ট শিখতে পারে। এতে শুনে শেখার অভ্যাস তাদের হয়, বক্তৃতা থেকে "নোট" নেওয়ার শিক্ষা তাদের শুরু হয়। মনোজ্ঞ বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে বিষয়বস্তুর প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি করা, নানা ধরনের তথ্য সুসংবদ্ধ ভাবে উপস্থাপিত করা, সহজ হয়। তবে এই ধরনের বক্তৃতা শিক্ষার্থীদের মনীষার মান, তাদের বিষয়গত জ্ঞান প্রভৃতি বিচার করে সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরী করতে হবে। বক্তৃতার মধ্যে কি-কি বিষয় আছে এবং এটির উদ্দেশ্যই বা কি, শুরুতেই সেগুলি শিক্ষার্থীদের ভাল-ভাবে জানিয়ে দিতে হবে। অনেক স্থলে তাই শিক্ষকমশায় বক্তৃতাটির একটি সংক্ষিপ্তসার পূর্ব্বাহ্নেই ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে রাখতে পারেন এবং বলার সময় তার এক একটি অংশের দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের "নোট" নেওয়া সম্বন্ধেও শিক্ষকমশায়ের কিছু কর্ত্তব্য আছে। তিনি দেখবেন যে শিক্ষার্থী যেন খুব সংক্ষিপ্তাকারে নোট নেয়। শিক্ষকমশায় যা বলছেন সেটি যেন শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে শোনে; শিক্ষকমশায়ের বক্তৃতা কেবল টুকে নেবার ব্যগ্রতায় বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করাটা যেন গৌণ না হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের স্কুলগুলির বর্ত্তমান অবস্থার সব দিক বিবেচনা করে আমাদের অভিমত এই যে সেখানে একনাগাড়ে বিশুদ্ধ বক্তৃতা দেবার পদ্ধতি অবলম্বন করে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন না হওয়াই ভাল। প্রয়োজন মত শিক্ষকমশায় মাঝে মাঝে বক্তৃতার সাহায্য নেবেন। বক্তৃতা একনাগাড়ে হবে না। বক্তৃতার অশুভ ফলকে

সর্ব্বপ্রকারে পরিহার করবার জন্যে যাবতীয় সাবধানতা অবলম্বন করবেন তিনি।

"তর্ক ও আলোচনা" এই স্তরে ইতিহাস পঠন-পাঠনের একটি অতি মূল্যবান পদ্ধতি। শ্রেণীকক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন করবার জন্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা, এই পরিকল্পনার রূপায়ণ কল্পে শিক্ষকমশায় এবং শিক্ষার্থীদের যথাযথ প্রস্তুত হওয়া, প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের লক্ষ্যে উপনীত হয়ে উদ্দেশ্য সাধন করা এবং শেষ পর্য্যায়ে আলোচনার মূল্যায়ন করা কিভাবে এবং কি কি উপায়ে সংসাধিত হবে সে আলোচনা "ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি" এই অধ্যায়ে "তর্ক ও আলোচনা"—এই শিরোনামায় আমরা করেছি। এখানে সে আলোচনা তাই নিষ্প্রয়োজন। এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে স্কুলে নানা রকমের "রেফারেন্স"-বই-এর অভাব, উপযুক্ত গ্রন্থাগারের অভাব, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকমশায়দের বিষয়বস্তুর উপর দখলের এবং পেশাগত প্রস্তুতির অভাব এই পদ্ধতির প্রয়োগ করার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার অভাব,—এই সব সর্ব্বগ্রাসী অভাবের মধ্যেও উৎসাহী ইতিহাস শিক্ষককে এগিয়ে আসতে হবে। নিজ চেষ্টায় এই পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন চালানোর মত ব্যবস্থা নিজস্কুলের অবস্থা এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে যতটা সম্ভব অন্ততঃ পরীক্ষা-মূলক ভাবেও যদি কাজে নাবেন তাতে লাভ হবে। এর একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে। বহুদিনাগত জড়তা, আশাহীনতা, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে তারুণ্যের জয়লাভ সুনিশ্চিৎ।

"তর্ক ও আলোচনা ছাড়া" উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মূল উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি, "য়ুনিট" পদ্ধতি, "প্রোবলেম ও প্রোজেক্ট" প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে ইতিহাস পড়ানো হলে ইতিহাসের উপস্থাপন সাফল্যে আর প্রাণ প্রাচুর্য্যে, বৈচিত্র্যে আর সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। এগুলির সম্বন্ধেও "ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতি"—এই অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তাছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ কোনো বক্তব্য আমাদের নেই।

ইতিহাস উপস্থাপনের পদ্ধতি শিক্ষকমশায়ের অস্মিতার সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত। যে পদ্ধতিই হোক আর সেটি যত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই হোক শিক্ষক ছাড়া সেটি অর্থহীন, একটি "কথার কথা" মাত্র। শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষক-মশায়ের অস্মিতার প্রতিফলনে বিদ্যা আহরণ সম্পাদিত হয়। কাজে কাজেই পঠন-পাঠনে শিক্ষকমশায়ের ব্যক্তিতার প্রভাব অবর্ণনীয়। ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষকমশায়ের যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর মনের প্রসারতা, নৈর্ব্যক্তিক উদারতা, তাঁর আন্তর্জাতিক মনোভাব শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অনুরক্তি জাগিয়ে

তুলতে সাহায্য করে; বিশেষ করে এই স্তরে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেখানে অল্প, নিবিড় পরিচয়ের এবং ঘন সান্নিধ্যের অবকাশ যেখানে পর্য্যাপ্ত—সেখানে ইতিহাস-শিক্ষকমশায়ের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনেক কিছু করতে পারে।

এই স্তরে ইতিহাস উপস্থাপন প্রসঙ্গে শিক্ষক মশায় আর একটি কাজ অতি অবশ্যই করবেন। এই সময় থেকেই শিক্ষার্থীর পড়ার অভ্যাস যাতে হয় সেই জন্যে তাঁকে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের এই বই পড়া শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য পাঠ্যপুস্তক এবং সমধর্ম্মী পুস্তকের মধ্যে সেটি প্রসারিত হবে। শিক্ষার্থীর স্কুল জীবনের এই পড়ার অভ্যাস তার ভবিষ্যৎ জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিক্ষার্থীর এই বই পড়া অবশ্য শিক্ষকমশায়ের নির্দ্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীর পড়বার জন্যে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য পুস্তক, ম্যাগাজিন, পুস্তকাংশ প্রভৃতি নির্ব্বাচন করা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষকমশায়ই এই কাজ করবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আছে, বিষয়বস্তুর বিস্তৃতক্ষেত্রে তাঁর দখলের ব্যাপ্তি আছে। শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর ঘনসান্নিধ্যের জন্যে তাদের প্রাতিস্বিক প্রয়োজন জানবার সুবিধে আছে। শিক্ষার্থীর এই পড়ার অভ্যাসের সূত্রধরেই তার স্বাধীন চিন্তাশক্তি উৎসারিত হবে। এই স্তরেই শিক্ষার্থীর অস্মিতার রূপায়ণ প্রায় সমাধার পথে। শিক্ষার্থীর চিন্তাকে অপরের চিন্তার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীর চিন্তা স্বকীয়, স্বাধীন হয়ে উঠবার অবকাশ পায়। আবার যে সংস্কার আছে সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আস্তীর্ণ, তার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে শিক্ষার্থীর চিন্তাকে; তা না হলে শিক্ষার্থীর নৈর্ব্যক্তিক মনের কাঠামোটি রচনা করা সম্ভব হবে কি করে? পঠন-পাঠন অর্থে শিক্ষার্থীকে নিজ মতে দীক্ষিত করা নিশ্চয়ই নয়। তাই স্বকীয় চিন্তাধারায় শিক্ষার্থীর মন যেন অভিষিক্ত হয় এই স্তরে, শিক্ষক মশায় সে দিকে লক্ষ রাখবেন, সেই কাজে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন।

কাজের মধ্যেদিয়ে শেখার কাজ দ্রুত হয়, সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে সেটি পূর্ণতা লাভ করে। তাই বিভিন্ন ধরনের কাজও শিক্ষকমশায় এই স্তরে শিক্ষার্থীদের দেবেন। বিভিন্ন ধরনের এই কাজগুলি শিক্ষার্থী একক বা ব্যক্তিগতভাবে করতে পারে আবার অপরাপর শিক্ষার্থীদের সাথে একজোটে দল বেঁধেও করতে পারে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কাজের মধ্যে "নোট" নেওয়া একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এই "নোট নেওয়া বা "নোট" তৈরী করার কাজটি

একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। "নোট তৈরী করার জন্যে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবিষয় পড়তে হবে, শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন চলাকালীন পাঠে মনোযোগ দিতে হবে। শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত নানাধরনের তথ্যনিচয়ের অল্পকথায় বিন্যাস সাধন করতে হবে। শিক্ষকমশায় প্রদত্ত শিরোনামাগুলির উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তুকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এ কাজে শুনে শেখার অভ্যাস হবে। পাঠ অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গে নোট নেওয়ার অভ্যাস যে সমস্ত শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের পক্ষে একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। শিক্ষকমশায় মাঝে মাঝে শিক্ষর্থীর "নোট বুকটি" পরীক্ষা করে দেখবেন। শিক্ষার্থী যেন নোট নেবার ঝোঁকে শ্রেণীকক্ষে আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে পিছিয়ে না পড়ে (নোট নেবার সময় অনেক শিক্ষার্থীরই এই অবস্থা হয়। শ্রেণীকক্ষে আলোচনা এগিয়ে চলেছে, শিক্ষার্থী হয়তো পাঁচমিনিট আগেকার আলোচিত বিষয়টির সম্বন্ধে মাথা ঘামাচ্ছে কারণ সেটির সম্বন্ধে যথাযথ 'নোট' নেওয়া তখনও তার সমাপ্ত হয়নি)। শিক্ষার্থী যেন আগ্রহাতিশয্যে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব একধারথেকে টুকে না নেয়। "নোট" তৈরী করা ছাড়া শিক্ষকমশায় কোনো বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে কিছু লিখতে দিতে পারেন। লেখা যেন বিশ্লেষণাত্মক হয়। এই স্তরে কার্য্যকারণের নিগূঢ় সম্পর্ক বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে শিক্ষার্থীর। এছাড়া ত্রুটি পরস্পর বিরোধী তথ্যের মধ্যে থেকে যুক্তিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত কিভাবে শিক্ষার্থী গ্রহণ করে সেটি দেখবার জন্যে সেরকম বিষয়ও শিক্ষকমশায় লিখতে দিতে পারেন। লেখা রচনামূলক হবে। বিষয়-বস্তু এমন হবে যে সে সম্বন্ধে লেখার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তা ও মননশীলতাও যেমন থাকবে তেমনি থাকবে তার মধ্যে পরিশ্রমের ছাপ। রচনামূলক লেখা ছাড়াও নানা ধরনের চার্ট, ডায়াগ্রাম, মানচিত্র, বিভিন্নপ্রকারের লেখ প্রভৃতিও শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ "নোটবুকে" করবে।

দলবেঁধে একজোটে করবার যে সমস্ত কাজ সেগুলির মধ্যে তর্কও আলোচনা, নাটক রচনা ও নাটকাভিনয় সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বিভিন্ন ধরনের নাট্যরূপায়ণ, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থানসমূহে ভ্রমণ, জাদুঘরে এবং সংগ্রহশালায় গমণ, নানাপ্রকারের ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্বলিত বস্তুনিচয়ের সংগ্রহ এবং সেগুলি স্কুল ম্যুজিয়মে সংরক্ষা..........প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। এছাড়া স্কুলে প্রদর্শনী করা, ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্বলিত সংগৃহীত জিনিসগুলি এবং শিক্ষার্থীদের হাতে তৈরী মানচিত্র, লেখ, মডেল প্রভৃতি ঐ প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা, বিভিন্নপ্রকারের মডেল

তৈরী করা, ইতিহাসের বুলেটিন্ সম্পাদন করা এবং নিয়মিত সেগুলি প্রকাশকরা (বুলেটিন কতদিন অন্তর প্রকাশ করা হবে সেটি ইতিহাস শিক্ষক স্কুল পরিবেশ অনুযায়ী ঠিক করে নেবেন), ইতিহাসের ক্লাব স্কুলে গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে মাঝে মাঝে আলোচনা চক্র আহ্বান করা, এই সব আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীদের রচিত (ইতিহাস সম্পর্কিত নিশ্চয়ই) নানাধরনের প্রবন্ধ পড়া, বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের মাঝে মাঝে ঐ সব আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত করে আনা এবং তাঁদের কাছ থেকে কিছু শোনা……প্রভৃতিও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

সবশেষে একটি কথা বলে আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহারে আসবো। আমাদের শেষকথা এই যে উপস্থাপনের পদ্ধতিই হোক আর শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজই হোক, সবকিছুই নির্ভর করে শিক্ষকমশায়ের উপর।

———

ইতিহাস পঠন-পাঠনের মূল্যায়ন

মূল্যায়ন কথাটির অর্থ ব্যাপক, পরীক্ষার অর্থ সীমিত। পরীক্ষার পরিবর্ত্তে মূল্যায়ন কথাটি আমরা অধিকতর অর্থপূর্ণ বলে মনে করি। আর সেই জন্যে মূল্যায়ন কথাটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানুষের জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের মত, মূল্যায়ন করবার রেওয়াজ বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। যখনই আমরা একাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে তুলনা করি এবং একজনকে আর একজনের থেকে ভাল বলি বা মন্দ বলি তখই এই মূল্যায়নের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। আমরা এখানে আমাদের দেশের স্কুলগুলির বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস পাঠন-পাঠনের মূল্যায়ন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

ইতিহাস পঠন-পাঠনে মূল্যায়নের প্রয়োজন কেন ? মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা একাধিক কারণে অনুভূত হয়ে থাকে। মুখ্যতঃ এটির দ্বারা শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর অর্জ্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। ইতিহাস পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞান আহরণ করতে, যে অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করতে, শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা হয় সেটি শিক্ষার্থীর কতটুকু লাভ হয়েছে তা নিরূপণ করা এই মূল্যায়ন কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সঙ্গেই আর একটি কাজ হয়ে যাওয়া আবশ্যক বলে আমরা মনে করি। সেটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জ্জিত জ্ঞানের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ-ক্ষমতা পরীক্ষা করা। এটি কিন্তু বর্ত্তমান পরীক্ষায় হয় না। এটি পরীক্ষা করবার চেষ্টা না করলে, এটির দিকে দৃষ্টিপাত না করলে, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সীমা বই-এর পাতা ছাড়িয়ে কোন দিনই প্রসারিত হবে না, শিক্ষার্থীর জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পুঁথিগত হয়ে থাকবে। এই দুটি জিনিসের সঠিক অবস্থা জানতে পারলে ইতিহাস পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য কতখানি সার্থকতা লাভ করেছে সেটি জানা সম্ভব হয়। মূল্যায়নের এই দিকটি, শিক্ষার্থীর উপর পঠন-পাঠনের ফল কেমন হয়েছে সেই প্রান্তেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ইতিহাস জ্ঞানের পরিসীমা ও গভীরতা নির্দ্ধারণ করা হয়, ইতিহাস এই বিষয়টির মধ্যে যে অভিজ্ঞতা আধৃত সেটি শিক্ষার্থী কতখানি আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছে তা নিরূপণ করা হয়, ইতিহাস শিক্ষার সাঙ্গিকরণ শিক্ষার্থীর কতটুকু হয়েছে তার পরিমাপ করা হয়। এই মূল্যায়নের

সূত্র ধরে আমরা আর একটি সমীক্ষায় উপনীত হতে পারি। এই সূত্র ধরে একটু এগিয়ে গেলেই আমরা জানতে পারি কোন্ কোন্ উপায়ে, কোন্ দিক থেকে, ইতিহাস পঠন-পাঠন অধিকতর ফলপ্রসূ করবার প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং কি উপায়েই বা সে প্রয়োজন সাধন করা যায়। মূল্যায়নের ফলে যদি আশানুরূপ কিছু না পাওয়া যায়, কি অসন্তোষজনক কিছু চোখে পড়ে,—তাহলে সেটি এলো কোন্ রন্ধ্র পথে,—শিক্ষকমশায়ের অক্ষমতা, পঠন-পাঠনে অনুসৃত পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা, কিংবা পাঠ্যক্রমের বিন্যাসে কোনো বিচ্যুতি, কি শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি,—অনুসন্ধান করলে সেটিও আমাদের দৃষ্টিপথে আসে, সেটির সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়ে ঘাটতি পূরণ করবার জন্যে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি।

আমাদের দেশের স্কুলগুলির বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস পঠন-পাঠনের মূল্যায়ন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার সূচনাতেই এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণ ভাবে পরীক্ষা সংস্কার করবার প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করছি আজ। এই নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছি, অনেক কাটখড় ও পুড়ছে। নানা সিম্পোসিয়াম, সেমিনার হচ্ছে, তাদের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ দিয়ে কাজে পরিণত করবার চেষ্টাও হচ্ছে। কিন্তু আমরা এখানে শিক্ষার সাধারণ মূল্যায়নের আলোচনায় না গিয়ে ইতিহাস পঠন-পাঠনের মূল্যায়নের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করেছি।

ইতিহাস পঠন-পঠিনের মূল্যায়নের সাথে ইতিহাস পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। যে কোনো কাজের মূল্যায়ন করার গোড়াতেই আছে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুষ্ঠু ও যথাযথ ধারণা। সেই উদ্দেশ্য কতোখানি সফলতা লাভ করেছে তাই দেখেই হয় সেই কাজের মূল্যায়ন। তাই ইতিহাস পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য কতোখানি সফল হয়েছে তাই দেখেই ইতিহাস পঠন-পাঠনের যথাযথ মূল্যায়ন হবে। ইতিহাস পঠন-পাঠনের যা উদ্দেশ্য তার সফলতা বিফলতা জানতে হলে যাদেরকে ইতিহাস পড়ানো হয়েছে' তাদের উপর এই পড়ানোর কি প্রভাব হয়েছে সেটি দেখতে হবে। তাদের উপর যে ধরনের প্রভাব আশা করে ইতিহাস পড়ানো হয়েছে সে আশা কতোখানি পূরণ হয়েছে সেটির হিসেব করতে হবে। এটির হিসেব করতে হলে যে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস পড়েছে তাদের এই বিষয়ে অর্জ্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা পরিমাপ করতে হবে; আর বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে সে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্যগুলিকে কতটুকু পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্যের তালিকা দেখেছি, সেখানে বহুকথা এবং বহুবিধ কথা লেখা। সেগুলি সব না হলেও অন্ততঃ প্রধান প্রধান যেগুলি, সে উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে ইতিহাস পঠন-পাঠন সক্ষম হয়েছে কি না সেটি দেখতে হবে। আমরা এ কাজ করি কি করে? আমরা সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। তারা সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়। শিক্ষার্থীদের উত্তর থেকে আমরা সাধারণতঃ বিচার করে দেখি পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যগুলি কতোখানি সফল হয়েছে। এছাড়া বর্ত্তমানে আমাদের হাতে আর অন্য কোনো উপায় নেই যা দিয়ে আমরা ইতিহাস পঠন-পাঠনের মূল্যায়ন করতে পারি। অধিকতর কার্য্যকরী কোন উপায় উদ্ভাবিত হবে কিনা সে কথা অবশ্য ভবিষ্যৎ বলবে।

এই ধরনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইতিহাস পঠন-পাঠনের মূল্যায়ন করার কাজের দুটি ভাগ অবশ্যই থাকবে। একটি ভাগ সীমাবদ্ধ থাকবে পঠন-পাঠন চলতে থাকাকালীন শিক্ষার্থীর স্কুলের জীবনে। সেটি প্রতি শ্রেণীতে এবং শ্রেণীর থেকে স্তরে (মাধ্যমিক শিক্ষায়—নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) চিহ্নিত করে নেওয়া যায়। আর অপর ভাগটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর স্কুল জীবনের পরিসমাপ্তিতে। প্রথম ভাগের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষকমশায়রা যাঁরা শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠন পরিচালনা করে থাকেন শিক্ষার্থীর সাথে তাঁদের প্রতিটি দিনের ঘন সান্নিধ্যের মধ্যে দিয়ে,—অরুপণ দেওয়া-নেওয়ায়, গল্পে আলোচনায়, লেখায় আঁকায়, হাতের কাজে, একক কাজের বা সমবেত কাজের মধ্যে দিয়ে। অন্যটি করে থাকেন সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের অপরিচিত তৃতীয়-ব্যক্তি, স্কুলজীবনের সমাপ্তি সূচক যে পরীক্ষা তাতে। বলা বাহুল্য যে আমরা এখানে স্কুলজীবন বলতে মাধ্যমিক স্কুলকেই বলছি।

স্কুলজীবনের সমাপ্তি জ্ঞাপন করে বলেই এই পরীক্ষায় (আমাদের দেশে এটি স্কুল ফাইনাল কি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা) সারা স্কুলজীবনের ইতিহাস পড়ার এবং পড়ানোর মূল্যায়ন এই পরীক্ষায় করবার চেষ্টা করা হয়। আর সেই জন্যেই বোধহয় আমরা এই পরীক্ষার উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করি। আর এই পরীক্ষার উপর পরীক্ষার্থীর জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করে বলে এই পরীক্ষাটিও তার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে ভাবে এখানে মূল্যায়ন কাজটি সমাধা করা হয়ে থাকে তাতে স্বাভাবতই মনে কতকগুলি প্রশ্ন জাগে। প্রথম কথা এটি বাইরের (External) পরীক্ষা; বাইরের লোক, যাদের সাথে শিক্ষার্থীর হয়তো কোনদিনই দেখাশোনার অবকাশ পর্য্যন্ত হয়নি তাঁরাই করছেন মূল্যায়ন, আর তাঁদের এই মূল্যায়নই চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত হচ্ছে। আর যাঁরা শিক্ষার্থীর সারা স্কুলজীবন ধরে

তাদের সাথে প্রতিপদক্ষেপে নিবিড় পরিচয়ে সম্পর্কিত হয়েছেন, যাঁরা শিক্ষার্থীর প্রায় "নাড়ি নক্ষত্র" জানেন, এই মূল্যায়নে তাঁরা কিন্তু একটি কথা বলার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। তাছাড়া সারাটি স্কুলজীবনের পড়ার, কাজ-করার ফল, এই তিনঘণ্টা লেখার মধ্যে দিয়ে নিরূপিত হচ্ছে। মানুষের মনের উপর কারো হাত নেই। তার গতি বোঝাও ভার। যে কোন কারণে শিক্ষার্থীর মনের অবস্থা এই পরীক্ষার সময় খারাপ থাকতে পারে। কোনো শিক্ষার্থী হয়তো তাড়াতাড়ি লিখতে পারেনা, পরীক্ষার মুহূর্ত্ত ও তার বাস্তব পরিবেশ শিক্ষার্থীর স্নায়ুর উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি অবাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করে, আর প্রশ্নের ধরনের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু তাহলে কি হয়, এই তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লিখিত উত্তরের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর স্কুল জীবনের ইতিহাস পড়ার চূড়ান্ত মূল্যায়ন হয়ে যায়। শিক্ষার্থী স্কুলজীবনের শুরু থেকে শেষপর্য্যন্ত যে সমস্ত কাজ করলো, স্কুলে শিক্ষকমশায় যে মূল্যায়ন করলেন, তার কোনোটিরই কিছুই বিবেচনা করা হোল না হেথায়।

মূল্যায়ন করবার পদ্ধতিই বা কি! সে তো মূল্যায়নকারীর খেয়াল, ভাল লাগা-না-লাগার উপরই নির্ভর করে। এই পদ্ধতিতে মূল্যায়নকারীর ঘাড়ে পরীক্ষার খাতার বোঝাও নেহাৎ কম থাকেনা (অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো পরীক্ষককে আবার নানা কারণ বশতঃ নিজ অংশের খাতা ছাড়াও কিছু বেশী খাতা পরীক্ষা করতে হয়)। খাতা পরীক্ষা করবার যা সময় তাতে হয়তো নিয়মিত ভাবে খাতাগুলি পরীক্ষা করলে অসুবিধে বিশেষ হয় না। কিন্তু অকিাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে নিয়মিত ভাবে দিনের দিন খাতাগুলি পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাই খাতা দেবার শেষ তারিখের কিছু আগে থেকে রাতজেগে অন্য সব কাজ বাতিল করে এই খাতা পরীক্ষা। এইভাবে পরীক্ষা-করে যার যা উচিৎ প্রাপ্য তা দেওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাছাড়া পরীক্ষক তো মানুষ। তাঁর মন মেজাজ আছে, সেটি সব সময় সমান থাকে না। তাছাড়া পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা, বানান ভুলের সংখ্যা, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি প্রভৃতিও সব ক্ষেত্রেই ইতিহাস পড়ার মূল্যায়নে অত্যন্ত আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়, এবং অনেকক্ষেত্রে ইতিহাসের জ্ঞানের অপেক্ষা এই বিষয়গুলি মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ইতিহাসের জ্ঞান ছাড়াই তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইতিহাস পড়ার মূল্যায়ন হয়ে যায়। মোটকথা পরীক্ষকের ভাললাগা না-লাগার

উপরই মূল্যায়নের বেশীর ভাগ নির্ভর করে। এমনও দেখাগেছে (আমাদের চেয়ে শিক্ষা-বিজ্ঞানে অনেক উন্নত দেশে) একই খাতা একই পরীক্ষক দুবার পরীক্ষা করে দুরকম নম্বর দিয়েছেন আর তার ব্যবধানও উল্লেখ যোগ্য। এই মূল্যায়ন নৈর্ব্যক্তিক নয় মোটেই।

তাছাড়া প্রশ্নগুলির ধরন ও আশানুরূপ নয়। এগুলি সেই মামুলি ধরনের একঘেয়ে প্রশ্ন। এপ্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে বিশেষ কোনো চিন্তাশক্তির বা মননশীলতার আবশ্যক হয় না। কিছু স্মৃতিশক্তি ও পরিশ্রম করবার ইচ্ছা থাকলেই যথেষ্ট। যে ধরনের প্রশ্ন সাধারণতঃ করা হয়ে থাকে সেগুলির উত্তর মুখস্থ করেই পরীক্ষা বৈতরণী অনায়াসেই পার হয়ে যাওয়া যায়। প্রশ্নগুলি বছরের পর বছর প্রায় চক্রাকারে আবর্ত্তিত হয়ে প্রশ্নপত্রে আত্মপ্রকাশ করে, তাই সেগুলির উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষা দিতে যাওয়াটা খুব একটা অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নেওয়া মোটেই নয়। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরসম্বলিত 'নোট' 'শর্টকাট' আর 'ইজিসাক্‌সেস'-এ বাজার ছেয়ে গেছে। সমস্ত পাঠ্যক্রমটি শিক্ষার্থীদের আর পড়বার আবশ্যক হয় না। কতকগুলি নির্ব্বাচিত প্রশ্ন মুখস্থ করে ফেলতে পারলেই চলে যায়। নির্ব্বাচন একটু বুদ্ধি খাঁটিয়ে করতে পারলে অনেক সময় ভাল ফল হয়। একেবারে হালখবর হচ্ছে যে নির্ব্বাচিত মুখস্থ করা প্রশ্নের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে আর "শর্টকাটের" ছিন্নপত্র, কোনো কোনো ক্ষেত্রে "পকেট সাইজ-সর্টকাট" পরীক্ষার্থীদের শার্ট পাঞ্জাবীর পকেটস্থ বা 'রাবার' সূতায় উরুলগ্ন হয়ে সংখ্যাধিক্য প্রকাশ করছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে "শার্টকাটের" পকেটস্থ ছিন্নপত্র বা উরুলগ্ন পকেটসাইজ শর্টকাট পরীক্ষাব 'হলে' বন্দীত্ব ঘুচিয়ে আলোকপ্রাপ্ত না হ'লে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে মুক্তি সংগ্রাম ঘোষিত হচ্ছে। এইসব চূড়ান্ত গোলোযোগ আর সীমাহীন অভিযোগের মূলেই আছে অবৈজ্ঞানিক প্রশ্নধারা। যা আপনি মূল্যায়িত করতে চান বা যা করা উচিৎ তা বর্ত্তমানের এই ধরনের প্রশ্ন পত্রের মধ্যে সংযোজিত প্রশ্নগুলির দ্বারা কোনো দিনই করা সম্ভব নয়।

শুধু বাইরেকার (external) পরীক্ষার প্রশ্নেরই যে প্রকৃতি এরকম, তা নয়। শিক্ষার্থীর স্কুলজীবনের মধ্যেও ইতিহাস পঠন-পাঠনের মূল্যায়নও যে সব প্রশ্নের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাদের ধরনও অনুরূপ এবং সেগুলিও এই সব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাছাড়া সেখানেও শিক্ষার্থীর ইতিহাস পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হাতে কলমে কাজগুলির মূল্যায়ন করবার কোনো

ব্যবস্থা নেই। মূল্যায়ন করবার পদ্ধতি পড়ানোর পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে একাধিক কারণে। এখানেও মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলেই পড়ানোও হয়ে পড়ে মামুলী, গতানুগতিক, স্মৃতিশক্তি নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির উদ্বোধনের অবকাশ সেথা বিশেষ থাকেনা। মুখস্থকরা আর পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়া, এই দুটোই হয়ে দাঁড়ায় প্রধান। মূল্যায়নটিকে আমরা নিয়ে থাকি মামুলীধরনের এই সব প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে বেশী নম্বর পাওয়া হিসাবে। আর মূল্যায়নের তারতম্য মাপবার 'মাপকাঠি' হয়ে দাঁড়ায পরীক্ষায় কম আর বেশীনম্বর পাওয়া। ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য "তাকে" তোলা থাকে। নম্বর পেলেই হোল। কাজে কাজেই এটা বেশ পরিষ্কার যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে মূল্যায়নের সময় সেগুলির সফলতা বিফলতার দিকে দৃষ্টি বিশেষ দেওয়া হচ্ছে না।

মূল্যায়নে ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্যগুলির সফলতা বিফলতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি বলেই ইতিহাস পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান শিক্ষার্থী অর্জ্জন করে সেগুলি শিক্ষার্থীর বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ-ক্ষমতা দেখার আবশ্যক বোধ করা হয়না পঠন-পাঠনের সময়। বই পুঁথিতে লেখা কথাথেকে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হয় সেগুলি যদি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয় তাহলে তো সে জ্ঞান পুঁথিগতই থেকে যায়। বাস্তবজীবনের সাথে তার সংযোগ না থাকলে, বাস্তবজীবনে তার প্রয়োজন না হলে সেতো ভূতের বোঝা ; সে বোঝা বইবার প্রয়োজন কি ?

শিক্ষার্থীর সফলতা বিফলতার মূল্যায়ন সূত্র ধরে আর একটি যে অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষার সন্ধান পাওয়া যায় সেটির সম্বন্ধে আমরা প্রায় উদাসীন। মূল্যায়ন করার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিফলতা দৃষ্টিগোচর হলে সে বিফলতার কারণ কি, সে প্রশ্ন আমরা মোটেই জিজ্ঞাসা করি না। বিফলতার জন্যে আমরা শিক্ষার্থীর মনীষাকেই দায়ী করে থাকি, তার জন্যে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা অক্ষমতা ছাড়াও আরো একটা দিক আছে, আরও কারণ আছে, সে কথা আমরা আদৌ চিন্তা করে দেখি না। শিক্ষার্থীর মনীষা ছাড়া পঠন-পাঠনের পদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত হতে পারে, শিক্ষকমশায় তাঁর কর্ত্তব্যে অবহেলা করতে পারেন, অনুসৃত পাঠ্যক্রম যথাযথ নাও হতে পারে, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় দোষ থাকতে পারে মূল্যায়ন পদ্ধতি ত্রুটিবহুল, অকেজো হতে পারে। *এ বিষয়গুলিও আমাদের মনে রাখতে হবে এবং সাথে সাথে কোন্ বিশেষ দিকটির জন্যে ইতিহাস

পঠন-পাঠনের পূর্ণতা বা সফলতা লাভ ব্যাহত হচ্ছে সেটি ঠিক করবার জন্যে সতর্ক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতে হবে। কি করে এই কাজ সম্ভব হবে, কেবলমাত্র বেচারা শিক্ষার্থীর মনীষার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে না দিয়ে ইতিহাস পড়ার বিফলতার আসল কারণগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে সত্য সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হবে, সেই সব আলোচনা করতে গেলে আমাদের এ প্রসঙ্গ যথেষ্ট দীর্ঘ হয়ে পড়বে। আর এখানে সেটি প্রাসঙ্গিকও হবে না। তাই কেবলমাত্র এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমরা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। এটা ঠিক যে এই কাজটি করতে পারলে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম, পঠন-পাঠনের পদ্ধতি, ইতিহাস শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতি প্রভৃতির সম্বন্ধেও পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কাজটিও সুকর হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ইতিহাস পঠন-পাঠনের যথাযথ মূল্যায়ন তাহলে সম্ভব হবে কি করে? সেই কথাই আলোচনা করা যাক্। প্রথম কথা, আমাদের স্কুলে যে মূল্যায়ন পদ্ধতি চলিত আছে সেটিকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে হবে। তার জন্যে শুধু বাৎসরিক পরীক্ষার মূল্যায়নের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে সারা বছরে শিক্ষার্থী যে যে কাজ করেছে সেগুলিও বিবেচনা করতে হবে। আবার কেবলমাত্র একটি বছরের কাজের উপর নির্ভর না করে শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক স্কুলের জীবন দুটি স্তরে (নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) ভাগ করে এক একটি স্তরের সামগ্রিক মূল্যায়নটি করে নিতে হবে। এই মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা না নিয়ে ইতিহাস পঠন-পাঠন সংশ্লিষ্ট কাজের হিসেব রাখতে হবে। তার হাতের কাজে, আঁকায় লেখায়, মডেল তৈরীতে, তর্কে আলোচনায়, ভ্রমণে, ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্বলিত দ্রব্যাদির সংগ্রহে, নাটকাভিনয়ে, পড়ায় (পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যপুস্তক) বলায়, তার যে অংশগ্রহণ সেগুলির হিসাব রেখে মূল্যায়নে তাদের নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্য দিতে হবে। শিক্ষার্থী তার অর্জ্জিত জ্ঞান বাস্তবে কতখানি প্রয়োগ করতে পারছে সেটি দেখতে হবে। প্রশ্নের ভঙ্গিতে পরিবর্ত্তন সাধন করতে হবে। মূল্যায়নকে নৈর্ব্যক্তিক করতে হবে। এসবের জন্যে প্রয়োজন স্কুলের মধ্যেকার মূল্যায়ন পদ্ধতির আমূল সংস্কার সাধন।

শুধু স্কুলের মধ্যেকার কেন, শিক্ষার্থীর স্কুলজীবনের সমাপ্তিতে বাইরের পরীক্ষার মাধ্যমে যে মূল্যায়নের ব্যবস্থা আছে তার মধ্যেও বহু সংস্কার সাধন করতে হবে। শিক্ষার্থীর স্কুলজীবনের যে সামগ্রিক মূল্যায়ন সেটিরও যথাযথ মূল্য দিতে হবে। কতোখানি মূল্য দেওয়া হবে, বা দেওয়া উচিৎ সেটি অবশ্য কিছু চিন্তা করে, কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করে ঠিক করে নিতে হবে। আমাদের মতে এই সামগ্রিক চূড়ান্ত মূল্যায়নের অর্দ্ধেক হবে স্কুলের শিক্ষকমশায়দের কৃত মূল্যায়ন,

আর অর্দ্ধেক হবে বাইরের পরীক্ষায় কৃত মূল্যায়ন। লক্ষ রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর স্কুলজীবনের ইতিহাস অধ্যয়নের যে মূল্যায়ন তা যেন যুক্তিযুক্ত, যথাযথ ও তথ্যভিত্তিক হয়, যা তা করে আন্দাজে মূল্যায়ন করা যেন না হয়। পরীক্ষার প্রশ্নেরও ভঙ্গি পরিবর্ত্তন করার একান্ত প্রয়োজন আছে। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন চলেছে প্রশ্ন যেন সেই পদ্ধতির অনুগামী হয়। পঠন-পাঠন পদ্ধতিকেই প্রশ্ন যেন অনুসরণ করে। পরীক্ষার প্রশ্নকে যেন পড়ানোর পদ্ধতি অনুসরণ না করে। শিক্ষার্থীর চিন্তাশীল অনুশীলন করার শক্তি, নানা তথ্য থেকে যুক্তিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে আসবার ক্ষমতা, নানা ধরনের তথ্যের এবং কার্য্যকারণের বিশ্লেষণে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি, ইতিহাসের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি,—প্রভৃতি যথাযথ পরীক্ষা করবার মত করে প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইতিহাসে যা জ্ঞান তার পরিমাপই যেন হয়। হাতের লেখা, ভাষার বিশুদ্ধতা, প্রভৃতি এসে মূল্যায়নকারীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন যেন না করে। মূল্যায়ন যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। পরীক্ষকের ভাল লাগা না লাগাও খেয়াল খুসির দ্বারা যেন মূল্যায়ন কোনোক্রমেই প্রভাবিত না হয়। যা মূল্যায়ন করতে চাওয়া হয় সেইটিরই যেন মূল্যায়ন হয়। মূল্যায়ন যেন নির্ভরযোগ্য হয়, যথাযথ হয়।

ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা।

বিংশ শতকের শিক্ষার ইতিহাসে সমাজবিদ্যা স্কুল পাঠ্যক্রমে একটি নতুন সংযোগ। চাহিদায় হয় উদ্ভাবন। তাই যে কোনো উদ্ভাবন বিনাকারণে হয় না, তার পটভূমিকায় থাকে মানুষের অভাব-জাত আন্তরিক প্রচেষ্টা। স্কুল পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে এই নবাগত সমাজবিদ্যার একটি পাঠ্যবিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্তি মানুষের চাহিদা-জাত উদ্ভাবনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু স্কুল পাঠ্যক্রমের কি অভাব মোচন করবার জন্যে এই নতুন ক্ষেত্রের প্রস্তুতি, এই নতুন বিষয়টির স্কুল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি, সে বিষয় বিস্তৃত আলোচনা এই প্রসঙ্গের অনাবশ্যক ব্যাপ্তি ঘটাবে। এখানে আমরা শুধু সমাজবিদ্যা কি সেটির সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা করে ইতিহাসের সাথে তার সম্পর্কটি খুব অল্পের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করবো।

একটু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি নিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে সমাজবিদ্যা হচ্ছে সমাজনীতি (Sociology), অর্থনীতি (Economics), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), ভূগোল (Geography) ও ইতিসাস (History) এই পঞ্চ শাখাযুক্ত একটি নতুন বিষয়। কিন্তু সমাজবিদ্যা কেবলমাত্র এই বিষয়গুলির সমাহারই শুধু নয়, এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন 'ক্ষেত্র' (field), একটি পৃথক বিষয়। এ বিষয়টির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা, মানুষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার আচরণ অনুধাবন করা। সমাজে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিবিধ এবং বহু ক্ষেত্রে বিস্তারিত। আচার আচরণে, চিন্তায় প্রচেষ্টায়, মানুষ তার চলমান জীবন ধারায় নানা ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলে। সে সম্পর্ক ব্যক্তিগত হতে পারে, যৌথ হতে পারে; সমাজ জীবনের বহুবিধ বিষয়কে কেন্দ্রকরে বহুভাবে এবং বহু উদ্দেশ্যে সেগুলি গড়ে উঠতে পারে। মানুষের সমাজে তার সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে সর্ব্বতোভাবে জানাটাই তাকে চরম ও পরম জানা। সে জানা সম্ভব হয়ে থাকে সমাজবিদ্যার মাধ্যমে। কোনো বিষয় প্রকৃষ্টভাবে জানবার জন্যে প্রয়োজন হয় বিশ্লেষণের। তাই এক্ষেত্রেও

মানুষের সমাজে মানুষকে প্রকৃষ্ট ভাবে জানবার জন্যে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। সমাজবিদ্যা পাঁচটি ভাগে মানুষের আচরণকেও তার কার্য্যাবলীকে বিশ্লেষণ করে মানুষ সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু ও যথাযথ ধারণা গড়ে তোলবার প্রয়াসী। সমাজনীতির (Sociology)-মধ্যে দিয়ে সমাজ জীবনে মানুষের যৌথ সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়ে থাকে। অর্থনীতির মাধ্যমে মানুষের জীবন ধারণ করে উৎপাদন (Production) ও উৎপন্ন "ধনের" (Wealth) বিতরণের (Distribution) প্রচেষ্টা সমূহ নিরূপিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্যে রাষ্ট্রও তার পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় আমাদের গোচরে আসে। ভূগোলে মানুষের সাথে 'প্রকৃতির' সম্পর্কের কথা, কোন্ কোন্ বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন ধারণ সহজ সম্ভব করার জন্যে মানুষ কি কি প্রচেষ্টা করে থাকে তার বিষয় বিবৃত করা হয়ে থাকে। ইতিহাসের পাতায় আছে সামগ্রিকভাবে এই সকল বিষয়ে মানুষের চেষ্টালব্ধ ফল, ও তার সাফল্য অসাফল্যের কথা। মানুষের সামগ্রিক প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ফল লিপিবদ্ধ করে বলেই ইতিহাস ঠিক আজকের কথা বলতে নারাজ। আজ যে সব প্রচেষ্টা সমাজ জীবনে মানুষকে কর্ম্মচঞ্চল করছে, আজকের মধ্যেই সেই সব প্রচেষ্টার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হচ্ছে না। তার জন্যে "কালের" প্রয়োজন। সেইজন্যই ইতিহাস মানুষের জীবনের গতকালের কথা, ঠিক ঠিক আজকের কথা নয়। কিন্তু সমাজবিদ্যা আজকের কথা। আজকের দিনে মানুষের সমাজ পরিপূর্ণভাবে জানবার জন্যে সন্ধানী বিশ্লেষণ ; তাই এটি সমসাময়িক, আর ইতিহাস সমসাময়িক নয়। সুদূর অতীত থেকে অব্যবহিত-পূর্ব্ব-বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ইতিহাসের ব্যাপ্তি। পৃথিবীতে মানুষের সমাজে জীবনপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন। তাই গতকালের জীবনকে কেন্দ্র করেই, তাকে ভিত্তি করেই আজকের জীবন গড়ে উঠেছে। তাই সমাজবিদ্যার সর্ব্বপ্রকারের বিশ্লেষণ ইতিহাসকে ভিত্তি করেই করা হয়ে থাকে।

সমাজ বিদ্যা কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞানে জ্ঞান হবে বিশিষ্ট, প্রকৃষ্ট। নানা গবেষণায় এবং তথ্যবহুল বিষয়ের সমাবেশে সমাজবিজ্ঞান যেমন বিস্তৃতিতে ব্যপক, তেমনি চিন্তাশীল অনুশীলনে আর একাগ্রচিত্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবনে প্রজ্ঞায় এটি গভীর। তাই সমাজবিজ্ঞান পরিণত বয়স্কদেরই উপযোগী। নানাপ্রকারের যুক্তিতর্কের অবতারণায়, কার্য্যকারণের বিশ্লেষণে মনীষার পূর্ণবিকাশের আহ্বান আছে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যয়নে। স্কুলের অপরিণত-মেধা শিক্ষার্থীদের মনীষার বহু উর্দ্ধে তার অবস্থিতি। তাই সংক্ষিপ্ত করে, সহজ সরল করে, স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে, শ্রেণীকক্ষে পঠন-

পাঠনের যোগ্য করে স্কুল পাঠ্যক্রমে সমাজ বিদ্যার অন্তর্ভুক্তি। সমাজবিদ্যা সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী সংস্করণ।

সমাজবিদ্যা সম্বন্ধে অনেকের অনেকরকম ধারণা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই সব ধারণাগুলি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেগুলি ভুল ধারণা। অনেকে মনে করেন যে সমাজ বিদ্যা শুধু ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতির সমাহার মাত্র, মানব অভিজ্ঞতার এই পৃথক পৃথক দিকগুলি (যেগুলিকে আমরা ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি সমাজনীতি নাম দিয়েছি) পৃথকভাবে না পড়িয়ে সবগুলিকে এক সঙ্গে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে সমাজবিদ্যার মধ্যে। এঁদের ধারণা সমাজবিদ্যা পড়ানোর সময় এখানে একত্রিত এই বিষয়গুলিই পড়ানো হয়ে থাকে, তবে কিছু কমিয়ে। সমাজ বিদ্যার "ক্ষেত্রে" সমন্বিত এই পৃথক পৃথক বিষয়গুলি একটি পৃথক এবং নতুন রূপ পরিগ্রহ করে, তখন তার পড়ানোর ভিন্ন উদ্দেশ্য, ভিন্ন পদ্ধতি, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি,—একথা তাঁরা ভুলে যান। অনেকে আবার সমাজ সমস্যাকে সমাজবিদ্যার সাথে গোলমাল পাকিয়ে ফেলেন। কেউ কেউ আবার এমন আছেন যে স্কুল পাঠ্যক্রমে যতোরাজ্যের বিষয় আছে সেগুলির সবারই মধ্যে সমাজবিদ্যাকে দেখতে পান।

এ আলোচনা অধিক বিস্তৃত করলে আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই এখানে কেবলমাত্র সমাজবিদ্যার সাথে ইতিহাসের সম্পর্কটি নির্ণয় করেই আমাদের আলোচনা শেষ করবো। ইতিহাসের সঙ্গে সমাজবিদ্যার নিবিড় সম্পর্ক। ইতিহাস যেমন সামগ্রিক ভাবে মানুষের কথা, সমাজবিদ্যাও তেমনি সামগ্রিকভাবে মানুষের কথা। ইতিহাসের উপাদান মানুষ, সমাজবিদ্যার উপাদানও মানুষ। মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজবিদ্যায় কোনো বিদ্যাই থাকবে না, আর সে সমাজচ্যুত হবে, তার অস্তিত্বই থাকবে না। ইতিহাস মানুষের কর্য্যাবলীর বিশ্লেষণ করে, মূল্যায়ন করে, লিপিবদ্ধ করে। সমাজবিদ্য মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের, মানুষের সমাজপরিবেশ তার জীবনধারার বিশ্লেষণ করে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় থাকে বর্ত্তমানের অব্যবহিত-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষের কথা, তার জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে সফলতা বিফলতার কথা; কিন্তু সমাজবিদ্যায় থাকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় মানুষের বর্ত্তমানের কথা, সামগ্রিকভাবে। ইতিহাসের যেথা শেষ, সমাজ-বিদ্যার সেথা শুরু।

ইতিহাস মানুষের আজকের কথা লিপিবদ্ধ করে না বলেই সমাজ-বিদ্যার

সৃষ্টি আর স্কুলের পাঠ্যক্রমে তার অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু ইতিহাস মানুষের আজকের কথা লিপিবদ্ধ করে না কেন? অনেকে বলেন ইতিহাস মানুষের আজকের জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেনি এইজন্যে যে মানুষের বর্ত্তমান জীবন শত ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে এখনও বিক্ষুব্ধ, চলমান সে জীবন স্রোতে এখনও স্বচ্ছতা আসেনি। কোন্ ঘটনার ঘায়ে জীবনের কোন্‌দিকটিতে ভাঙাগড়া চলবে তারও কোনো ঠিক ঠিকানা আজও নেই। অনিশ্চিৎ কোনো বিষয় লিপিবদ্ধ করা ইতিহাসের কাজ নয়। ইতিহাস সত্যের নিরীক্ষক, সত্যদ্রষ্টা। কিন্তু মানুষের বর্ত্তমান কার্য্যাবলী থেকে সত্য দেখা সম্ভব কি করে? মহাকাল তার অনন্ত যাত্রাপথে চলেছে আজকের এই বর্ত্তমানের মধ্যে দিয়ে। তার দিক্‌দিগন্ত প্রকম্পিত রথচক্রের নির্ঘোষে কর্ণ বধির, সংখ্যাতীত রথাশ্বখুরোত্থিত ধূলিতে দিক্‌চক্রবাল সমাচ্ছন্ন। তাই সেথা সত্যান্বেষীর দৃষ্টি নিষ্প্রভ। চলতি দুনিয়ার ঘটনা থেকে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একান্তভাবেই দুরূহ। হাজারো কূটনীতিবিদের উষ্ণ মস্তিষ্কের ধূম্রজালে রাজনীতির শত আবর্ত্ত সৃষ্টি হয়েছে হেথা। স্বার্থের সঙ্ঘাতে নিত্য, নিয়ত হানাহানি, রঙ বেরঙের প্রোপ্যাগ্যাণ্ডার জলুসে বিভ্রান্তিকর মরীচিকা, রাজনীতির গোষ্ঠীপতিদের অবিরাম চীৎকারে "বর্ত্তমানের" আকাশ বাতাস পূর্ণ। তাই সত্যদ্রষ্টা ইতিহাস সেথা নীরব অপেক্ষায় পরিণতি লক্ষকরে। সমাজ-বিদ্যার কাজ মানুষকে যেমনটি দেখা ঠিক তেমনই তাকে বিশ্লেষণ করা। আজকের এই বর্ত্তমানের মানুষকে তার সমাজের মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি নিয়ে পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে যা করা প্রয়োজন তাই করে থাকে সমাজবিদ্যা। ইতিহাস মানুষের সম্বন্ধে যে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তারই উপর ভিত্তি করে সমাজের বর্ত্তমান মানুষের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে সমাজবিদ্যার কাজ। ইতিহাসে আছে তথ্যের সংগ্রহ, সমাজ বিদ্যায় বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির বিশ্লেষণ। ইতিহাস সামগ্রিক মানবজীবনের আদ্যোপান্ত উপাদান সংগ্রহ করে, সমাজবিদ্যা বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তা পর্য্যালোচনা করে।

চলমান কালস্রোতের শত তরঙ্গভঙ্গে বর্ত্তমান বিক্ষুব্ধ; আর মানুষের এই বিক্ষুব্ধ বর্ত্তমানের সামগ্রিক জীবনের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করার অক্ষমতা কিংবা আপত্তিজ্ঞাপন থেকেই সমুদ্ভূত হয়েছে সমাজবিদ্যা,—একথা অনেকে বলে থাকেন।

পাঠটীকা (১)

(মৌখিক পদ্ধতি অবলম্বনে)

শ্রেণী .... নবম	বিষয়—ইতিহাস
....	আজকের পাঠ—
....	প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান।
....	

উদ্দেশ্য :—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানগুলি শিক্ষার্থীদের জানতে সাহায্য করা।

উপকরণ :—প্রাচীন ভারতের মানচিত্র, একটি পুরানো জমাখরচের খাতা, একটি আধুনিক দলিল, অশোকের শিলালিপির একটি অংশের মডেল, সমুদ্রগুপ্ত ও গৌতমীপুত্র শাতকর্ণীর মুদ্রার মডেল, বৃটিশ আমলের একটি ভারতীয় মুদ্রা, স্বাধীন ভরতের একটি মুদ্রা, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ও বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরের আলোকচিত্র, অজন্তার গুহাচিত্রের ও ধ্যানমগ্ন বোধিসত্বের আলোকচিত্র। Inscriptions of Asoke—D. C. Sircar, একটি তাম্রানুশাসনের একাংশের বঙ্গানুবাদ, পেরিপ্লাস অফদি ইরিথ্রিয়ান সি প্রভৃতি।

আয়োজন,—

বিদ্যার্থীদের মন পাঠাভিমুখী করবার জন্যে শিক্ষকমশায় নিম্নানুরূপ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন। প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবার আগে তিনি শ্রেণীকক্ষে বলে নেবেন যে তিনি জন্মাবার আগেই তাঁর "ঠাকুরদা" ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁর ঠাকুরদাকে কোনোদিন দেখেননি।

(১) আমার ঠাকুরদা গৌরবর্ণ ছিলেন, কি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন আমি জানবো কি করে?

[যে সব উপায়ে এই তথ্যটি জানা যাবে (যেমন ফটোগ্রাফ দেখে, যাঁরা ঠাকুরদাকে দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকে শুনে) সেগুলির দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে হবে]

(২) বর্ত্তমানে ১/০ চালের মূল্য কত ?

(৩) বর্ত্তমানে একখানি কাপড়ের মূল্য কত ?

(৪) বর্ত্তমানে /১ সের পোনা মাছের মূল্য কত ?

[এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাবার পর একখানি অতি পুরাতন জমা খরচের হিসেবের খাতা দেখিয়ে শিক্ষকমশায় বলবেন যে এটি তাঁর ঠাকুরদার নিজ হাতের লেখা জমা খরচের খাতা। এই খাতাতে লেখা আছে ১/০ চালের মূল্য ২৲; একখানি কাপড়ের মূল্য ১৲; /১ সের পোনা মাছের মূল্য ।৵০ । এই দ্রব্যমূল্যগুলি শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিয়ে শিক্ষকমশায় জিজ্ঞাসা করবেন,—]

(৫) বর্ত্তমান সময়ের সাথে ঠাকুরদার সময়ের কি তফাৎ দেখতে পাওয়া যায় এই তথ্যগুলি থেকে ?

(৬) ঠাকুরদার ব্যবহৃত একটি নামাবলী দেখে তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা হবে ?

(৭) ঠাকুরদার ব্যবহৃত একটি 'গড়গড়া' দেখে তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা হবে ?

(৮(ঠাকুরদার বয়েস যখন ১৫ বছর আর ঠাকুরমার ৭ বছর তখন তাঁদের বিয়ে হয়েছিল—এর থেকে বর্ত্তমান কালের সাথে তখনকার কালের কি তফাৎ চোখে পড়ে ?

(৯) ঠাকুরদারও বহু আগে যাঁরা বাস করতেন তাঁদের কথা কি করে জানতে পারা যায় ?

পাঠঘোষনা,—ঠাকুরদারও বহুযুগ আগে আমাদের ভারবর্ষে যাঁরা বসবাস করতেন তাঁদের সম্বন্ধে কি করে জানতে পারা যায়—অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সম্বন্ধে আজ আমরা আলোচনা করবো।

উপস্থাপন,—

বিষয়	পদ্ধতি।
	আজকের পাঠের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সম্যক আলোচনার জন্যে শিক্ষক-মশায় নিম্নান্নরূপ প্রশ্নগুলি করবেন,—
বর্ত্তমান কালে দেশের সংবাদ, শাসন কাজের জন্যে রচিত আইন-কানুন, প্রকাশিত হয় গেজেটে, সংবাদ পত্রে। প্রাচীন কালে ছাপাখানা ছিল না, কাগজের প্রচলন ছিল না, তাই সংবাদ পত্রও ছিল না।	(১) বর্ত্তমানে দেশে শাসন কাজ চালাবার জন্যে যে সমস্ত আইন কানুন হয় সেগুলি আমরা কি করে জানতে পারি ? (২) বহু প্রাচীন কালে সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল না কেন ?
রাজ্য শাসন করতে গেলে, রাজার বা গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা জনসাধারণকে জানাবার প্রয়োজন আছে। তাই প্রাচীনকালে রাজারা অনেক সময় পাহাড়ের গায়ে কিংবা সাধারণ স্থানে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে তার গায়ে এই সব তথ্য উৎকীর্ণ করাতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মহারাজ অশোক এই সব উদ্দেশ্যে শিলালিপি, স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ করাতেন। এই লিপিগুলি সাধারণতঃ ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ হোতো।	(৩) প্রাচীনকালে রাজারা নিজ নিজ ইচ্ছা বা নির্দ্দেশ কি করে প্রজা সাধারণের কাছে জ্ঞাপন করতো। (৪) মহারাজ আশোক পাহাড়ের গায়ে বা স্তম্ভে 'লিপি' উৎকীর্ণ করাতেন কেন ? (৫) কি অক্ষরে সাধারণতঃ প্রাচীন এই লিপিগুলি উৎকীর্ণ করা হোতো ? [অশোকের শিলালিপির একটি মডেল দেখাবেন এবং কিছু অংশ পড়ে-শোনাবেন]
বাংলা ভাষা বা হিন্দি ভাষা যেমন সংস্কৃত থেকে জাত, তেমনি বাংলা অক্ষর বা দেবনাগরী অক্ষর এই ব্রাহ্মী অক্ষর থেকে উদ্ভুত।	(৬) আমরা বর্ত্তমানে যে অক্ষর ব্যবহার করি তার সাথে প্রাচীন কালের এই অক্ষরের কি সম্পর্ক ?
বর্ত্তমানে কোনো জমি দান বা বিক্রয় করতে হলে 'ষ্টাম্প' কাগজে দলিল লেখা হয়, রেজেষ্ট্রী করতে হয় কোর্টে। প্রাচীনকালে তামার পাতে এই দলিল বা দান পত্র লেখা হোতো, ——— অক্ষর ছিল না তাই।	(৭) বর্ত্তমানে কোনো সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করতে হলে কি উপায়ে সেটি সমাধা হয় ? (৮) প্রাচীন কালে দলিল বা দানপত্র তামার পাতে লেখা হোতো কেন ?

উপস্থাপন,—

বিষয়	পদ্ধতি
আধুনিক কালের দলিলে গভর্ণমেণ্টের সীল, দাতা এবং গ্রহীতার কিংবা ক্রেতা এবং বিক্রেতার নাম, তাদের পিতার নাম, ঠিকানা, জমির অবস্থান, চৌহদ্দি প্রভৃতি লেখা থাকে।	(৯) আধুনিক দলিলের মধ্যে কোন্ কোন্ আবশ্যকীয় বিষয় লেখা থাকে ? [একটি আধুনিক দলিল দেখিয়ে দাতার নাম, গ্রহীতার নাম, জমির অবস্থান, চৌহদ্দি, রেজেষ্ট্রি হবার কোর্টের নাম, তারিখ প্রভৃতি পড়ে শোনাবেন]
প্রাচীনকালের তাম্রশাসনে সাধারণতঃ দাতা ও গ্রহীতার নাম, তাদের পিতার নাম, সম্পত্তির অবস্থান, চৌহদ্দি প্রভৃতি কোন রাজার রাজ্যে অন্তর্গতঐ সম্পত্তি এসমস্ত লেখা থাকতো।	(১০) প্রচীন কালের তাম্রানুশাসনে সাধারণতঃ কি কি লেখা থাকত ? [কোন তাম্রানুশাসন থেকে আবশ্যকীয় অংশ পড়বেন]
তাম্রানুশাসনে উল্লেখিত এই সব বিষয় থেকে রাজাদের নাম, অনেকস্থলে তাদের বংশ তালিকা, রাজ্যের বিস্তার প্রভৃতি জানতে পারি। প্রাচীন ভারতে গুপ্ত রাজাদের আমলের এইরূপ তাম্রানুশাসন অনেক পাওয়া গেছে।	(১১) তাম্রানুশাসনে লিখিত বিষয় থেকে আমরা কি ধরনের তথ্য জানতে পারি ? (১২) প্রাচীন ভারতের কোন্ কোন্ রাজাদের আমলে তাম্রানুশাসন পাওয়াগেছে ?
সাধারণতঃ মুদ্রার একদিকে থাকে যে রাজার রাজত্বের মুদ্রা তার নাম ও তারিখ অন্যদিকে নানা রকমের প্রতীক এবং সংক্ষিপ্ত 'Legend'; মুদ্রা থেকে কোন্ রাজা কোন্ সময়ে রাজত্ব করতো, তার রাজ্যের বিস্তৃতি সাধারণতঃ জানতে পারা যায়। প্রাক্স্বাধীন ও স্বাধীন ভারতের দুটি মুদ্রা পাশাপাশি রাখলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ও অন্য অধ্যায়ের সূচনার কথা জানতে পারা যায়।	[শিক্ষকমশায় একটি বৃটিশ আমলের ভারতীয় মুদ্রা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন] (১৩) এই মুদ্রাটির একদিকে লেখা আছে……George VI king emperor….ও সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের মুকুট শোভিত মস্তক, আর একদিকে লেখা আছে মুদ্রাটির বিনিময় মূল্য এবং তারিখ, ১৯৪১ সাল। এই লেখা থেকে আমরা কি তথ্য অবগত হই ?

উপস্থাপন,—

বিষয়	পদ্ধতি
রকমের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বিদেশীয়দের লিখিত বিবরণ থেকেও বহু তথ্য জানা যায়। উদাহরণ স্বরূপ,—মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ, পেরিপ্লাস অফদি ইরিথ্রিয়ানসি, ফাহিয়েন, হিউয়েনসাঙ, ইৎসিন্ প্রভৃতির বিবরণ থেকে প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করা যায়।	(২৫) পুরাণ থেকে ইতিহাসের কি ধরনের উপাদান সংগ্রহ করা যায়? (২৬) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান কেন? (২৭) বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কি? (২৮) প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান আর কোন্ কোন্ প্রাচীন গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়? (২৯) মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত মূল্যবান কেন? (৩০) চীনদেশের কোন্ কোন্ পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে এসে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন? (৩১) "পেরিপ্লাস অফ্ দি ইরিথ্রিয়ান সি" একটি ঐতিহাসিক উপাদান সম্বলিত গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয় কেন?

ব্ল্যাকবোর্ডের সংক্ষিপ্তসার :—

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক ও (২) সাহিত্য বিষয়ক।

প্রাচীন রাজাদের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি ও তাম্রানুশাসনগুলি হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক উপাদানগুলির একটি ভাগ। এর দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে প্রাচীন রাজাদের বা অন্যান্যসংস্থার মুদ্রা; আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নিদর্শন সমূহ।

সাহিত্য বিষয়ক উপাদানগুলিকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) দেশীয় সাহিত্য ও (২) বিদেশীয়দের ভারত সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ। দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহ, নানাধরনের ঐতিহাসিক নাটক কাহিনী ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত অপরাপর গ্রন্থসমূহের নাম করা যেতে পারে। বিদেশীয়দের বিবরণের মধ্যে—মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ, পেরিপ্লাস অফ্ দি ইরিথ্রিয়ান সি ফাহিয়ান,

হিউয়েন সাঙ্ ও ইৎসিন্-এর লিখিত ভারত সম্বন্ধে বিবরণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

[ব্ল্যাক বোর্ডের সংক্ষিপ্তসারটি শিক্ষকমশায় ব্ল্যাকবোর্ডের অপর পৃষ্ঠায় পূর্ব্বাহ্নেই লিখে রাখবেন। উপস্থাপন শেষ হলেই বিদ্যার্থীদের এটি নিজ নিজ নোটবুকে লিখে নিতে বলবেন।]

অভিযোজন,

বিদ্যার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগক্ষমতা পরীক্ষাকল্পে শিক্ষক-মশায় নিম্নানুরূপ প্রশ্নগুলি করবেন :—

(১) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক উপাদান কোন্ কোন্ দ্রব্য থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে ?

(২) প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা কিরূপে ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে ?

(৩) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান দেশীয় সাহিত্য থেকে কিরূপে আহৃত হয় ?

(৪) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান কোন্ কোন্ বিদেশীর বিবরণ থেকে জানা যায় ?

(৫ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক উপাদান ও সাহিত্যবিষয়ক উপাদানের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক উপাদান অধিকতর নির্ভরযোগ্য কেন ?

(৬) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য উপাদান কিরূপে নির্ণয় করা হয়ে থাকে ?

বাড়ীর কাজ :—(১) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।

(২) একটি ডায়াগ্রামের সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান-গুলির বিন্যাস সাধন কর। *

---

* ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ শিক্ষকমশায় নিজ সুবিধামত প্রয়োজনানুসারে করবেন।

পাঠ-টীকা (২)

(মূল উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বনে)

শ্রেণী .... নবম	বিষয়—ইতিহাস। পাঠ্য—ভারতে মৌর্য্যযুগ। পাঠ্যক্রম,— (১) মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও চন্দ্রগুপ্ত। * (২) অশোকের ধর্ম্মবিজয়। (৩) মৌর্য্যশাসন ব্যবস্থা। (৪) মৌর্য্যযুগে ভারতীয় জীবন (তুলনামূলক) (৫) মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন। * তারকা চিহ্নিত অংশটি অদ্যকার পাঠ।

উদ্দেশ্য,

মূল উপাদানের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় সাধন করে অশোকের ধর্ম্মবিজয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে তাদের সাহায্য করা।

উপকরণ,

মৌর্য্য আমলের ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র, অশোকের শিলালিপির একটি অংশের মডেল, এশিয়ার ও ইউরোপের মানচিত্র, বুদ্ধদেবের একখানি চিত্র, অশোকের ধর্ম্মবিজয় সংশ্লিষ্ট লিপিগুলির অনূদিত অংশ ; [পাঠটীকার শেষে মুদ্রিত] রেফারেন্স বই হিসেবে Inscriptions of Asoke—D. C. Sarkar, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন প্রণীত 'অশোক', মৌর্য্যরাজাদের সময়রেখা....প্রভৃতি।

[শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ রচনা,—

এই পদ্ধতির প্রয়োগ প্রচেষ্টায় শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ রচনায় বিশেষ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে। পরিবেশ যেন যথাযথ হয়।]

আয়োজন,—

শিক্ষার্থীদের মন পাঠাভিমুখী করবার জন্যে শিক্ষক মশায় তাদের পূর্ব্বজ্ঞানের পটভূমিকায় নিম্নানুরূপ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন :—

(১) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যকে তদানীন্তন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার রচয়িতা বলা হয় কেন ?

(২) চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে জানতে হলে কি কি মূল উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ?

(৩) চন্দ্রগুপ্ত ভারতের কোন জায়গায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ? (মানচিত্রে দেখানো ফলপ্রসূ হবে।)

(৪) চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল ? (মানচিত্র দেখাতে হবে।)

(৫) চন্দ্রগুপ্তের পররাষ্ট্রনীতি কি ছিল ?

(৬) অশোক কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করেছিলেন কেন ?

(৭) কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের পররাষ্ট্র নীতিতে কি পরিবর্ত্তন হয়েছিল ?

পাঠঘোষনা,

আজ আমরা আশোকের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন ও তাঁর ধর্ম্মবিজয় সম্বন্ধে মূল উপাদান থেকে পড়বো। [অশোকের ধর্ম্মবিজয় সংশ্লিষ্ট ও তাঁর বিভিন্ন লিপি থেকে অনূদিত অংশগুলি (মুদ্রিত অথবা হস্তলিখিত) প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে একখানি করে দেবেন। এই পাঠটীকার শেষে উক্ত সংশ্লিষ্ট লিপির অংশগুলি মুদ্রিত করা হয়েছে।]

উপস্থাপন,

বিষয়	পদ্ধতি
অনূদিত লিপির অংশগুলিতে উপস্থাপিত।	আজকের পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য সাধনার্থে শিক্ষকমশায় নিম্নানুরূপ প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন।— (১) অশোকের সম্বন্ধে জানবার কি কি মূল উপাদান ? (শিক্ষক মশায় অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে কিছু বলে নেবেন।)

উপস্থাপন,—

বিষয়	পদ্ধতি
অনূদিত লিপির অংশগুলিতে উপস্থাপিত।	(২) কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য অশোকের লিপিতে কিরূপে বর্ণিত হয়েছে? [শিক্ষক মশায় শৈললেখমালা ত্রয়োদশ স্তবক, প্রথম ছত্রটি কোনো ছাত্রকে পড়তে বলবেন।] (৩) কলিঙ্গ বিজয়ের পর অশোকের মনের পরিবর্ত্তন কিরূপ হয়েছিল? [শিক্ষকমশায় শৈল লেখমালা ত্রয়োদশ স্তবক তৃতীয় ছত্রটি কোনো ছাত্রকে পড়তে বলবেন এবং পুনরায় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন।] (৪) মহারাজ আশোক কর্ত্তৃক কলিঙ্গ বিজিত হবার পর মৌর্য্য পররাষ্ট্র নীতিতে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছিল? [শৈল লেখমালা ত্রয়োদশ স্তবক, দ্বিতীয় ও অষ্টম ছত্র পড়তে বলবেন পড়া শেষ হলে পুনরায় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন।] (৫) মহারাজ অশোক ধর্ম্মবিজয় ও যুদ্ধবিজয়ের মধ্যে কি পার্থক্য দেখেছিলেন? [শৈললেখমালা ত্রয়োদশ স্তবক, তৃতীয় ও অষ্টম ছত্র পড়তে বলবেন। পাঠশেষে পুনরায় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন।] (৬) অশোকের উপদেশের সারমর্ম্ম কি? [ব্রহ্মগিরি লেখমালা, দ্বিতীয় স্তবক, তৃতীয় ছত্র।] (৭) অশোকের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম কি ছিল? [রূপনাথ লিপি, প্রথম ছত্র।] (৮) অশোক যা প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে সর্ব্বজনীন ভাব কোথায়? [ব্রহ্মগিরি লেখমালা, দ্বিতীয় স্তবক, তৃতীয় ছত্র।]

উপস্থাপন,—

বিষয়	পদ্ধতি
অনূদিত লিপির অংশগুলিতে উপস্থাপিত।	(৯) "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শেখাও" —অশোক নিজের আচরণের মধ্যে দিয়ে কিরূপে ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন ? [শৈললেখমালা, প্রথম স্তবক, তৃতীয় ছত্র।]
	(১০) অশোকের ধর্ম্মবিজয় বলতে কি বুঝায় ? [শৈললেখমালা, ত্রয়োদশ স্তবক, দ্বিতীয় ছত্র।]
	(১১) ধর্ম্মবিজয় উদ্দেশ্যে অশোক কোন্ কোন্ রাজ্যে দূত পাঠিয়েছিলেন ? [শৈললেখমালা, ত্রয়োদশ স্তবক, অষ্টম ছত্র। শৈললেখমালায় উল্লেখিত দেশগুলির অবস্থান আধুনিক মানচিত্রে দেখিয়ে দেবেন।
	(১২) বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ম্মবিজয়ের জন্যে দূত প্রেরণ করবার ফল কি হয়েছিল ? [শৈললেখমালা, ত্রয়োদশ স্তবক, অষ্টম ছত্র।]
	(১৩) যে সমস্ত দেশে অশোকের দূত পৌছায় নাই সেখানকার লোকেদের অশোকের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কি মনোভাব ছিল ? [শৈললেখমালা, ত্রয়োদশ স্তবক, অষ্টম ছত্র।]
	(১৪) বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর দেশগুলি অশোকের এই দৃষ্টান্ত থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে ?

অভিযোজন,

এই স্তরে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লিখবে। উত্তরের সাথে মূল উপাদানের উল্লেখ থাকবে। প্রশ্নকয়টি শিক্ষকমশায় পূর্ব্বাহ্নেই ব্ল্যাকবোর্ডে অথবা পৃথক পৃথক কাগজে লিখে রেখে দেবেন এবং উপস্থাপন সমাধা করে এই প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের লিখতে দেবেন।

(১) মহারাজ অশোক ধর্ম্ম বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কেন?

(২) মহারাজ অশোকের উপদেশের সারমর্ম্ম কি ছিল?

(৩) মহারাজ অশোকের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম কি ছিল?

(৪) কলিঙ্গ বিজয়ের পর মহারাজ অশোক কোন্ কোন্ কাজের বিশেষ অনুরক্ত হয়েছিলেন?

(৫) ধর্ম্মবিজয়ের জন্যে মহারাজ অশোক কোন্ কোন্ রাজ্যে দূত প্রেরণ করেছিলেন?

বাড়ীর কাজ:—

(১) মহারাজ অশোকের ধর্ম্মবিজয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর (মূল উপাদানের উপর ভিত্তি করে।)

(২) আজকের পাঠের সংশ্লিষ্ট লিপিগুলি শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ নোট বুকে লিখে নেবে কিংবা আঠা দিয়ে আজকের প্রাপ্ত অনূদিত অংশগুলি নোটবুকে আটকে নেবে।

(৩) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত অশোক হতে এবং Inscriptions of Asoka (—D C Sircar) থেকে শিক্ষক-মশায়ের নির্দ্দেশ মত পাঠ করবে। শিক্ষকমশায় শ্রেণীর ছাত্রদের উপযুক্ত অংশ প্রয়োজন মত পড়তে নির্দ্দেশ দেবেন। *

---

* ব্ল্যাক বোর্ডের কাজ শিক্ষকমশায় প্রয়োজন মত করবেন।

* আমাদের স্কুলগুলিতে মূল উপাদান সম্বলিত পুস্তক, গ্রন্থাগার, শিক্ষক-মশায়ের এই পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও তাঁদের পেশাগত প্রস্তুতি প্রভৃতি বিষয় সমূহের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিস্মৃত না হয়েই এই পাঠটীকাটি রচিত। পরীক্ষামূলক ভাবে উপাদান ভিত্তিক পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করবার এটি একটি নমুনা মাত্র। ইতিহাসের কোনো অধ্যায় পঠন-পাঠন কালে এটি একটি উদাহরণ হিসেবে কোনো শিক্ষক মশায়ের উপকারে এলে শ্রম সার্থক হবে।

অশোকের লিপি

(ক) **শৈললেখমালা**—(ত্রয়োদশ স্তবক)

১। "দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী" রাজার অভিষেক সময় হইতে অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল। একশত পঞ্চাশ সহস্র লোক বন্দী হইয়াছিল, একশত সহস্র লোক নিহত হইয়াছিল এবং উহার বহুগুণ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

২। ইহার পর, কলিঙ্গ যখন বিজিত হইল, দেবতাদিগের প্রিয় ধর্ম্মপালন, ধর্ম্মকর্ম্ম, এবং ধর্ম্মশিক্ষা দিবার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেন।

৩। কলিঙ্গ বিজেতা, "দেবতাদিগের প্রিয়" এক্ষনে গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করিতেছেন, এইজন্য যে এ জয়, জয় নহে। ইহাতে আছে হত্যা, মৃত্যু অথবা মানব নিধন। গভীরভাবে এবং অত্যন্ত দুঃখ ও অনুশোচনার সহিত "দেবতাদিগের প্রিয়" ইহা অনুভব করেন।

৮। ধর্ম্ম বিজয়ই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিজয়—ইহাই "দেবতাদিগের প্রিয়" মনে করেন। ....

(খ) **ব্রহ্মগিরিলেখমালা**—(২য় স্তবক)

৩। "দেবতাদিগের প্রিয়" এইরূপ বলেন :

পিতামাতাকে অতি অবশ্য সেবা করিতে হইবে; জীবনের পবিত্রতা ও সর্ব্বোচ্চ গুণ দৃঢ় করিতে হইবে। সত্য বলিতে হইবে। এই সংগুণগুলির অনুশীলন ও বিস্তার করিতে হইবে। সেইরূপে ছাত্র শিক্ষককে সম্মান করিবে এবং পারিবারিক জীবনে আত্মীয়স্বজনের প্রতি যথারীতি সৌজন্য প্রদর্শন করিতে হইবে। ....

(গ) **রূপনাথ লিপি :**

১। "দেবতাদিগের প্রিয়" এইরূপ বলেন :

কিঞ্চিদধিক আড়াই বৎসর আমি বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলাম; কিন্তু (ব্যক্তিগত) উন্নতি আমার হয় নাই। কিন্তু যখন হইতে

প্রায় একবৎসর কাল পূর্ব্বে আমি "সঙ্ঘ" দর্শন করিলাম তখন হইতে আমার উন্নতি হইতেছে (ধর্ম্মের পথে)।......

(ঘ) **শৈললেখমালা**—(১ম স্তবক)

৩। পূর্ব্বে "দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর" রন্ধনশালায় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ হাজার হাজার প্রাণী বধ হইত। কিন্তু যখন ধর্ম্মলিপিগুলি উৎকীর্ণ করা হইতেছে তখন কেবলমাত্র তিনটি প্রাণী বধ হয়—দুইটি ময়ূর ও একটি মৃগ; এবং এই মৃগও প্রত্যহ বধ করা হয় না। ভবিষ্যতে এই তিনটি প্রাণীও প্রাণ হারাইবে না।

(ঙ) **শৈললেখমালা**—(ত্রয়োদশ স্তবক)

৮। "দেবতাদিগের প্রিয়ের" নিকট ধর্ম্মবিজয়ই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিজয়! এবং এই বিজয় তিনি বার বার লাভ করিয়াছেন। যে সমস্ত উপজাতি তাঁহার রাজ্যসীমান্তে বাস করে তাহাদের নিকট এই জয়লাভ করিয়াছেন—আর এই জয়লাভ করিয়াছেন যবনরাজ অন্তিয়োক, যিনি আটশত যোজন দূরে রাজত্ব করেন এবং অন্তিয়োকের রাজ্য হইতে ও দূরে অপর চারিজন রাজা—তুরময়, অন্তিকোন, মোগ ও আলিকসুন্দর—তাঁহাদের নিকট; এবং দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য ও তাম্রপর্ণীর রাজার নিকট।.. যে সমস্ত দেশে দেবতাদিগের প্রিয়ের" দূত পৌঁছায় নাই,—তাহারাও "দেবতাদিগের প্রিয়ের" ধর্ম্ম-প্রচারের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন ও ধর্ম্মমত অনুসরণ করে।

গ্রন্থরচনায় সাহায্যকারী সংশ্লিষ্ট পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতি।

1. A preface to History—Carl G. Gustavson (Mc Grow —Hill Book Company, 1955)
2. The idea of History—R. G. Colling wood (Oxford university Press, 1951)
3. History Textbooks and International understanding —J. A. Lauwerys (—UNESCO)
4. Education for International understanding (examples and suggestions for classroom use)—UNESCO
5. Suggestions on the teaching of history—C. P. Hill (Towards world understanding)—UNESCO
6. The teaching of history (Second edition)—Issued by the incorporated association of assistant masters in Secondary schools (Cambridge university press)
7. Creative teaching of history—K. D. Ghosh (Chuckerverty, Chatterjee & Co. Ltd. Calcutta)
8. Suggestions for the teaching of history in India— V. D. Ghate (Oxford university press)
9. Teaching of history—Henry Johnson (Macmillan)
10. Audio-visual aids in teaching Indian history— K. P. Chowdhury (Atmaram & Sons, Delhi)
11. Audio-visual aids to instruction—Harry C. Mckown and Alvin B. Roberts (Mc Grow-Hill Book Co.).
12. Audio-visual materials and techniques— James S. Kinder (American Book Company, 1950)
13. Encyclopedia of educational research, (Third edition) Aims and objectives of social studies (edited by Chester W. Harris (Macmillan, Newyork)
14. Teaching Social studies in high schools (Third edition)—Edgar Bruce wesley (D. C. Heath & Co., Boston)
15. The education and training of teachers (—UNESCO.)
16. —UNESCO CHRONICLE—(The secondary school curriculum)—June 1960 vol.VI No. 6.
17. শনিবারের চিঠি (সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত), কার্তিক ১৩৬৭—ইতিহাসের স্বরূপ প্রসঙ্গে—শংকর দত্ত।